সাবরমতী

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

SABARMATI

by

Ashutosh Mukhopadhyay

সাহিত্য প্রকাশ প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : কুশধ্বজ মান্না : মান্না প্রিণ্টার্স

৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

শ্রীরবি বসু, প্রীতিভাজনেষু

লিখতে বসে এক সে বিদেশী বিদেশী মনে পড়ে গেল। সেই গল্পের নায়িকা কোনো রাজনন্দিনী। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত, সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে রাতে ফিরে আবার ঘুমনো পর্যন্ত, তার প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত নিয়মের সাড়ম্বর শৃঙ্খলায় বাঁধা।

কিন্তু রাজকুমারীর মাঝে মাঝে মনে হয়, শিকলে বাঁধা।

সোনার শিকল। জলুস আছে, ছটা আছে। তবু শক্তপোক্ত শিকলই বটে। ভাঙে না, ছেঁড়ে না। এ শিকল দেখে লোকের চোখ ঠিকরয়, বেদনার দিকটা কারো চোখে পড়ে না। রাজনন্দিনীর চলা-ফেরা ওঠা-বসা, তার বেশ-বাস সাজ-সজ্জা আহার-বিহার আরাম-বিরাম তার হাসি-আনন্দ শোক-তাপ—এক কথায় তার গোটা অস্তিত্ব এক সুমহান রাজকীয় ঐতিহ্যের ধারায় সুনির্দিষ্ট। কোনো ফাঁক নেই, কোনো ব্যত্তিক্রম নেই। ফাঁক কেউ খোঁজে না, ব্যতিক্রম কেউ চায় না। এমন কি অনেক-অনেকদিন পর্যন্ত রাজকুমারীও খোঁজেনি, চায়নি। চেতনার শুরু থেকে সে-যেন একটানা ঘুমিয়ে ছিল। সেই ঘুমের ফাঁকে তার চেতনা কখনো সুদূরপ্রসারী হতে চায়নি। কোনো নিভৃতের রহস্যতলে মাথা খোঁড়েনি। সেই নিয়মের ঘোরে কোনো বেদনা গুমরে উঠতে চায়নি।

কিন্তু রাজকুমারীর ঘুম হঠাৎ একদিন ভেঙে গেল। তলায় তলায় এই ঘুম ভাঙার প্রস্তুতি চলেছিল কবে থেকে তা জানে না।

সেটা রাজকুমারীর যৌবনকাল।...আশ্চর্য, নিয়মের ছকে বাঁধা সেই শান্ত যৌবনে সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ লাগে কেমন করে। শান্ত যৌবন দুলে ওঠে ফুলে ওঠে কেঁপে ওঠে গর্জে ওঠে। হঠাৎ এ কি হল রাজকুমারীর! এ কি দারুণ যাতনা আর দারুণ আনন্দ! ঐতিহ্যের বাঁধগুলো সব ভেঙে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। সেই যৌবন মুক্ত হতে চায়, বন্য হতে চায়, সমুদ্র হতে চায়।

কিন্তু শুধু চায়। পারে না। পাল ছেঁড়ে না। হাল ঘোরে না।

শত শতাব্দীর নিয়মের বনিয়াদে ফাটল ধরে না। সত্তার আ'.
এক দিক অটুট আভিজাত্যের নিশ্চিত বন্দরে বাঁধা। নিয়মের বন্দরে। অভ্যস্ততার বন্দরে। দিশেহারা দিকহারা হবার ঘোর কাটে একসময়। তাড়না সরে যায়। বহুদিনের বন্দী পাখি খাঁচা খোলা পেলে যেমন তার ডানা উসখুস করে ওঠে, বাইরে বেরিয়ে আসে—অথচ খাঁচার অলক্ষ্য বন্ধন আবার তাকে ভিতরে টেনে নিয়ে যায়। ঠিক তেমনি করে নতুন অনুভূতির উত্তেজনা কাটিয়ে বিনা প্রতিবাদে আবার সে নিশ্চিন্ত শান্তির নৌকায় উঠে বসে। এ নৌকোর নোঙর ছেঁড়ে না।

রাজকুমারীর ভোগের উত্তেজনা আর ভোগের ক্লান্তি সম্বল।

কিন্তু একদিন···

রাজকীয় আভিজাত্যের সুতোয় গাঁথা মালা থেকে খসে-পড়া একটি দিন। সমস্ত হিসেবের বাইরের মুক্ত দিন একটা।

মাত্র একদিনের জন্য মুক্তি পেয়েছিল রাজকুমারী। রাজরীতির ছক-কাটা গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। অফুরন্ত মুক্তির বাতাসে ভাসতে পেরেছিল, হৃৎপিণ্ড ভরে নিতে পেরেছিল। সেই একদিনের জন্য রাজকুমারী ঐতিহ্যের শৃঙ্খল-মুক্ত, রাজটিকার ছাপ-মুক্ত, পরিচয়শূন্য সাধারণ রমণী একটি। বৈশাখের মেঘের মত মাত্র একদিনের জন্য সেই রমণী নিরুদ্দিষ্ট হতে পেরেছিল। সহস্র সাধারণের জীবনের স্রোতের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পেরেছিল, সেই এক মুক্ত দিনের প্রতিটি পল প্রতিটি মুহূর্ত যেন আস্বাদনের বস্তু। শুধু তাই নয়, ওই একটি দিনের মুক্তির মধ্যেই সেই তৃষাতুর রমণীর যৌবন নামশূন্য রাজটিকাশূন্য আর এক অতি-সাধারণ পুরুষ-যৌবনের সন্ধান পেয়েছিল, স্পর্শ পেয়েছিল। তাদের হৃদয়ের বিনিময় ঘটেছিল—যে বিনিময়ের জন্য নারী আর পুরুষের শাশ্বত প্রতীক্ষা।

দুটি হৃদয় দুটি হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছিল।

কিন্তু একটা দিনের পরমায়ু কতটুকু আর?

দিন ফুরিয়েছে। রাজকুমারীর মুক্তির মিয়াদও। পরদিনই আবার তাকে রাজসম্মানের সেই পুরনো জগতে ফিরে আসতে হয়েছে।

আগের দিনটা যেন স্বপ্ন। স্বপ্ন, কিন্তু সত্যি। যে পুরুষ-হৃদয়ের সঙ্গে তার অন্তরতম বিনিময় ঘটেছিল, এই সাড়ম্বর রাজকীয় বেষ্টনীর মধ্যে সে অনেক দূরের মানুষ। দূরেই থেকেছে। দূরে সরে গেছে। হৃদয়-আকাশের ছুটি ভাসমান মেঘ কাছাকাছি এসেছিল কেমন করে। মিলনমুখি হয়েছিল। কিন্তু মেলেনি। মিলতে পারলে ফলপ্রসূ হত, মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তার আগেই তারা থমকেছে। পরস্পরকে দেখেছে। চিনেছে। তারপর আবার যে যার দুদিকে ভেসে গেছে।

আর দেখা হয়নি। হবেও না।

রাজকুমারীর জীবনে আবার সেই প্রাণশূন্য পারম্পর্যশূন্য রাজ-আভিজাত্যে মোড়া একটানা দিনের মালা গাঁথা হতে থাকে। কিন্তু সেই মালার মাঝখানে দুলছে একটি মাত্র কক্ষচ্যুত দিনের স্মৃতি। হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ্য নিটোল শুচিশুভ্র একফোঁটা অশ্রু হয়ে মধ্যমণির মত দুলছে সেখানে।

কাহিনীটা মনে পড়তে লেখনী দ্বিধান্বিত হয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। আমার চোখের সামনে দুটি নারী-পুরুষের জীবন যে ছাঁদে যে ছন্দে ভিড় করে আসছে, দেশ-কাল-পাত্র হিসেবে ওপরের ওই কাহিনীর রমণীর সঙ্গে তাদের সহস্র যোজন তফাত। তবু কোথায় যেন মিল।

সাবরমতীর ধারে বসে সেই মিলের হিসেব মেলাতে গিয়ে বিস্ময়ের অন্ত নেই আমার। সেই বিস্ময়ের ঢেউয়ে দ্বিধা সরে গেছে। মানুষের নিভৃততম হৃদয়ের খবরে খুব বেশি রকমফের হয় না বোধহয়। হৃদয়ের তন্ত্রীতে আর এক হৃদয়ের স্পর্শ মুখর হয়ে উঠলে একই সুর বাজে বুঝি, একই ঝঙ্কার ওঠে। বিশ্ববেদনার একই সুর, বিশ্ব-হৃদয়ের একই রূপ। এই সত্যের নতুন পুরনো বলে কিছু নেই। যে সূর্য রোজ উঠছে, তার প্রথম আবির্ভাবের রূপটা চির-পুরাতন, কিন্তু চির-নতুন। রাতের রজনীগন্ধা যে বারতা পাঠায় সেটা প্রত্যহের বারতা হলেও পুরনো বলে কে কবে তার প্রতি উদাসীন হতে পেরেছে?

হৃদয়ের কথা এমনি কোনো সত্যেরই প্রতীক হয়তো।

কিন্তু হৃদয়ের ঠিক এই কথার জাল বিস্তারের আগ্রহ নিয়ে আমি এই সাবরমতীর দেশে আসিনি। বস্তুত, এখানে আসার পিছনে উদ্দেশ্য বলতে কিছু ছিল না। উপলক্ষ ছিল। সেও নিতান্ত গতানুগতিক। উপলক্ষ সাহিত্য-সম্মেলন। উদ্যোক্তারা বাংলার বাইরে এ-ধরনের সম্মেলনের আসর সাজানোর ফলে বহু সাহিত্যরসিক কাব্যরসিক নাট্যরসিকের সমাবেশ ঘটে। এই সমাবেশের পিছনেও সাহিত্যরসাহরণ প্রধান আকর্ষণ কিনা সঠিক বলতে পারব না। আমার দিক থেকে অন্তত আরো গোটাকতক জোরালো আকর্ষণ আছে। কোথাও থেকে আমন্ত্রণ এলেই সিঙ্গল্ ফেয়ার ডাবল্ জার্নির হাতছানিটা প্রথম চোখে ভাসে। দ্বিতীয়, সম্মেলনের চার-পাঁচটা দিন কোথাও রাজ-অভ্যর্থনা, কোথাও রাজসিক। বলা বাহুল্য, এটা নি-খরচায়। তৃতীয়, নতুন জায়গা দেখার সুযোগ।

তবু গুজরাটের এ-হেন জায়গায় বাংলা সাহিত্য অধিবেশনের ব্যবস্থার কথা শুনে একটু অবাক হয়েছিলাম। শুনেছিলাম, এই রাজ্যের ছেলেমেয়েরা প্রথম জ্ঞান-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বুঝতে শেখে। এই দেশ লক্ষ্মীর চলা-ফেরার একেবারে সদর রাস্তা। ভারতের সব রাজ্যে বিত্তবানের সংখ্যা কিছু আছেই—কিন্তু এখানকার মতো আর কোথাও নেই নাকি। ছেলে-বেলায় ভূগোল বইয়ে পড়েছিলাম বস্ত্র-শিল্পে গোটা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে রেখেছে এই একটি জায়গা। এই দেশ বলতে আমার চোখে শুধু ভাসত তুলোর চাষ, তুলোর গাছ, সুতোর কল, আর কাপড়ের কল।

অবশ্য এই ধারণার সবটাই অজ্ঞতা-প্রসূত। জানার তাগিদ থাকলে অনেক জানা যেত। একেবারে যে কিছুই জানতুম না তাও নয়। কিন্তু সেটা ভাসা-ভাসা জানা। শরতের হালকা মেঘের মতো একটা অগভীর ধারণা শুধু মনের আনাচে-কানাচে ভাসছিল। এখানে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তার অনেকটাই সরে গেছে। শহরের বুকের ওপরেই সুতোর কল আর কাপড়ের কল অনেক আছে বটে। কিন্তু

তুলোর চাষ, তুলোর গাছ নেই। তুলো আসে অনেক দূর থেকে। আসে পশ্চিমঘাট উপত্যকার সমতল ভূমি সহ্যাদ্রির কালো মাটির অঞ্চল থেকে, আর বহু দূরের সাতপুরা হিল্‌স্‌ থেকে।

এখানে এসে প্রথম যে জিনিসটি ভাল লেগেছিল, তা এখানকার মানুষদের অন্তরঙ্গ আতিথেয়তা, অমায়িক অথচ সহজ সৌজন্যবোধ। এ-যাবৎ বিত্তবানের দু'রকমের আতিথ্য লাভের সুযোগ ঘটেছে। এক, খানদানী আতিথ্য। সেখানে গৃহস্বামী আর অতিথি যত কাছে আসে ততো ব্যবধান বাড়ে। তাদের আতিথ্যের চটকের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে হাঁপ ধরে আর ভিতরের এক ধরনের দৈন্য নিভৃতের নানা জটিলতার বিবরে আত্মগোপন করতে চায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের আতিথেয়তা নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ তুষ্টির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেবার মতো। উদ্বেগ নেই, মান খোয়া যাবার শঙ্কা নেই, হিসেব করে পা ফেলে চলার অদৃশ্য তাগিদ নেই। ঐশ্বর্য সেখানে চোখের ওপর সরাসরি সূর্যের আলো ফেলে দৃষ্টি অন্ধ করে না। উদয়ের প্রথম অথবা অস্তের শেষ আভার মত স্নিগ্ধ স্পর্শ ছড়ায়। স্মৃতিপটে সেটুকু লেগে থাকে। বিত্তবান ব্যক্তিবিশেষের এ-রকম আতিথ্য বেশি না জুটলেও জুটেছে। কিন্তু সমবেত বিপুল অভ্যাগতসমষ্টির প্রতি এখানকার সামগ্রিক আতিথ্যের রূপটাই এই দ্বিতীয় পর্যায়ের। এই জায়গাটার সম্পর্কে আগের ধারণা বা অজ্ঞতার জন্য মনে মনে নিজেই লজ্জা পেয়েছি। বিত্ত যেখানে প্রসন্ন দৃষ্টি ফেলে তার রূপ আলাদা।

শুকনো বাদামী বালির দেশ। কিছুটা টানের জায়গা। অঙ্কের হিসেবে মরুভূমির দূরত্ব এখান থেকে খুব দুস্তর নয়। কিন্তু মরুভূমি এখানকার কোনো কিছুতে টান ধরাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। একটা ভৌগোলিক অস্তিত্ব নিয়ে কোনো এক পাশে পড়ে আছে যেন। এখানকার মানসিকতা থেকে মরুভূমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

তার কারণ বোধহয় এখানকার হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে বইছে সাবরমতী। শহরের প্রায় মাঝখান দিয়ে গেছে। তার দু'কূলে শহর। একই শহর। স্বভাবতই মাঝে মাঝে সেতুবন্ধ চোখে

পড়বে। মনে হয়, এই নদীর সঙ্গেই এখানকার মানুষদের নাড়ীর যোগ। জন্মের পর চোখ খুলেই যারা নদী দেখে তাদের সত্তাও সেইভাবেই পুষ্ট হয় বলে বিশ্বাস। এখানকার মানুষদের আমোদ-প্রমোদ ধর্মাচরণ অনেকটাই এই নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। ছিল বলি কেন, আজও নেই এ-কথা জোর করে বলতে পারিনে। দিন বদলেছে বলে হয়তো ধারা বদলেছে কিছুটা। পুরনোর উপর নতুনের আলো সর্বত্র যেমন পড়ে তেমনি পড়েছে। কিন্তু সেটা বহিরঙ্গের ব্যাপার।

দেশের সতেরোটি পবিত্র স্থানের মধ্যে বেশির ভাগেরই অস্তিত্ব এই সাবরমতীর তীরে। চোখে দেখিনি, গল্প শুনেছি—তিন বছর অন্তর মলমাসের উৎসবানুষ্ঠানে আজও হাজার হাজার রমণী খালি পায়ে এই সব পবিত্র স্থানে উপাসনান্তে নগর-প্রদক্ষিণ করে। অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সংস্কারান্ধ গরিব ঘরের মেয়ে নয় সকলেই। গরিবের সংখ্যা এমনিতেই কম এখানে, শিক্ষারও দ্রুত বিস্তার ঘটছে। রমণীদের বিশ্বাস তারা নগর প্রদক্ষিণ করলে নগরের কল্যাণ হবে। কেন হবে তা তারা জানে না বা জানতে চেষ্টাও করে না। শিক্ষার গর্ব বা বিত্তের ছটা প্রাচীন বিশ্বাসের শিকড় কেটে দেয়নি। কল্যাণ হোক না হোক কল্যাণ তারা চায় এটাই বড় কথা। নগর প্রদক্ষিণের এ-দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলেও নদীর ধারের আর এক উৎসব প্রত্যক্ষ করেছি। কার্ত্তিকের শুক্লা-একাদশীর মেলা। শুধু মেলা দেখলে হয়তো এমন কিছু বৈচিত্র্য চোখে পড়বে না। বহু দর্শনার্থী বহু জন-সমাগম বহু পণ্যের চিরাচরিত দৃশ্য। কিন্তু মেলার অদৃশ্য মানসিকতাটুকু মনোগ্রাহী। দেবোত্থান একাদশীর মেলা—দেব-উঠি-আগিয়ারস্।

শীতারম্ভের এই সময়টায় সাহিত্য-সম্মেলন ব্যবস্থার দরুন উদ্যোক্তাদের মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়েছি। নইলে দেখা হত না এই দেব-উঠি-আগিয়ারস্। আমি একালের মানুষ। স্বভাবতই একালের মন, একালের দৃষ্টি, একালের হৃদয় নিয়ে বসে আছি। শুধু আমি কেন, সকলেই। তবু এমনি সমাবেশে এলে মনে হয়, আমাদের এই দৃষ্টি মন হৃদয়ের একটা দিক বুঝি কবেকার কোন্

সাধক ভারতের চতুষ্পথে বসে আছে। সেই ভারত বা সেই অতীতের সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তবু সুদূর অতীতের কোনো অনাবিল পুষ্টির সঙ্গে সত্তার একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ থেকেই গেছে। নইলে দেবতা উঠবেন শোনামাত্র একালের এই অশান্ত মন-সমুদ্রের তলায় তলায় নিঃশব্দ একটা ঢেউ ওঠে কেন? বহুকালের হারানো অথচ প্রায়-চেনা পথের স্মৃতি বার বার পিছনপানে টানে কেন?

—আর ক'টা দিন থেকে যান। শুক্লা-একাদশীর উৎসব দেখে যান। রমণীর সদয় মিষ্টি আতিথ্য বড় লোভনীয়ভাবে প্রসারিত হয়েছিল। এখানকার যে রমণীটি সকলের মধ্যমণি, তার প্রস্তাব।

—সেটা কি ব্যাপার? আমি উৎসুক হয়েছিলাম।

—দেব-উঠি-আগিয়ারস্—দেবোত্থান একাদশী।

—কি হয়?

মহিলা হেসে বলেছিল, হয় না কিছু। নদীর ধারে সকাল থেকে মেলা বসে।

বাংলাদেশের ছেলে, মেলা শুনে অভিভূত হবার কারণ নেই। তবু নতুন জায়গায় সব আকর্ষণ ছেড়ে মেলা দেখে যাবার প্রস্তাব শুনে বলেছি, দেশে মেলা দেখে দেখে এখন মেলার কথা শুনলে ভয় করে। এটা কি-রকম মেলা?

মেলার আলোচনা উপলক্ষ। লক্ষ্য, অবকাশ যাপন। সেটা মনের মতো হলে সবই ভালো লাগে। সামান্য আলোচনাও বৈচিত্র্যশূন্য মনে হয় না। মহিলা তেমনি হেসেই বলেছিল, কি-রকম আর, সব মেলা একই রকম। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ মেলে, আবার মন চাইলে দু'একজন মানুষেরও সন্ধান মেলে।

মহিলার হাসিমাখা মিষ্টি মুখে বাড়তি একটু লালিমা চোখে পড়েছিল কিনা ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু কথা ক'টা আমার কানে লেগেছিল। আজও লেগে আছে।

আজ যদি শুনি, কোনো কুবেরাধিপ সার অমুকের মেয়ে অথবা সার তমুকের বউ স্বল্প-পরিচয়ের অতিথিকে দেশের কোনো মেলা দেখে

যাবার জন্য আপ্যায়ন জানাচ্ছে, কানের পর্দায় একটা নাড়াচাড়া পড়ে যাবে বোধ করি। যে মহিলার কথা বলছি এখানে তার মর্যাদা আরো বেশি ছাড়া কম নয়। কোনো পুরুষের গৌরবে গরবিনী নয়, নিজেই সে ভাগ্যের তুঙ্গশিখরাসীনা। তার লক্ষ্মীর প্রসাদ-ভাণ্ডারের দিকে তাকালে অনেক ভাগ্যবানের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়বে। শুনেছি এই লক্ষ্মীর প্রসাদ-ভাণ্ডারের দিকে তাকালে তা তো বটেই। ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের সঠিক হিসেব সে নিজেও রাখে না। বড় বড় কাপড়ের কলের সংখ্যা এখানে পঁচাত্তরের উপরে। তার দু'একটার মালিক হওয়া খুব বড় কথা নয় এখানে। এই দেশে লক্ষ্মীর সমুচ্ছল পদক্ষেপ বস্ত্রশিল্পের পথ ধরেই। কিন্তু বড় মিলগুলোর মধ্যেও যদি শুধুমাত্র একটিকে সবগুলোর চুড়ো হিসেবে বেছে নেওয়া যায়, দেখা যাবে সেই মিলের অধিশ্বরী এক মহিলা। যে রমণী এখানকার কটন্ চেম্বারের অধিনায়িকা—এ বছরের প্রথম মহিলা প্রেসিডেণ্ট।

সেই রমণী। সেই মহিলা। আমাকে সাবরমতীর দেবোত্থান একাদশীর মেলা দেখে যাবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

...যশোমতী পাঠক।

এই নাম এখানকার সর্বস্তরের মেয়ে-পুরুষের সুপরিচিত।

হ্যাঁ, এখানকার সব থেকে বড় কটন্ মিলের মালিক, কটন্ চেম্বারের প্রেসিডেণ্ট যশোমতী পাঠক সেই এক সন্ধ্যায় বলেছিল এই কথা। বলেছিল, কি-রকম আর, সব মেলা একই। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ মেলে, আবার মন চাইলে দুই-একজন মানুষেরও সন্ধান মেলে।

আমি হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম। তাতে অভব্যতা ছিল না, বিস্ময় ছিল। কারণ, মনে মনে আমি তার দিন কতক আগে থেকেই দুটি নারী-পুরুষের জীবন-চিত্রের একেবারে অন্তঃপুরে বিচরণের চেষ্টায় ছিলাম। সেটা এই মহিলা জানে। শুধু জানে না, এই একটি কারণে আমার কিছু লাভ হয়েছিল। সে রকমটা আর কোনো অভ্যাগতর কপালে অন্তত জোটেনি। মহিলার পরোক্ষ

প্রশ্রয়ের ফলে এই সাবরমতীর দেশে আসাটা আমার সার্থক মনে হয়েছিল।

শোনামাত্র সেই মুখের দিকে চেয়ে আমি কিছু দেখতে চেষ্টা করেছিলাম। মনে হয়েছিল, সাবরমতীর ওই মেলার সঙ্গে তার কোনো একটা নিরবচ্ছিন্ন মেলার ধারা মিশে আছে। যশোমতীর মন কাউকে চেয়েছিল, খুঁজেছিল। কারো সন্ধান মিলেছিল।

হতে পারে, দেবতা উঠেছিলেন।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গ পরের বিস্তার সাপেক্ষ। সাহিত্য-অধিবেশন উপলক্ষে সদ্য-আসা এই দুই চোখ তখন শুধু এই জায়গাটা আর তার মানুষগুলোকে দেখে বেড়াচ্ছিল। যশোমতী সম্পূর্ণ অপরিচিতা তখনো। নামটাই শুধু শোনা ছিল। সম্ভাব্য কোনো কাহিনীর গতি যে এই পথে গড়াবে, সেটা কল্পনার বাইরে। আমি তখন শুধু সাবরমতী চিনতে চেষ্টা করছিলাম।

নদীর কথায় যশোমতীর কথা এসে গেছে।

নদীর জল নীলাভ। নীল আভার সঙ্গে মানুষের ধমনীর রক্তের অদৃশ্য কি যোগ কে জানে। চারদিনের সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে এই প্রায়-অপরিচিত মানুষদের উদ্যম দেখেছি, উৎসাহ দেখেছি, উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছি। আমরা, বিশেষ করে খাস বাংলার সাহিত্যিকরা যেন ভারি প্রিয়জন তাদের। প্রিয়জনের প্রতি অন্তরঙ্গতার আতিশয্য যেটুকু, সেটুকুও অন্তরের। তাদের ঐশ্বর্যের ছটা থেকেও ছোট বড় নির্বিশেষে অন্তরের এই সামগ্রিক খুশির ছটাটুকুই বেশি টেনেছিল আমাকে।

কাপড়-কলের দেশে সাহিত্য-সম্মেলনের আড়ম্বর হবে শুনে মনে মনে যারা মুচকি হেসেছিল তারাও ভিতরে ভিতরে আমার মতই অপ্রস্তুত হয়েছে হয়তো। টাকা আছে অথচ সাহিত্য-প্রীতি নেই, এই দিনে সেটা মানহানিকর ব্যাপার প্রায়। সাহিত্য-সম্মেলনও সেই গোছেরই হবে ধরে নিয়েছিল সকলে। কিন্তু ঐশ্বর্যের সঙ্গে মার্জিত

রুচি তার সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের দিকটা যে কত সহজভাবে মিশে আছে, এখানে এসে গোড়াতেই সেটা উপলব্ধি করতে হবে। লক্ষ্মী-সরস্বতীর চিরন্তন বিবাদের কথা মনে হবে না।

বিশেষ বিত্তবানদের প্রতি বিপরীত অবস্থার মানুষের এক ধরনের মানসিক বিরাগ আছেই। এই বিরাগের প্রধান হেতু বোধ করি বিত্তবানের হৃদয়শূন্যতা, পারিপার্শ্বিক মানুষের প্রতি তাদের নির্লিপ্ত উদাসীনতা। বিত্ত তার চারদিকে একটা বৃত্ত টেনে দেবেই। কিন্তু সেই বৃত্তটা ছোট বা সংকীর্ণ হলে যতটা চোখে লাগে, বড় হলে ততটা লাগে না বোধহয়। আমাদের চোখ ছোট বৃত্ত দেখে অভ্যস্ত। সেখানে স্বার্থ আর আত্মচেতনা আর মর্যাদাবোধ যেন সর্বদাই একটা ধারালো ছুরি হাতে পাহারায় বসে আছে। সেখানে হৃদয়ের কারবার নেই।

হৃদয়ের কারবারের খবর এখানেও খুব রাখিনে। কিন্তু এখনকার বৃত্তটা যে বড তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই বড বৃত্তের সঙ্গে পুরুষকার মিশলে তাব চেহারা অন্যবকম। আর তার মধ্যে মানসিক সফলতা প্রতিফলিত হলে তাব চেহারা আরো অন্য রকম। এই সামগ্রিক বিত্তের দেশে পথে-ঘাটে যে একটিও ভিখিরি চোখে পডল না সেটা নিশ্চয় চোখ বা মনের দিক থেকে অবাঞ্ছিত নয়। এ-হেন জায়গায় হঠাৎ বড়লোক হবার নেশায় পাগল হয়ে ছুটবে এমন একটিও রেসকোর্স যে নেই, এও নিশ্চয় এক সামগ্রিক মানসিক পুষ্টির লক্ষণ। এই পুষ্টির চেহারাটা সর্বত্র চোখে পড়ে না। না পড়লে আমাদের অভ্যস্ত চোখে তেমন ধাক্কা বা খোঁচাও লাগে না। কিন্তু পড়লে ব্যতিক্রম মনে হয়। এখানকার শিক্ষার ব্যবস্থাও সাবরমতীর মতো বহু ধারায় এঁকে-বেঁকে গেছে। প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান এখানেই। এর অধীনে শুনলাম বাহাত্তরটি কলেজ, আর তার মধ্যে একুশটি নাকি আছে এই শহরেই। কত রকমের কলেজ তার ফিরিস্তি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শুধু অর্থ আর রুচি এখানে বিপরীত রাস্তায় চলছে না কেন, সেই প্রসঙ্গে এই উক্তি।

বিদেশে এসে সেখানকার একজন লোককেও দেশের ভাষায় কথা

বলতে শুনলে আপনার ভালো লাগবে। কিন্তু এসে যদি শোনেন এবং দেখেন আপনার দেশের ব্যাপক সাহিত্যচিন্তার এক বৃহৎ সমজদারগোষ্ঠী আছে সেখানে--তাহলে সেই ভালো লাগাটা বুকের একেবারে কাছাকাছি কোথাও পৌঁছতে বাধ্য। শরৎবাবু যে এখানে সমষ্টিগতভাবে এমন এক হৃদয়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত কখনো কল্পনাও করিনি। ঘরে ঘরে তাঁর ছবি, ঘরে ঘরে তাঁর অনুবাদ-সাহিত্য। ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারে এখানকার ছাত্রছাত্রীদের সব থেকে বেশি ভিড় বাংলা ক্লাসে। এর পিছনে একটাই কারণ। আমাদের কবি আর আমাদের লেখককে তাদের জানার আগ্রহ। এই আগ্রহ কল্পনার বস্তু নয়, বাস্তব সত্য। এতে তাদের জাতীয় বৈভবের কোনো খাদ মেশেনি। অল্পবয়সী এত ছেলেমেয়ে ছোটাছুটি করে এসে বাংলায় কথা বলবে, বাংলায় অভ্যর্থনা জানাবে—বাংলা সাহিত্য-সম্মেলনে এসেও এ আর কে আশা করেছিল ?

বিলাস-ব্যসনের অনুষ্ঠান বলতে নাটক নাচ আর গান। এখানকার আবালবৃদ্ধ-বনিতা এই তিন কলার ভক্ত। প্রচুর খরচও হয় এতে। সম্মেলনে তিনের ব্যবস্থাই ছিল। নাটক একদিন, নাচ আর গান প্রতিদিন।

কমলা-তনয়া যশোমতী পাঠকের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ এক সন্ধ্যার গানের আসরে। কিন্তু এ কাহিনী বিস্তারের মত অনুকূল নয় সেটা আদৌ।

সাহিত্যের আসরে আগেও ক'দিন দেখেছি মহিলাকে। শুনেছি, আমাদের আপ্যায়ন এবং অভ্যর্থনার ব্যাপারে তারই উদার হাত সব থেকে বেশি প্রসারিত। অবশ্য সেটা প্রকাশ্যে নয়। সে-ও খুব অভাবনীয় মনে হয়নি, কারণ অপ্রকাশ্য উদারতা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হয়েই পড়ে আর তাতে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের চটক বাড়ে। মহিলা অধিবেশনে আসা মাত্র স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের একটু বেশি মাত্রায় সচেতন হতে দেখেছি। এক পাশের একটা নির্দিষ্ট আসনে বসে ঈষৎ কৌতুকমেশা গাম্ভীর্যে তাকে অধিবেশনের আলোচনায় মনোনিবেশ

করতেও দেখেছি।

দেখেছি, তার কারণ মহিলার সম্বন্ধে এখানকার বাঙালী বাসিন্দাদের মুখে নিজের পেশাগত কিছু রসদের সন্ধান পেয়েছি। অবশ্য তখনো সম্পূর্ণই আগোচরের রসদ সে-সব। অর্থাৎ মহিলাকে দেখার আগের রসদ। সেটা সব থেকে বেশি যুগিয়েছে ত্রিপুরারি ঘোষ। বস্তুত, আমার এখানে আসাটা সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের আগ্রহের দরুন যতটা না, তার থেকে অনেক বেশি ত্রিপুরারির তাগিদে। না এলে জীবনে আর মুখ দেখবে না, চিঠিতে এমন হুমকিও দিয়েছিল সে। লিখেছিল, তার প্রাণের দায়—না এলেই নয়।

যশোমতী প্রসঙ্গে এই ত্রিপুরারির মুখখানা উদ্ভাসিত হতে দেখেছি কতবার ঠিক নেই। অথচ স্বভাবের দিক থেকে বরাবর ওকে নীরস গদ্যাকারের মানুষ বলে জানি। ছোট একটা কবিতা মুখস্থ করতে গলদঘর্ম হয়ে উঠত, কিন্তু লাভ-লোকসানের দুরূহ অঙ্কের ফল মেলাতে ওর জুড়ি ছিল না। ছেলেবেলা থেকে হিসেব করে চলত, উচ্ছ্বাসের মুখেও হিসেবের রাশ টেনে ধরত, পাছে কাউকে পাওনার অধিক দিয়ে বসে। সে টাকা-পয়সাই হোক বা নিন্দা-প্রশংসাই হোক। হস্টেলের ও ছিল ম্যানেজার। বাজার সরকারের মোটা চুরি ধরা পড়েছিল একবার। কিন্তু সরকার এমন নিখুঁত হিসেব দিয়েছিল যে তাকে বরখাস্ত করার বদলে দু'টাকা মাইনে বাড়ানোর সুপারিশ করেছিল ত্রিপুরারি।

কলেজে ঢুকেও এই হিসেবের রাস্তাই ধরেছিল সে। কমার্স পড়েছে। পাঠগত ঐক্যে সেই প্রথম বিচ্ছেদ। তারপর কর্মের অধ্যায়ে সঙ্গবিচ্ছেদ। নিষ্ঠা সহকারে ত্রিপুরারি সেই হিসেবের রাস্তা ধরেই এগিয়েছে। এম. এ. কমার্স পাস করেছে, অ্যাকাউন্টস্-এর আরো দুই একটা কি বাড়তি পরীক্ষাও দিয়েছে শুনেছিলাম। তাতেও ভালো করেছে। কিন্তু উপরওয়ালা অনেকদিন পর্যন্ত তার চাকরির ব্যাপারে হিসেবের গরমিল করেছেন। কোনটাই মনের মত হয় না।

কর্মজীবনে নানা ঘাটের জল খেয়ে একসময় ওই কাপড়ের কলের দেশে গিয়ে স্থিতি হয়েছে সে। দু'তিন বছর অন্তর দেখাশুনা হয় ও কলকাতায় এলে। কোন্ এক কটন্ মিলের চিফ অ্যাকাউন্টেন্টের পোস্টে প্রমোশন পেয়েছে—ওর সম্পর্কে আমার শেষ খবর এইটুকু।

এই ত্রিপুরারির অপ্রত্যাশিত পত্রাঘাতে একটু অবাকই হয়েছিলাম। পত্র একটি নয়, পর পর কয়েকটি। সব ক'টারই সার মর্ম এক। আসা চাই। আসা চাই-ই চাই। না এলে ওর প্রেস্টিজের হানি। ফার্স্ট ক্লাসের যাতায়াতের ভাড়া পাঠাতেও সে প্রস্তুত।

সেই কাঠখোট্টা চিঠির কোনো কোনো অংশ হাসি উদ্রেক করার মতো। লিখেছিল, আমাদের সাহিত্য-ফাহিত্যের কানাকড়ি দামও সে কোনো দিন দেয়নি। আজও এর মর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু এখন বুঝছে ঘামালে ভালো করত। অন্তত কখন কি লিখছি আমি, তার একটু-আধটু খবর রাখলেও মন্দ হত না। কারণ, জীবনের এই নতুন অভিজ্ঞায় সে দেখছে অকাজের কাজও কখন যে কত বড় হয়ে ওঠে তার ঠিক নেই। লিখেছে, আমার বোধহয় জানা নেই, যে বিশাল কটন্ মিলের সে চিফ্ অ্যাকাউন্টেন্ট এখন, তার একেশ্বরী অধিশ্বরী এক রমণী। রমণীর সাহিত্যপ্রীতি সম্পর্কে বিশদ কোনো ধারণা ছিল না ত্রিপুরারির। এর থেকে যে এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে তাও কখনো কল্পনা করেনি। সংস্কৃতির সর্ব ব্যাপারে মহিলাটির মোটামুটি এক ধরনের প্রীতির যোগ দেখে অভ্যস্ত সকলে। এটা বাইরের বস্তু বলেই ধরে নিয়েছিল ত্রিপুরারি। কারণ এতবড় কোম্পানীর যাবতীয় হিসেব দেখতে এবং বুঝে নিতে চেষ্টা করে যে মহিলা, সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে তার সময় নষ্ট করার মতো সময় আছে বলেই সে ভাবতে পারত না।

ত্রিপুরারির যত ফ্যাসাদ এই ভাবতে না পারার দরুন।

আসন্ন সম্মেলনের আগে কর্ত্রীর ঘরে তার ডাক পড়েছিল মোটা অঙ্কের কিছু নগদ টাকা যোগানোর জন্য। মোটা অঙ্ক বলতে দু'দশ লাখ টাকার চেকও অনায়াসে মহিলা নিজেই কাটতে পারে। কিন্তু

সচরাচর তা করে না। করে না তার কারণ সে বুদ্ধিমতী। গণ্যমান্য সমাবেশের খরচাটা যদি কোম্পানীর কোনোরকম প্রচারের খাতে চালিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে মোটা অঙ্কের আয়কর বাঁচে। ব্যাঙ্কের ব্যক্তিগত তহবিলও নড়চড় হয় না। এ-সব ব্যাপারে মহিলার পাকা মাথা অনেক সময় বিড়ম্বনার কারণ, অনেক সময় বিস্ময়ের।

কথা-প্রসঙ্গে এখানেই ছেলেবেলার পরিচিত বন্ধু হিসেবে আমার নামটাও সাত-পাঁচ না ভেবেই ছুঁড়ে দিয়েছিল ত্রিপুরারি। কর্ত্রীর ঘরে বসে আরো কারা দু-চারজন চেনা-জানা সাহিত্যিকের নাম করছিল। কে আসতে পারে না পারে। মুখ খুলে এমন ফ্যাসাদে পড়বে ত্রিপুরারি ভাবতেও পারেনি। শোনামাত্র মহিলার আগ্রহ দেখে সে অবাক যেমন, বিব্রতও তেমনি। এক কথায়, আমাকে সম্মেলনে আনার দায়িত্ব ওর ঘাড়েই পড়েছে। এখন আনতে না পারলে ওর ঘাড় বাঁচে না। এর পরে দেখা হলেই কর্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, আপনার বন্ধু আসছেন তো?···অতএব, সম্মেলনের কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণের অপেক্ষায় আমি যেন বসে না থাকি। এ যাত্রায় ওর মুখরক্ষার ব্যবস্থাটা আমাকে করতেই হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখানে আসার পর অবশ্য এই বিশেষ আমন্ত্রণের আনন্দটুকু কিছুটা নিষ্প্রভ হয়েছিল। কারণ, শুনলাম মহিলার এ-ধরনের আগ্রহের নায়ক আমি একলা নই। বাংলাদেশের যে সাহিত্যিক বা কবির নামই এই স্থানে একটু-আধটু পরিচিত—তাকেই সম্মেলনে আনার জন্য কোনো না কোনো বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। আসল উদ্দেশ্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি জমজমাট করে তোলা। বিশেষ আমন্ত্রণ-ব্যবস্থায় লেখকরা অনেকেই আমার মতো পরিতুষ্ট দেখলাম। অতএব নিজেকে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি মনে করার খুব কারণ নেই।

স্টেশনে নিতে এসেই ত্রিপুরারি ঠাস ঠাস কথা শুনিয়েছে। সে-কথা থেকে ওর বক্তব্য উদ্ধার করা সহজ নয়। —দুটো প্রেমের গল্প বাতাসে ছেড়ে দিয়ে কি মজাই লুটছ বাবা তোমরা, এমন জানলে কোন্ শালা অ্যাকাউন্টস্ নিয়ে মাথা খুঁড়ত! মাঝবয়সে এখন

সাহিত্যের পিছনে ছোটাছুটি—

—ছোটাছুটি কি রকম? আমি ঘাবড়েই গেলাম, তুমিও সাহিত্য চর্চা শুরু করেছ নাকি?

অবাঙালী ড্রাইভারকে ওর বাড়ির দিকে চালাতে নির্দেশ দিয়ে ভুরু কুঁচকে ঘুরে বসল।—শুরু করেছি মানে? একের পর এক শেষ করছি। প্রথম তিন পাতা, মাঝের তিন পাতা, আর শেষের তিন পাতা। একদিনে একখানা বই তিনবারে ফিনিস। গেল এক মাসে কম করে তোমার দশখানা বই লাইব্রেরি থেকে ইস্যু করতে হয়েছে, জানো?

হেসে বাঁচি না।—সে কি হে! তোমাকে এ-রকম শাস্তির মধ্যে কে ফেললে?

—হাসো, খুব হেসে নাও, বে-কায়দায় পড়লে সকলেই হাসে—বউও হেসেছে। আমার হাতে নভেল দেখে তো প্রথমে ভয়ই পেয়েছিল, ভেবেছিল মাথাটাই বুঝি গেছে খারাপ হয়ে। চোখ-কান বুজে তোমার সব থেকে গাবদা রাবিশ বইটাকে পর্যন্ত খতম করেছি, জানো?

—সত্যি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে প্রাণ বেঁচেছে ওই শর্ট-কাট বার করে। প্রথম, মাঝের আর শেষের—তিন তিরিক্কে ওই ন'পাতা। তাও কি হয়! এক একটা অ্যাকাউন্টস্ মেলাতে গিয়ে কতবার পর পর তিন রাত চার রাত চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেছে—সেই ঘুম পোড়া চোখের সামনে যেই তোমাদের ওই ছাইভস্ম গল্পের বই খোলা, অমনি কে যেন সাঁড়াশি দিয়ে ধরে চোখের পাতা টেনে নামিয়ে দেয়। শেষে ওই শর্ট-কাট বার করে বাঁচোয়া। দিনে তিন পাতা করে তিন দিনে ন'পাতা—একখানা বই শেষ। চরিত্রের নাম জানা গেল, কে কোন্ হাওয়ায় ভাসছে একটু-আধটু বোঝা গেল, আর শেষ ওলটালে বিচ্ছেদ কি মিলন সে তো দয়া করে তোমরা জানাবেই। ব্যস্, আলোচনায় একটু-আধটু মুখ নাড়ার পক্ষে ওটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু তাও কি ফ্যাসাদ কম! তিনটে বই শেষ করতে না করতে সব মিলে-মিশে জগাখিচুড়ি,

—এই বইয়ের নায়ক ওই বইয়ের নায়কের ঘাড়ে চাপল, এর ঘটনা ওর কাঁধে। এক নায়িকার মিলন আর এক নায়িকার বিরহের সঙ্গে ঘুলিয়ে গেল—রাবিশ! গোড়া থেকে একটা চার্ট করে পড়লে হয়তো কিছুটা মনে রাখা সম্ভব।···কি বিপাকে না পড়েছিলাম সেদিন! তোমার কোন্ উপন্যাসের কি এক চরিত্র মনে ধরেছে আমাদের লেডির, প্রশংসা কচ্ছিল—চোখ কান বুজে আমিও দু'দশ কথা জুড়ে দিলাম, যেন আমার পরামর্শ নিয়েই তুমি লিখেছ। তারপর দেখি ভদ্রমহিলা হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে আছে। তক্ষুনি বুঝলাম মিসফায়ার হয়ে গেছে। মুখ টিপে হেসে লেডি বলল, আপনার সব ঘুলিয়ে গেছে, কার সঙ্গে কি জুড়ছেন ঠিক নেই।

আমার শ্রোতার ভূমিকা। শুনতে ভালো লাগছিল। কিন্তু ত্রিপুরারি আবার বাড়িয়ে বলছে কিনা সেই খটকা লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, এ-সব বই তো অনুবাদ হয়নি, উনি বাংলা পড়তে পারেন নাকি?

—বাংলা এখানে অনেকেই লিখতে পড়তে পারে—আমাদের লেডি বাংলায় ভাবতে পর্যন্ত পারে। তার লাইব্রেরি বাংলা বইয়ের সমুদ্র একখানা। দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে। কলকাতা থেকে বই আসে না এমন মাস যায় না।

অবাক হবারই কথা। কাপড়ের কলের সঙ্গে সাহিত্য বস্তুটার কতটা মেশা সম্ভব—সেই সংশয়। বললাম, ওঁর তো মস্ত কটন্ মিল শুনেছি?

—হ্যাঁ। বিগেস্ট্।

—উনিই চালান?

—সব তার নখদর্পণে।

—লেডির লর্ড কি করেন?

মুচকি হেসে জবাব দিল, আইনত লর্ড নেই।

তেমন প্রাঞ্জল ঠেকল না কানে। জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলে-পুলে কি?

তুমি একটি গণ্ডমূর্খ। ছেলে-পুলে থাকতে হলে একটি স্বামীর দরকার হয়।

আমি অপ্রস্তুত।—কেন, বিধবা নন?

—না। অধবা।

শোনামাত্র যে অনুভূতিটা প্রবল হল, তার নাম কৌতূহল। এই কাহিনীর সূত্রপাত তখনি ঘটে গেল কিনা জানি না। ত্রিপুরারির গাম্ভীর্যটুকু খুব অচপল মনে হল না।

—বয়েস কত?

—গোটা চল্লিশ হতে পারে।

সম্ভাব্য কাহিনীটা একটু নিষ্প্রভ হবার দাখিল। তবু বললাম, একেবারে হতাশ হবার মতো নয়, চেহারা স্বাস্থ্য-টাস্থ্য কেমন?

ত্রিপুরারি ঘুরে বসল।—কি মতলব?

—কিছু না। কেমন?

ত্রিপুরারি কাব্য করতে জানে না। তবু যা বলল, খুঁজলে একটু কাব্যের ছোঁয়া মিলতে পারে।—সামনে এসে দাঁড়ালে হিসেব-পত্র ভুল হবার মতো। দেখলে চল্লিশ বছর বয়সের থেকে গোটা পনেরো বছর অন্তত ঝেঁটিয়ে বাদ দিতে ইচ্ছে করবে। তোমাদের তো করবেই, চল্লিশ নিয়ে কবে আর কারবার করো তোমরা—ও বয়েসটা কেবল মাসি পিসির ঘাড়ে চাপিয়ে বেড়াও।

অ্যাকাউন্টেন্ট যেন আমিই, বললাম, চল্লিশের হিসেব নিয়ে এগনোর ব্যাপারেও অনভ্যস্ত নই খুব। মোট কথা তুমি তাহলে লেডিকে চল্লিশ মাইনাস পনের ইজ্ ইকোয়াল্ টু পঁচিশের চোখে দেখো?

—আমি? আমি তাকে দেখলে চোখে শুধু সর্ষেফুল দেখি।

—তোমার সঙ্গে ভাব-সাব কেমন?

জবাব দিল, ভাব-সাব বলতে সুনজর খুব। এতবড় ব্যবসার চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট একজন বাঙালী হবে এটা কেউ চায়নি। সতেরজনে সতের রকম পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু আগের বুড়ো চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট

রিটায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে কাউকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা না করে লেডি যা করা উচিত তাই করলে, চোখ-কান বুজে সরাসরি আমাকে তার জায়গায় বসিয়ে দিলে।

গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, একেবারে বসিয়ে দিলে, না কিছু বাকি আছে?

খটকা লাগল, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠল না। বোকার মতো জিজ্ঞাসা করল, কি বললে?

বললাম, তোমার আশা কি? বক্তব্য আরো প্রাঞ্জল না করলে ওর হিসেবী মাথায় ঢুকবে না।—ঘরে তো সেই কবে একটিকে এনে বসে আছ—তার মারফত আরো কটি এসেছে খবর রাখিনে—ছেলে-পুলে কি তোমার, তিনটে না চারটে?

হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক, তারপর আস্তে আস্তে বোধগম্য হল যেন। ড্রাইভার বাংলা বোঝে না, তাও সচকিত। মুখখানা দেখার মতই হল তারপর। কোনো দেবী অথবা দেবী-সদৃশাকে স্থূল রসিকতার মধ্যে টেনে আনতে দেখলে ভক্ত যেমন বিচলিত হয়, ত্রিপুরারির মুখের সেই অবস্থা। চুপচাপ খানিক চেয়ে থেকে মন্তব্য করল, তুমি একটা রাসকেল! হেসে ফেলল।—একটু আগে বলছিলাম, আইনত লেডির কোন লর্ড নেই, সেটা কানে গেছে?

—গেছে।

—কিন্তু আইনের বাইরে একজন আছে। সে-খবর রাখে না ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষের মধ্যে এমন একজনও পাবে না। জেনেও সকলে শ্রদ্ধাই করে তাদের। চাপা রসিকতায় বলার ধরন তরল হয়ে আসছে ত্রিপুরারির।

—লর্ডটি কে?

—শঙ্কর সারাভাই—সে-ও মস্ত কটন্ মিলের মালিক, ব্যবসায়ে আমাদের লেডির সঙ্গে কীন্ কম্‌পিটিশন। সেই রেষারেষি দেখলে তুমি ভাবলে একজন আর একজনকে ডোবাবার ফিকিরে আছে

কেবল। এই দুদিন আগেও লেডি তার মিলের একজন ভালো মেসিনম্যান ভাঙিয়ে আনতে পেরে মহা খুশি। পরে জানা গেল সেই ভাটিয়া ভদ্রলোক দিনের বেলাতেও হোম-মেড্ নেশা করত বলে শঙ্কর সারাভাই তিনবার ওয়ার্নিং দিয়ে তাকে বরখাস্ত করেছে।

—হোম-মেড নেশা কি রকম ?

—এখানে নেশার বস্তু দুর্লভ।

—আগ্রহ বোধ করার মতো কিছু রসদের ঘ্রাণ পাচ্ছি মনে হল। জিজ্ঞাসা করলাম, শঙ্কর সারাভাইয়ের বয়েস কত ?

ভুরু কুঁচকে ত্রিপুরারি ভাবল একটু। হিসেবে ভুল করা তার রীতি নয়। জবাব দিল, লেডির সঙ্গে আরো বছর পাঁচেক যোগ দাও।

—বিবাহিত ?

চাপা কৌতুকে টসটস করে উঠল ত্রিপুরারির মুখ। সেই মুখ দিয়ে আধা কাব্য নিঃসৃত হল।—না, ওই এক রমণীবল্লভ।

এই প্রেমের সঠিক হদিস মিলল না। জিজ্ঞাসা করলাম তাদের মিলন-পর্বটি সমাধা হবে কবে—শ্মশান-যাত্রার আগে ?

প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরে যেতে ত্রিপুরারির উৎসাহ বাড়ল। বলল, তাও হবে না, আবার হয়েও গেছে বলতে পারো। তোমরা সাহিত্যিক রাসকেলরা মিলন-পর্ব যাকে বলো, সে সম্বন্ধে সঠিক খবর দিতে পারব না। যা লেখো, পড়লে একা ঘরেও কান গরম হয়। মোট কথা, এ-ক্ষেত্রে আত্মার মিল, জাতের অমিল। সারাভাই বামুন নয়, যশোমতী পাঠক নিখাদ ব্রাহ্মণ-কন্যা…আজকালকার দিনে এখানে এ-রকম বাধা ঘোচেনি এমন নয়, কিন্তু ওদের ব্যাপারটা ঠিক সে-রকম নয়।

ত্রিপুরারির প্রাথমিক রিপোর্ট অভিনব কিছু নয়, তবে মোটামুটি কৌতূহলোদ্দীপক। জিজ্ঞাসা করলাম, তা ব্যবসায় রেষারিষি খুব ?

—খুব। আবার মিলও খুব। কোনো ব্যাপারে পরামর্শ দরকার হলে লেডি একমাত্র তার ওই লর্ডের শরণাপন্ন হয়। তা এতবড় কারবার

চালাতে পরামর্শের তো হামেশাই দরকার। লর্ডটি সে ব্যাপারে উদার এবং মুক্ত-মস্তিষ্ক।

॥ দুই ॥

দুজনকেই দেখেছি। যশোমতী পাঠককে সম্মেলনের প্রতি দিনই। শঙ্কর সারাভাইকে একদিন। কিন্তু সেই একটা দিনের চিন্তা অজ্ঞাত অনেকগুলো দিনের মধ্যে প্রসারিত হতে চেয়েছে।

মূল সভাপতি একজন। শাখা সভাপতি এবং প্রধান অতিথির সংখ্যা অনেক। কিন্তু সভানেত্রীও একজন। যশোমতী পাঠক। অবশ্য সেটা স্থানীয় সম্পাদকের উদাত্ত ঘোষণায় জানা গেছে। সভানেত্রীর নীরব উপস্থিতি ছাড়া আর কোনো কাজ আছে বলেই মনে হয়নি আমার। বক্তৃতা করা দূরে থাক সভাপারিষদদের সঙ্গে উঁচু ডায়াসে গিয়েও বসেনি। সামনের সারির শ্রোতাদের এক পাশে একটা নির্দিষ্ট আসনে প্রত্যহ চুপচাপ বসে থাকতে দেখা গেছে তাকে। ত্রিপুরারি তার হয়ে সুপারিশ করেছে, বলেছে কর্মী যে যত প্রবল তার দুই ঠোঁট ততো বেশি সেলাই করা, বুঝলে? ওই মহিলা একদিন না এলে এমন জম-জমাট সভা-ঘর নীরস লাগত সকলের। এসে যখন ঢোকে, কেমন লাগে বল তো?

শেষের উক্তিতে আতিশয্য ছিল না। এই বিশাল হল্-ঘরে মহিলার পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার কর্মকর্তাদের চোখে-মুখে এক ধরনের নীরব অথচ উৎফুল্ল তৎপরতা লক্ষ্য করেছি। আর সমবেত স্থানীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাদের সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেও দেখেছি। অভ্যস্ত সহজ সৌজন্যে এই শ্রদ্ধা গ্রহণ করে হাসিমুখে সহস্রজোড়া চোখের ওপর দিয়ে এগিয়ে এসে সে মঞ্চের সামনের আসনটি গ্রহণ করেছে। সেই আসনও তার জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। প্রথম দিন স্থানীয় উদ্যোক্তারা শশব্যস্তে তাকে মঞ্চের আসনে নিয়ে বসাতে চেয়েছিল। হাসিমুখে মহিলা শুধু একবার হাত নেড়ে

দিয়ে সামনের আসনটিতে বসে পড়েছিল। তারপর রোজই সেই আসনে বসছে।

লক্ষ্য শুধু আমি নয়, সকল অতিথিবর্গই করেছে।

ত্রিপুরারি চল্লিশ বছর বয়েস বলেছিল মহিলার। আর তারপর পনেরোটা বছর ছেঁটে নিতে বলেছিল তার থেকে। অতিশয়োক্তি করেনি। ···আর তার চেহারা প্রসঙ্গে আমার কৌতূহলের জবাবে বলেছিল, সামনে এসে দাঁড়ালে হিসেব-পত্র ভুল হবার মতো। সেই কাঠখোট্টা উপমা শুনে রূপসী বোঝা গিয়েছিল। সুখের ঘরে এই রূপের বাসা অভাবনীয় কিছু নয়। অর্থও রূপ বাড়ায়। সেই রূপ কিছুটা দেখা আছে। সেই রূপের থেকে চিত্ত বিচ্ছিন্ন করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আমার চোখে সব থেকে বেশি লোভনীয় যেটুকু মনে হয়েছে, সেটা মহিলার ঐশ্বর্যের ছটাও নয়, রূপের ছটাও নয়। সেটা রমণী-মুখের প্রায়-নিরাসক্ত কৌতুক-মাধুর্য। শুধু সেইটুকু লক্ষ্য করে দেখলে অ-শিল্পীরও শিল্পী হতে সাধ হতে পারে। সারাক্ষণ সেই কৌতুক যেন নিঃশব্দে একটু হাসি হয়ে চোখের পাতায় আর ঠোঁটের ফাঁকে টলমল করছে।

ত্রিপুরারির মুখে এত কথা শোনা না থাকলে আমি এভাবে দেখতুম কিনা জানি না। সমস্তক্ষণের মধ্যে কতবার চোখদুটো ওই মুখের দিকে ধাওয়া করেছে, পাশে বসেও চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট ত্রিপুরারি ঘোষ তা খেয়াল করেনি। খেয়াল করলে আমার লজ্জার কারণ হতে পারত। কারণ অভিযোগটা সকলরবে সে তার গৃহিণীর কাছে পেশ করত।

আলাপ ঠিক নয়, তবে প্রথম দিনের অধিবেশনেই পরিচয় হয়েছিল মহিলার সঙ্গে। উদ্যোক্তাদের মারফত নিতান্ত আনুষ্ঠানিক পরিচয়। মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত জোড় করে অভিবাদন গ্রহণ করেছে এবং জানিয়েছে। অন্যদের বেলায় এটুকুতেই শেষ হয়েছে, আমাকে শুধু বলেছে, আপনার কথা ঘোষবাবুর মুখে শুনেছি।

বলা বাহুল্য, আমি খুব কৃতার্থ বোধ করিনি। ত্রিপুরারিকে

ঘোষবাবু না বলে মিস্টার ঘোষ বললে কানে একটু অন্যরকম লাগত কিনা বলতে পারি না। অস্বস্তিকর অনুভূতিটা গোপন করা সহজ হচ্ছিল না খুব। ত্রিপুরারি আমার বন্ধু। আর ঘোষবাবু এর বেতনভুক কর্মচারী। তুলনা দিতে হলে কুবের-নন্দিনীর দ্বাররক্ষী উপমাটাই মনে আসে। বন্ধুকে ভালোবাসি, কিন্তু ঘোষবাবুর মতো অনুগ্রহভাজন হতে চাই না।

অবশ্য এটা নিতান্ত ব্যক্তিগত একটা বে-খাপ্পা অনুভূতির ব্যাপার। বিশ্লেষণ করতে বললে অনেক রকম ব্যাখ্যা করে নিজের দুর্বলতা চাপা দেওয়া যেতে পারে। সে চেষ্টা করব না। সেই মুহূর্তে আমি মহিলার ঘোষবাবুর কথা ভাবিনি, নিজের কথাই ভেবেছি। আমার আসন শ্রোতাদের সঙ্গে। কিন্তু ওই ডায়াসের ওপরেও হতে পারত। কর্মকর্তাদের অনেক টানা-হেঁচড়া সত্ত্বেও কোনো শাখার ভার নিতে আমি রাজি হইনি। এখানে আসার সেটাই শর্ত ছিল—শ্রোতা হব, বক্তা নয়। সেজন্যে অবশ্য খেদ নেই এখনো, কিন্তু তবু মানুষের নিভৃতের কারিকুরি বড় বিচিত্র। মহিলার মুখে ঘোষবাবু শুনেই কেমন মনে হল, আমার আসনটা আর একটু উঁচুতে, অর্থাৎ, ওই ডায়াসের ওপরে হলে মন্দ হত না।

তৃতীয় অধিবেশন-শেষে বিকেলের দিকে শঙ্কর সারাভাইয়ের দর্শন মিলল। ইতিমধ্যে ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে কৌতূহল আরো একটু বেড়েছে। কেন, সেটা পরের প্রসঙ্গ। হল্-ঘরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে অনেককে ঘাড় ফেরাতে দেখে বোঝা গেল গণ্যমান্য কেউ এলো। ত্রিপুরারি আমার পাঁজরে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, শঙ্কর সারাভাই!

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসিমুখে অনেকের অভিবাদনের জবাব দিতে দিতে এগিয়ে এলো। সৌম্যদর্শন লম্বা-চাওড়া মূর্তি। গায়ের রং কালোর দিক ঘেঁষা। মাথার ঝাঁকড়া চুলের দু'দিকে পাক ধরেছে। কপালের চামড়ায় গোটা দুই ভাঁজ পড়ে আছে। সেটা বয়সের নয়, প্রাজ্ঞ গাম্ভীর্যের নিদর্শন। অবশ্য, ত্রিপুরারির হিসেব ধরে ভদ্রলোকের বয়েস ঠিক পঁয়তাল্লিশ মনে হয় না, আরো কিছু বেশি মনে হয়।

পরনে ঢোলা পা-জামা, গায়ে লম্বা ঝুলের গরদের পাঞ্জাবি।

সব মিলিয়ে এক জোরালো পুরুষের মূর্তিই বটে।

কিন্তু এই মূর্তি পর্যবেক্ষণে আমি বেশি সময় অপচয় করিনি। আমার দু-চোখ ধাওয়া করেছে ও-পাশের দু'সারি আগের রমণীর মুখের দিকে। এই একজনের আবির্ভাবে সঙ্গে সঙ্গে ওই মুখের রং বদল দেখব এমন আশা অবশ্য করিনি। তবু, ত্রিপুরারির সকল বচন সত্য হ'লে দৃষ্টি আপনা থেকেই ওদিকে ছুটবে। না, ব্যতিক্রম কিছু চোখে পড়েনি। কৌতুক-মাধুর্য মেশা মুখখানা আরো একটু নির্লিপ্ত মনে হয়েছে শুধু। কে এলো না এলো সে সম্বন্ধে সচেতন নয় যেন। ...তবে এও নিজের কল্পনা হতে পারে।

ভদ্রলোকের অর্থাৎ শঙ্কর সারাভাইয়ের আজই সভার এই শেষ মাথায় হাজিরা দেবার পিছনে অন্য কোনো আকর্ষণ আছে কিনা, সে-কথা পরে মনে হয়েছে। পরে, অর্থাৎ ঘণ্টাখানেক পরে। আজই এই একজনের শুভাগমন হতে পারে সে-কথা ত্রিপুরারিও বলেনি, অর্থাৎ, তারও জানা ছিল না। হাল্কাগোছের সাহিত্য-প্রোগ্রাম ছিল সেদিন। তারপর গানের আসর। নিছক অনুমান কিনা জানি না, মনে হল এই গানের আসরই তাকে টেনেছে।

এই অনুষ্ঠানে প্রথমেই যে নামটি ঘোষণা করা হল, সেই নাম যশোমতীর। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অভ্যাগতদের বিপুল করতালি। এ-রকম অভ্যর্থনা গানের খাতিরে কি গায়িকার খাতিরে পাশে ত্রিপুরারি থাকলে জিজ্ঞাসা করতাম হয়তো। কিন্তু ত্রিপুরারি পাশে নেই, শঙ্কর সারাভাইকে দেখেই সেই যে 'আসছি' বলে উঠে গেছে, এখনো ফেরেনি। এই পরিতোষণও চাকরির দায়ে কিনা জানা নেই।

মহিলা আসন ছেড়ে উঠল। জোরালো আলোয় মুখখানা আরো মিষ্টি, আরো একটু হাসি-হাসি দেখাচ্ছে। তাকে আপ্যায়ন করে নেবার জন্য দু'জন ভলান্টিয়ার দৌড়ে এলো। ঈষৎ মন্থর পায়ে যশোমতী ডায়াসে উঠে গেল। মানুষের মাথায় ঠাসা বিশাল হল্-

ঘরটার মেজাজই বদলে গেছে যেন। অনেক সজাগ, অনেক সজীব। নিজের অগোচরে এবারে আমার দুচোখ শঙ্কর সারাভাইকে খুঁজছে। কিন্তু ভদ্রলোক যে কোন্ দিকের কোন্ সারিতে বসেছে ঠিক্ ঠাওর করা গেল না।

গান হল। শ্রোতাদের সরব সনির্বন্ধ অনুরোধে পর পর তিনটে গান।

একটা ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পাইনি। আসরে বসে গান অজস্র শুনেছি। সে-দিক থেকে একেবারে মোহিত হবার মতো কিছু শুনলাম, এমন বলব না। বিশেষ করে পাঁচ-মিশালি শ্রোতার আসরের গান খুব গভীর পর্যায়ের না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ক'দিন ধরে সাহিত্যের নানা ধারার ক্লান্তিকর জটিলতা বিস্তারের পর হঠাৎ যেন কানে ভারী মিষ্টি একটা স্পর্শ এসে লাগল। তাই, শুধু ভালো লাগল বলে অবিচারই করা হবে।

এত ভালো লাগবে আশা করিনি। কান পেতে শোনার মতই মিষ্টি পরিপুষ্ট কণ্ঠস্বর। সহজ, স্বচ্ছন্দ।

গানের সঙ্গে শিল্পীর একটা বিশেষ যোগ আছেই। অন্তত, আমার মত অ-গায়কদের সেই রকমই মনে হয়। সেই যোগটা শিল্পীর চেহারার কি পরিবেশন-মাধুর্যের—ঠিক জানিনে। প্রসঙ্গত কোনো এক বিখ্যাত মহিলা-শিল্পীর গানের আসরে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম একবার মনে পড়ে। গান শুনেছিলাম। সেই গানের তুলনা নেই, তা হয়তো সত্যি। কিন্তু তবু কেন যেন মন ভরেনি। তার কারণ সম্ভবত আগাগোড়া বেশির ভাগ চোখ বুজে শুনতে হয়েছিল বলে। না, সেই মহিলাও রূপসী না হোক একেবারে কুরূপা নয়। তা ছাড়া, গানের আসরে শিল্পীর যে রূপ সেটা আর এক বস্তু, জানি। তবু চোখের প্রসন্নতার বার বার ব্যাঘাত ঘটেছিল তার কারণ, শিল্পীর সঙ্গীত-তরঙ্গের প্রতিটি ঢেউ অস্থির অভিব্যক্তির আকারে শ্রোতার নিবিষ্টতা চঞ্চল করে তুলছিল। পুরুষ শিল্পীদের বেলায় এই ব্যাপারটা অতো বিসদৃশ ঠেকে না যত মেয়েদের বেলায় ঠেকে।

কিন্তু এখানে চোখ-কান-মন ভরে ওঠার মতো স’ফুটই গান। কোনো আবেগের মুখে স্থির শিল্পী হয়তো কখনো একটু দুলে উঠল, কোনো হাল্‌কা রসাবেদনের মুখে হয়তো মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, কোনো দ্রুত বিন্যাসের মুখে তবলচির আসুরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে গানের মধ্যেই ফিক করে হেসে উঠল কখনো। এই আসরে শোনার থেকেও সঙ্গীতের এক মূর্তিমতী রূপ সুসম্পূর্ণ।

গান শেষ। আবার অনুরোধের সুযোগ না দিয়ে মহিলা সোজা উঠে পড়ল। প্রস্থানের ভঙ্গী দ্রুততর। এবারে দ্বিগুণ হাত-তালি। আবার আমি নীরবে সারাভাইকে খুঁজলাম একপ্রস্থ। চোখে পড়ার আগে পিঠে খোঁচা।

ত্রিপুরারির উদ্ভাসিত মুখ।—কেমন শুনলে ?

কৃতিত্বটা যেন তারই।

জবাব দেবার অবকাশ পেলাম না। অনেকের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরারিরও সামনের দিকে দৃষ্টি ঘুরেছে। আগের মতই পরিচিতদের উদ্দেশে হাত তুলে নমস্কার জানাতে জানাতে হাসিমুখে ডায়াসের লাগোয়া সারি থেকে এদিকে আসছে শঙ্কর সারাভাই। বলা বাহুল্য, এই আসা এবং এই নমস্কার বিদায়সূচক।

যশোমতী পাঠক তার পূর্বাসনে। তার পাশ দিয়েই শঙ্কর সারাভাই এগিয়ে এলো। দেখলাম, সে একনজর তাকালো মহিলার দিকে। কিন্তু মহিলার দৃষ্টি সামনের ডায়াসের দিকেই। সেখানে যন্ত্র-সঙ্গীত, অর্থাৎ সেতার-বাদনের তোড়জোড় চলেছে। রমণীর হৃদয়-যন্ত্র গোটাগুটি নির্লিপ্ত।

—সার!

ত্রিপুরারি তখনো পাশে দাঁড়িয়েই ছিল। তার বিনয়-বিগলিত আহ্বানে আমার রমণীর রীতি দেখার একাগ্রতায় ছেদ পড়ল। ঠিক পথ আগলে নয়, একটু পথ ছেড়ে দিয়েই কাজের উদ্দেশে ত্রিপুরারির এই সসম্ভ্রম আহ্বান।

মিলিয়নেয়ার মিল-ওনার শঙ্কর সারাভাই দাঁড়িয়ে গেল। ব্যস্ত-

সমস্ত ত্রিপুরারি এবারে শশব্যস্তে আমার হাত ধরে এক টান। তারপরেই গড়গড় করে আমার পরিচয় দিয়ে গেল। সেই পরিচয় শুনলে যে-কোন লেখক ওকে প্রচার-সচিবের পদে বহাল করার ইচ্ছেটা মনে মনে অন্তত পোষণ করবে। সারাভাইয়ের সঙ্গে ত্রিপুরারি কথা বলল হিন্দীতে। এরই ফাঁকে আমি যে ওর ছেলেবেলার একাত্ম বন্ধু—সেই সমাচারও অব্যক্ত থাকল না। আর অবশেষে লেডি অর্থাৎ যশোমতী পাঠকের সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং একান্ত আগ্রহে আমার এখানে পদার্পণ—এটুকুর মধ্যে সেই অতিশয়োক্তিও অনুক্ত রইল না।

ত্রিপুরারির বেপরোয়া প্রশংসা বচনে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার একটা হাত ভদ্রলোকের পুষ্ট দুই হাতের থাবার মধ্যে চালান হয়ে গেল এবং গোটা দুই ঝাঁকুনি পড়ল।

—সো গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

আমার পাল্টা বিনয়োক্তি। কিন্তু ভদ্রলোকের তুলনায় সেটা অনেক ক্ষীণ। হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে শঙ্কর সারাভাই তড়বড় করে বলে উঠল, কত দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন, উই আর রিয়েলি সো হ্যাপি। আপনারা গুণী লোক, কিন্তু বড় আফসোস এই গুণের খবর আমি কিছুই রাখি না। রাখেন যিনি তিনি ওই যে—উনিই আপনাদের রিয়েল অ্যাডমায়ারার।

আঙুল দিয়ে অদূরবর্তিনী মহিলা, অর্থাৎ যশোমতীকে দেখিয়ে দিল। ত্রিপুরারিকে জিজ্ঞাসা করল লেডির সঙ্গে আমার এক আধ দিন সাহিত্য-চর্চা হয়েছে কিনা। হয়নি শুনে একদিন নিয়ে যেতে পরামর্শ দিল, তারপর শুভেচ্ছা জানিয়ে হাসিমুখে প্রস্থান করল।

মনের আনন্দে ত্রিপুরারি কি বলে যাচ্ছে কানে ঢোকেনি। আমার দৃষ্টি এই সামনের দিকে দু'সারি আগের আসনের দিকে। একটানা এতক্ষণ গানের পর মহিলার বসার শ্রান্ত ভঙ্গিটুকুও মিষ্টি। গান শেষ হতেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি যে প্রস্থান করল সে সম্বন্ধেও তেমন সচেতন মনে হল না। ত্রিপুরারি বকেই চলেছে। আমার অভিলাষ নিজের কাছেই প্রায় অগোচর তখনও।

যন্ত্র-সঙ্গীতের কদর কণ্ঠসঙ্গীতের তুলনায় কম-বেশি সর্বত্রই এক-রকম। শুধু শঙ্কর সারাভাই নয়, অনুষ্ঠানের তোড়জোড় শেষ হবার আগেই অনেকে উঠে দাঁড়িয়েছে, অনেকে চলে যাচ্ছে। যশোমতীর পাশের আসনে বসে ছিল এক স্থানীয় বৃদ্ধা। কে জানি না। সে-ও উঠল এবং দরজার দিকে পা বাড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে দম ফুরানো যন্ত্রের মত ত্রিপুরারির মুখের কথা অসমাপ্ত থেকে গেল। কারণ, আমি আর তখন পাশের চেয়ারে নেই।

কেন উঠলাম, বলা নেই কওয়া নেই প্রস্তুতি নেই—কেন সামনে এসে দাঁড়ালাম, কেন অভিনন্দন জানানোর লোভ সংবরণ করা গেল না, তার সঠিক বিশ্লেষণে অক্ষম। এই গান শোনার পর সামনে আসতে বা অভিনন্দন জানাতে মনে মনে হয়তো অনেকেই চেয়েছে। কিন্তু মনে মনে চাওয়া আর সরাসরি উঠে আসার মধ্যে তফাত আছে। শিল্পী যদি বয়েসকালের কোনো রমণী হয় (যদিও এ-ক্ষেত্রে বছরের হিসেব ধরে বয়েসকালের বলা চলে না) সাধারণত একটু বাড়তি প্রশংসা তার প্রাপ্যর মধ্যেই গণ্য। সেই রমণী যদি সুরূপা হয়, প্রশংসা তাহলে স্তুতির আকার নিয়ে থাকে। আর সেই গুণবতী সুরূপা রমণী যদি অফুরন্ত বিত্তের অধিকারিণী হয়, তাহলে তার আকর্ষণ বোধকরি এমনিই দুরতিক্রম্য। এমন কেন হয় আমার জানা নেই।

মহিলা ঈষৎ সচকিত। কিছু একটা তন্ময়তায় ছেদ পড়ল যেন। সোজা হয়ে বসে তাকালো।

সবিনয়ে বললাম, আপনার গান শোনার পর মনে হচ্ছে এখানে আসা সার্থক হল।

যশোমতী পাঠক বিব্রত মুখে হাসল একটু। অস্ফুট সৌজন্যে বলল, ধন্যবাদ···

কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি কি-রকম ধাক্কা খেলাম একটু। এরকম সাদা-মাটা প্রায় নির্লিপ্ত ভব্যতার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমার স্পষ্টই মনে হল, তিন দিন আগের সেই এক মিনিটের পরিচয় মহিলা

ভুলে গেছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ দর্শক বা শ্রোতার আসনের অভ্যাগত আমি। তাছাড়া, আরও কতজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সেদিন। সকলকে মনে করে না রাখতেও পারে। কিন্তু তা হলেও ত্রিপুরারির এত আগ্রহ করে আমাকে এখানে টেনে আনার সঙ্গে সুদর্শনার এই মাপা সৌজন্য ঠিক যেন মিলছে না। ত্রিপুরারি লিখেছিল, লেডি আমাকে প্রত্যহ তাগিদ দিচ্ছে তুমি আসছ কি না···। ফলে এ রকম ভুল আমার বিবেচনায় অন্তত খুব বাঞ্ছিত নয়। তাছাড়া ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালী দেখেও, আর আসা সার্থক হয়েছে শুনেও খেয়াল হবার কথা।

আমি কি আশা করেছিলাম? ওইটুকুই আশা করেছিলাম হয়তো। আশা করেছিলাম আর পাঁচজনের থেকে আমার এই প্রশংসার একটু মূল্য বেশি হবে, মহিলা খুশি হবে। আর হয়তো আশা করেছিলাম, পাশের শূন্য আসনটি দেখিয়ে আমাকে বসতে বলবে। তার বদলে আধা-ভাঙা আসরের যন্ত্রসঙ্গীত যে বেশি মনোযোগের বিষয় হবে, ভাবিনি।

অতএব আমি কি করলাম, পাঠক সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন। পাঁচ-সাত-দশ সেকেণ্ড বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। সেটুকুই দীর্ঘ এবং অশোভন মনে হতে বোকার মতো হাসলাম একটু। তারপর আবার নমস্কার জানিয়ে পিছনে ফিরে ত্রিপুরারির পাশে এসে বসলাম। তারপর মনে মনে নিজের উদ্দেশে কটূক্তি করতে থাকলাম। মর্যাদা-বোধ আহত হলে কখনো কখনো সেটা ঠুনকো বস্তুর মতই ভেঙে পড়তে চায়।

কিন্তু ত্রিপুরারির সবুর সয় না, ফিরে আসা মাত্র সাগ্রহে চড়াও হল আমার ওপর।—তুমি হঠাৎ উঠে কি বলে এলে?

রাগটা অকারণে ত্রিপুরারির ওপরেই ঝাড়তে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু নিজের দোষে বোকা বনেছি, ওর দোষ কি। বললাম, গানের প্রশংসা করে এলাম।

খুশি হল খুব? কি বলল?

—ধন্যবাদ দিল।

নিজেকে সান্ত্বনা দেবার দায়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছি—বাংলা সাহিত্যের অধিবেশন বলে আমার মতো ধুতি-পাঞ্জাবির সংখ্যাই বেশি, অতএব মহিলার চিনতে না পারাটা আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু অনুভূতি সব সময় যুক্তি ধরে চলে না। ভিতরে ভিতরে অস্বস্তিজনক কিছু একটা বিঁধছেই। কেবলই মনে হচ্ছে মস্ত ধনী কন্যাকে গায়ে পড়ে প্রশংসা করতে যাওয়ার মতো হয়েছে ব্যাপারটা।

ত্রিপুরারি তার লেডির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠার খোরাক পেয়েছে যেন। বাজনা শোনাটা ওর কাছে বিলাপ শোনার মতো। সাগ্রহে ঘুরে বসে বলল, শুধু গান? ও-দিকে এম-এ পাস, জানো? আজ না হয় এখানে মেয়েদের মধ্যে বি-এ এম.-এ'র ছড়াছড়ি—বিশ বছর আগে তো হাতে গোণা যেত। তাছাড়া, আরো অনেক রকমের গুণ আছে মহিলার, বক্তৃতা করে চমৎকার। —কিছুদিন থেকে যাও যদি তোমাকে শোনাব। তারপর এখানকার লেডিস ক্লাবের সে-ই ফাউণ্ডার-প্রেসিডেন্ট—বিশ বছর আগে তারই চেষ্টায় হয়েছিল। গোড়ায় অনেকে আপত্তি করেছিল, এখন লেডিস ক্লাব জম-জমাট। আর এবারে তো পুরুষদেরও টেক্কা দিয়ে একেবার চেম্বারের প্রেসিডেন্টই হয়ে বসেছে।

আমি বাজনায় মন দিয়েছি। দিই না দিই বাজনা শোনায় গুরুগম্ভীর নিবিষ্টতা আনতে চেষ্টা করেছি। মনে মনে নিজেকে যে প্রত্যাখ্যাত গোছের ভেবে আহত, এত গুণের ফিরিস্তি তার কানে আরো পীড়াদায়ক। অন্তত তখনকার মতো। জিজ্ঞাসা করলাম, এ-রকম শিক্ষিতা হয়েও তোমাকে ঘোষবাবু বলে কেন?

ত্রিপুরারি জবাব দিল, এখানে সকলেই ওই রকম বলে।

পরদিন সুন্দর একটি ছাপা কার্ড পেশ করল ত্রিপুরারি। আমন্ত্রণ-লিপি, সোনা-রঙের ছাপার নিচে সোনালী অক্ষরে যশোমতী পাঠকের নাম। পাঁচ দিনের অধিবেশন-শেষে প্রবাসী অতিথিবর্গের সম্মানার্থে

পার্টি। শ্রীমতী পাঠক তার বাড়িতে ব্যক্তিগত ভাবে এই পার্টি দিচ্ছে। স্থানীয় প্রধান বা প্রধানার তরফ থেকে এ-ধরনের পার্টির ব্যবস্থা নতুন কিছু নয়।

এও যে আর একটা বাড়তি অবজ্ঞার মতো লেগেছে সেটা ত্রিপুরারিকে বুঝতে দেবার ইচ্ছে ছিল না। আমন্ত্রণ-লিপি দেখে নিয়ে খুব সাদাসিদেভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কর্ত্রীর হয়ে তুমিই নেমন্তন্ন করে বেড়াচ্ছ বুঝি?

একটা সুবিধে, আয়-ব্যয় জমা-খরচের জটিলতায় ত্রিপুরারির যত মাথা খোলে, এ-সব সামাজিক ব্যাপারে ততো নয়। এই প্রশ্নের ফলে ওর মনে এতটুকু ছায়াপাত হোক, সেটা চাইনি তার ভিন্ন কারণ; আমার মেজাজের আঁচ পেলে সেটা ওর পক্ষে বিড়ম্বনার ব্যাপার হবে। হয়তো বোঝাতে বসবে আমিই ভুল করেছি। তাই কিছু খেয়াল না করার মতো করেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ত্রিপুরারি খেয়াল করলও না।

জবাব দিল, বাড়ির গায়ের গেস্ট কোয়ার্টার্সের সব সাহিত্যিকদের নিজেই বলেছে, আর এদিককার দু-দশজন যাদের বলা হচ্ছে, তাদের ভার আমার ওপর। চিঠি নিয়ে এখন ক' জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে, ঠিক নেই।

যাক, নিশ্চিন্ত। মনের তলায় শুধু একটা অস্বস্তি, আমার কোনো আচরণে ত্রিপুরারি না আঘাত পায়। যার জন্যে ছোটাছুটি করে তার আনন্দ, তার সঙ্গে ওর রুটির যোগ, চাকরির যোগ, ভবিষ্যতের যোগ। আমার আচরণে ও এদিক থেকে কিছুমাত্র সচেতন হলে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না। মহিলার গেস্ট কোয়ার্টার্সে আমি থাকিনি ত্রিপুরারির অন্তরঙ্গতার টানাপোড়েনে পড়ে। কিন্তু আমি যে এখানকার দু-দশজনের একজন নই, আমিও যে বহিরাগত অতিথি —সেটা ত্রিপুরারির মনে না থাকুক, ওই মহিলার মনে না থাকাটাও ঠিক বরদাস্ত হবার কথা নয়। গত দিনের ব্যবহারের পর এই নিজে নিমন্ত্রণ না করাটা শুধু কর্মচারীর বন্ধু বলে, এ-ছাড়া এই অবজ্ঞার আর কোন কারণই মনে আসেনি আমার।

অতএব শরীরটা সেই দিনই আমার খারাপ হল একটু। কর্ত্রীর বাড়ির নেমন্তন্ন দুদিন পরে, তাই ত্রিপুরারির কিছু আঁচ করা সম্ভব হল না। পরদিন স্ব-ঘটিত শরীর-খারাপের মাত্রা আরো একটু বাড়াতে হল। ত্রিপুরারিকে জানালাম, মাথা ভার, গা ম্যাজ ম্যাজ করছে—অতএব সাহিত্য-সম্মেলনের সেটা শেষ দিন হলেও যাই কি করে. ত্রিপুরারি নিজেই ডাক্তারী করল, ডায়েটিংয়ের ব্যবস্থা করে দিল, মাথা ধরার বাড় রেখে গেল। ওকে তো বেরুতেই হবে, মাথার ওপর অনেক দায়। খাওয়ার ওপর যেমন অত্যাচার চলেছে ক'দিন ধরে ডায়েটিংয়ে আমার আপত্তি নেই। মাথা ধরার ওষুধ অবশ্য কাজে লাগানো গেল না। মাথা কিছু খাটাতে হচ্ছে, তাই মাথা একটু-আধটু ধরা বিচিত্র ছিল না। কিন্তু না ধরলে কি আর করা যাবে।

আর তার পরদিন অর্থাৎ পার্টির দিন তো শরীর একটু বেশিই খারাপ। বেশি কি? পেটের গোলযোগ? কোনো ভদ্রমহিলার কাছে, বিশেষ করে যশোমতী পাঠকের মতো মহিলার কাছে রিপোর্ট করার মতো ভদ্রগোছের অসুখ নয় ওটা। ওদিকে দশবার করে গায়ে হাত দিয়ে দেখছে ত্রিপুরারি। জ্বরও বলতে পারি না। তাহলে বাকি থাকল বুকের দিকটা। ত্রিপুরারি জানল বুকে একটু-আধটু ব্যথা, যা নাকি আমার মাঝে-সাজে হয়, আর একটানা চব্বিশটা ঘণ্টা বিশ্রাম নিলেই আবার বিনা ঝামেলায় আপনা থেকেই দিব্বি সেরে যায়।

...ওষুধ!

ত্রিপুরারির ব্যস্ততা ঘন হবার আগেই তাড়াতাড়ি বলতে হল, ও একটু-আধটু ওষুধ আমার সঙ্গেই থাকে, ঘাবড়াবার মতো কিছু নয় বলছি তো। তুমি আর দেরি কোরো না, পালাও এখন।

না ঘাবড়ালেও ত্রিপুরারির মন যে খারাপ হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পার্টিতে আমার যাওয়া সম্ভব হল না বলে ঘুরে ফিরে বহুবার খেদ প্রকাশ করেছে। তার আগে মুহুর্মুহু বুকের খবর নিয়েছে। গাড়ি করে আধঘণ্টার জন্যে ঘুরে আসা যায় কিনা সেই

প্রস্তাব অনেকবার করেছে। সঙ্গে ডাক্তার থাকলে যাওয়া চলে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে. শেষে ওর বউয়ের কাছে চাপা ধমক খেয়ে হাল ছেড়েছে। মনিবদের এ-ধরনের অনুষ্ঠানে ওদের ব্যস্ত থাকতেই হয়, অতএব শেষ পর্যন্ত একাই যেতে হল তাকে।

বিকেলে নিশ্চিন্ত মনে বাগানে ঘোরাঘুরি করছিলাম। ত্রিপুরারি-গৃহিণী এমনিতেই মিতভাষিণী, তার ওপর এই দ্বিতীয়বার মাত্র সাক্ষাৎ। মহিলা অতিথিপরায়ণা, কিন্তু তার সঙ্গে আড্ডা জমানো শক্ত। বহুবার শরীরের খবর নেওয়ায় অস্বস্তি বোধ করছিলাম। বিকেলের দিকে বেশ ভালো আছি এবং বাগানে একটু বেড়ালে আরো ভালো লাগবে শুনে সে নিশ্চিন্ত মনে ঘরের কাজে মন দিয়েছে। আর, একটু বাদেই পার্টি প্রসঙ্গ বা নিজের অসুস্থতার প্রসঙ্গ আমার মন থেকেও সরে গেছে।

বাড়ির দরজায় গাড়ি দাঁড়াল একটা।

গাড়ি থেকে একজন স্থানীয় অপরিচিত লোক নামল। তার হাতে ছোট ব্যাগ আর স্টেথোস্কোপ। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল, তারপর এগিয়ে এলো। আমি হতভম্ব। তাকে দেখা মাত্র মনে হল আমিই তার শিকার।

এগিয়ে এসে ভদ্রলোক ইংরেজিতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করল, অর্থাৎ আমিই ওমুক কিনা। বোকার মতো ঘাড় নাড়তে চিকিৎসকের চোখে একটু নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে আপনার? বুকে হঠাৎ কি-রকম ব্যথা বোধ করছেন শুনলাম? মিস পাঠক টেলিফোন করে এক্ষুনি আপনাকে একবার দেখে যেতে বললেন...

এ রকম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হবে কে ভেবেছিল? বাংলা দেশের বাসিন্দা, চিকিৎসককে এত অবাঞ্ছিত আর বোধহয় কখনো মনে হয়নি। ওদিকে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে দরজার কাছে ত্রিপুরারির স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছে। অতিথি এবং স্বামীর অন্তরঙ্গ অসুস্থ বন্ধুর প্রতি তাঁরও কর্তব্যবোধ কিছু আছে। পরিস্থিতিগুণে আমি অসহায়।

মিথ্যার সতেরো জ্বালা। কি সব বলে গেছি বা বলতে চেষ্টা করেছি সঠিক মনে নেই। মোট কথা, ডাক্তারকে বোঝাতে হয়েছে শরীর সামান্য খারাপ হয়েছিল বটে কিন্তু এখন সুস্থই বোধ করছি। এখানে এসেই একটু অনিয়ম করা হয়েছে, একটু বেশি ছোটাছুটি করা হয়ে গেছে, খাওয়া-দাওয়ারও বেশি চাপ গেছে—দু'দিন একটানা বিশ্রাম নিয়ে এখন ভালই লাগছে। শুধু ভালো না, এখন আর কোনো গোলযোগের লেশ মাত্র নেই। ওঁদের এভাবে বিব্রত করার দরুন লজ্জিত, তাঁকে ধন্যবাদ, মিস পাঠককে ধন্যবাদ, ইত্যাদি, ইত্যাদি—।

কিন্তু শুধু ধন্যবাদ পকেটে পুরে ভদ্রলোক বিদায় নিল না। কারণ, সে আমার অথবা আমার অসুখের তাগিদে আসেনি। এসেছে যার নির্দেশে ফিরে গিয়ে তাকে রিপোর্ট করতে হবে। অগত্যা বাগানের বেঞ্চে বসেই শরীরটাকে দু'পাঁচ মিনিটের জন্য অন্তত তার হেপাজতে ছেড়ে দিতে হল। ত্রিপুরারি-গৃহিণীও পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। গুরুগম্ভীর পর্যবেক্ষণ পর্ব শেষ করে প্যাড বার করে খসখস করে একটা প্রেসকৃপশন লিখে ডাক্তার বলল, এটা খেলে কালকের মধ্যেই আরোগ্য হয়ে যাবেন।

ডাক্তার বিদায় নিতে ত্রিপুরারি-গৃহিণীর মুখোমুখি হবার পালা। সাদা-মাটা মহিলা মৃদু মন্তব্য করল, খানিক আগেও যা ছিলেন তার থেকে তো অনেক ভালো মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, এক্ষুণি ওই ওষুধ-টষুধ আনাবার দরকার নেই...।

চোখের আড়ালে বা অধর কোণে কৌতুকের আভাস দেখলাম কি? একটু চুপ করে থেকে ত্রিপুরারি-গৃহিণী বলল, কিছু হয়ইনি বোধ হয়...। চলে গেল। আমার সন্দেহ হল কেমন, যতটা সাদাসিধে একে ভেবেছিলাম ততোটা যেন নয়।

আরো কিছু বাকি ছিল।

সন্ধ্যায় আর পরদিন সকালে সতীর্থরা অনেকেই আমাকে দেখে

যাওয়া কর্তব্য বোধ করল। কিন্তু তাঁদের সহৃদয়তায় মুগ্ধ বলেই প্রায় নির্বাক আমি। বুঝলাম, কর্ত্রীর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারার মতো অসুখটা মোটেই খুব ছোট করে প্রচার করেনি ত্রিপুরারি। পার্টির সাহিত্যিক বন্ধুরা সকলেই জেনেছে আমি বে-খাপ্পা রকমের অসুখে পড়ে গেছি। অতএব দলে দলে তারা এসেছে, দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছে, আর উপদেশ দিয়ে গেছে।

এ-ধরনের সাহিত্য-অধিবেশনে অভ্যাগতদের আসার পিছনে যেমন উৎসাহ, যাবার বেলাতেও তেমনি তাড়া। এলো, অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে অনুষ্ঠাতাদের রুটিনমাফিক ব্যবস্থা অনুযায়ী হুড়মাড় করে দেখার যা আছে দেখা হয়ে গেল—অধিবেশন শেষ তো অমনি ফেরার তাগিদ। কটা দিন জীবনটাকে তাড়াহুড়োর মধ্যে রাখার বৈচিত্র্য থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চায় না। কেউ স্বস্থানে প্রত্যাগমন করবে, কেউ বা তেমনি দ্রুত তালে কাছাকাছির আরও দু'একটা নতুন জায়গা হয়ে ফিরবে। কাজেই আমার কাছে সতীর্থদের অবস্থান বা আমার শরীরের জন্য তাদের উদ্‌বেগ দীর্ঘস্থায়ী হল না—এই যা রক্ষা।

যাই হোক, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে সতীর্থদের এই শশব্যস্ত কর্তব্যের পালাও শেষ হল একসময়। হাঁপ ফেলে এরপর ত্রিপুরারিকে নিয়ে পড়লাম আমি। পাছে ওর কোনরকম সন্দেহ হয় এ-জন্যে সেটাই নিরাপদ মনে হল। ওর স্ত্রীর সেই কথা ক'টা কানের পর্দায় অস্বস্তির কারণ হয়ে আছে এখনো। বললাম, বেশ করে ঢাক পিটিয়ে সকলের কাছে প্রায় এখন তখন অবস্থা আমার বলে এসেছ মনে হচ্ছে?

আমতা-আমতা করে ত্রিপুরারি জবাব দিল,···না মানে, অসুখ শুনে মিস পাঠক একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে।

গম্ভীর মুখে বললাম, বড়লোকের ব্যস্ততার ধকল সামলানোও মুশকিল—ব্যস্ততার চোটে একেবারে ডাক্তার এসে হাজির হয়েছিল।

—হ্যাঁ, অসুখ শুনে পাঁচবার করে জিজ্ঞাসা করল কি অসুখ তারপর উঠে গিয়ে নিজেই ডাক্তারকে ফোন করে দিলে।

মুখের গাম্ভীর্য এবারে নিরাপদে একটু তরল করা যেতে পারে

মনে হল।—সে-জন্মেই তো বলছি, পার্টিতে যেতে না পারার কৈফিয়ৎ দেবার দায়ে তুমি আমাকে প্রায় শেষ করেই এনেছ।

ত্রিপুরারি লজ্জা পেল।—কি যে বলো! গেলে না দেখে ভদ্রমহিলা দুঃখ করতে লাগল। শুনলে এক্ষুণি তোমায় গিয়ে দেখা করতে ইচ্ছে করত। এর পর ত্রিপুরারি উল্টো দোষারোপ করল।—সাধে লোকে বলে বাঙালী বাবু, বাংলাদেশে থেকে থেকে তোমরা যা হয়েছ! এখানে ওটুকু শরীর খারাপ আমরা কেয়ারই করি না—আর দু'দিনের মধ্যে তুমি বাড়ি থেকেই নড়লে না, পার্টিতেও গেলে না—জিজ্ঞাসা করলে তেমন কিছু হয়নি বলি কি করে? ভদ্রমহিলা যদি ভেবে বসে ইচ্ছে করেই কাটান দিলে!

আর বেশি ঘাঁটানো যুক্তিযুক্ত নয় মনে হতে সরব হাসির গর্ভে আলোচনার বিলুপ্তি ঘটাতে হল। কিন্তু হাসিটা স্বতঃস্ফূর্ত নয় এখনো, ওর বউ এরপর আবার কিছু মগজে না ঢোকালে বাঁচি।

॥ তিন ॥

পরের দিনটা ছুটির দিন।

ত্রিপুরারির সঙ্গে বেড়াতে বেরুব আগেই স্থির ছিল। ও একটা গাড়ির ব্যবস্থাও করে রেখেছে।

কিন্তু মিথ্যের খেসারত এত সহজে মেটে না। ত্রিপুরারির বেরুবার কোনো উদ্যোগ বা লক্ষণ নেই। জিজ্ঞাসা করতে রায় দিল, এই শরীর নিয়ে বেরিয়ে কাজ নেই, আরো দু'চারদিন বিশ্রাম করে নাও। আছ তো এখন, তাড়া কি—

বিরক্তিকর। গত দু-দিনের অচলাবস্থা কোনরকমে বরদাস্ত করা গেছে, তার ওপর আজও এই কথা। প্রবল প্রতিবাদের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গতি নেই। বললাম, যথেষ্ট বিশ্রাম নেওয়া হয়েছে, আর বিশ্রামে কাজ নেই। আর বিশ্রাম করতে বললে আমি একাই বেরিয়ে পড়ব

বলে দিলাম। তাছাড়া খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার তো নেই, মোটরে ঘুরব—কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। তোমার ছুটি তো আবার সেই সাত দিন পরে।

ত্রিপুরারি অনিচ্ছার কারণ দর্শালো, কিন্তু বউ যে বারণ করে দিল, অসুস্থ মানুষকে নিয়ে বেরুতে হবে না, বন্ধুকে শুয়ে ঘুমুতে বলো।

অগত্যা ওর সুপারিশ না করে ত্রিপুরারি-গৃহিণী সকাশে উপস্থিত আমি। যুক্ত হস্তে নিবেদন করলাম, বাংলা দেশের মেয়ে স্বামীর বন্ধুর প্রতি অকরুণ হয়েছে এমন নজির বড় চোখে পড়েনি, বন্ধুটি আপনাকে যত নিরীহ মনে করে ঠিক ততটাই আপনি নন বলে আমার ধারণা। দয়া করে আপনি ওর মাথায় কিছু ঢোকাবেন না, আর আরো একটু দয়া করে তরতাজা সুস্থ মানুষ দুটোকে একটু চরে বেড়াবার অনুমতি দেবেন, এই প্রার্থনা।

লজ্জা পেয়ে ত্রিপুরারি-গিন্নি হাসতে লাগল। আমি সেটাই ছাড়পত্র ধরে নিয়ে ফিরে এলাম। আর তারপর সন্দেহের উদ্রেক না করে ওকেও রাজি করানো গেল। যদিই দরকার হয় এ-জন্যে সঙ্গে দরকারী ওষুধ-পত্র নিতে পরামর্শ দিল ত্রিপুরারি।

সম্মেলনের অতিথিদের কাছের বা দূরের দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সেই আনুষ্ঠানিক দেখার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া আদৌ সম্ভব হয় না। দেখার তাড়াতেই সেই দেখার পর্ব শেষ হয়ে থাকে। ওই আনুষ্ঠানিক দেখার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিনি। কারণ আমার এখানে থেকে যাওয়ার বা এখানকার এই দেখার পিছনে উদ্দেশ্য কিছু আছেই। এই দেখার সঙ্গে একটা মানসিক যোগ স্থাপন করাই বিশেষ উদ্দেশ্য।

প্রথম দর্শনে জায়গাটা যে ভালো লেগেছিল তার প্রধান কারণ সম্ভবত সাবরমতী। সাবরমতীর নীলাভ জল। শহরের মাঝখান দিয়ে সাবরমতীর ধারা দেখতে দেখতে মনটা কখনো সুদূর অতীতে উধাও হয়েছে, কখনো বা সদ্য বর্তমানে ঘোরা-ফেরা করেছে। আর ছোট-বড় এত সেতু-বন্ধ দেখে দেখে ভিতরে ভিতরে কি এক সেতু

রচনার প্রচ্ছন্ন উদ্দীপনা উকি-ঝুঁকি দিয়েছে।

লিখব কিছু। কিন্তু কি লিখব সেটা নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় একটুও। ঘুরতে ঘুরতে কখনো ইতিহাস চোখ টেনেছে, কখনো বা সদ্যগত অতীত। এই দেখার মধ্যে আজকের বর্তমানটি শুধু একপাশে সরে দাঁড়িয়ে আছে। এই বর্তমানটাকে সাবরমতী যেন আমারই মতো দেখছে চেয়ে চেয়ে। না, আমার মতও নয়, আমার থেকেও শান্ত নির্লিপ্ত।

সাবরমতীর দু-ধারের এই জন-জীবনের কূল স্থাপন সুদূর অতীতের কাহিনী। প্রায় সাড়ে বারশ' বছর আগের এই অরণ্য অঞ্চল ছিল ভীলদের দখলে। ভীলপ্রধান আসা ভীল—তার নামে জায়গার নাম আসাওয়ল। তখন থেকে সাবরমতী এখানকার মানুষদের কৃষি বাণিজ্য শিখিয়েছে—সমৃদ্ধির আসন বিছিয়ে বসতে শিখিয়েছে।

এর পর মুসলমান কালের ইতিহাস। স্মরণীয় ইতিহাস নয়, কিছুটা রক্তপাতের ইতিহাস, কিছুটা বা ভাস্কর্য-শিল্পের ইতিহাস। গুজরাট-শাসক মজফ্‌ফরের বিদ্রোহী পুত্র দুর্ধর্ষ তাতার খাঁ পিতাকে বন্দী করেছিল এই আসাওয়লে। তারপর দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজ-সিংহাসনে বসেছিল তাতার খাঁ।

কিন্তু ক্ষমতা-অন্ধ নবীন বিদ্রোহী জানত না, মৃত্যু হাসছিল তার পিছনে দাঁড়িয়ে। তার হিসেবের সঙ্গে ওপরঅলার হিসেব মেলেনি। ওই সিংহাসন তখন আসলে প্রস্তুত মজফ্‌ফর-পৌত্র আহমদ শাহকে গ্রহণ করার জন্য। তারই কাছে রক্তের বিনিময়ে নতিস্বীকার করবে প্রতিবেশী রাজপুত আর মালবরাজ—আহমদ শাহ প্রতিষ্ঠিত করবে স্বাধীন গুজরাট—পরের ইতিহাসের এই বিধিলিপি।

কিন্তু বিধিলিপিরও পরমায়ু আছে। ষোল শতকে গুজরাটের ভাগ্যবিধাতা বদলেছে। মোগল-রাজ আকবরের ভ্রূকুটি-শাসনগত হয়েছে এই দেশ। আর জাহাঙ্গীরের সময়ে গুজরাটের এই অঞ্চল দেখেছে রমণীর শাসন। ভাবতে ভালো লাগছে, একটি নয়, এই শহরের ওপর দিয়ে দুটি প্রতিস্পর্ধী রমণীর লীলাধারা উচ্ছল হয়ে

উঠেছিল সেদিন। এক রমণী নদী সাবরমতী—দ্বিতীয় রমণী জাহাঙ্গীর-মহিষী নূরজাহান।…লিখতে বসে হঠাৎ প্রতিস্পর্ধী শব্দটাই কলমে এলো কেন জানি না। এই দুই রমণীর যৌবনধারায় কতটা মিল ছিল সেদিন আর কতটা অমিল, কল্পনা করতে ইচ্ছে করে।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি আবার ক্ষমতা-বদলের পালা। সমগ্র গুজরাট নয়, গুজরাটের এই অঞ্চলটি তখন মারাঠা-শক্তি করতলগত। আর উনিশ শতকের গোড়ায় ইংরেজের।

ইংরেজের!

যে ইংরেজ এখান থেকে নড়বে বলে কেউ ভাবেনি।

কিন্তু ঠিক একশো বছর বাদে এই ইংরেজের পাকা ভিত ভাঙার সাধনায় এখানে আসন পেতে বসল আর একজন। দেশ তার কানে মন্ত্র দিল, তুমি জাতির জনক, জাতিকে বাঁচাও।

মহাত্মা গান্ধী। সাবরমতীর কূলে একদিন দেখা দিল তার আশ্রম। জাতীয় আন্দোলনের পীঠস্থান।

এই ইতিহাস আর এই অতীতের মধ্যে গত ক'দিন ধরেই বিচরণ করছিলাম আমি। আজও।

মন্দির-মসজিদের রাজ্য থেকে যখন শাহীবাগে এলাম, তখনো বিকেল ঘন হয়নি। মেঘলা দিন, খাওয়া-দাওয়ার খানিক পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

সম্রাট শাহাজানের শাহীবাস। একান্ত নিরিবিলি জায়গা। আগে আরো নিরিবিলি ছিল শুনলাম। শাহীবাগের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুটো প্রাসাদ ভেসে উঠবে চোখের সামনে। প্রবাদ অনুযায়ী এক প্রাসাদের সঙ্গে আর এক প্রাসাদের যোগ দুইয়ের মাঝের ভূগর্ভের সুড়ঙ্গপথে। এই নির্জনে এসে দাঁড়ালে দু-কান আপনা থেকে উৎকর্ণ হতে চায় কেন?

পাগলা মেহের আলীর গর্জন কানে আসবে—তফাৎ যাও, সব ঝুঁট হ্যায়?

ইংরেজ আমলে এখানে চাকরি করতে আসে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তখন এই শাহীবাগ ছিল তার বাসভবন। বিলেত যাবার পথে সে-সময়ে এই প্রাসাদে অবস্থান করেছিল রবীন্দ্রনাথ। ক্ষুধিত পাষাণের পটভূমি সেই শাহীবাগ প্রাসাদ!

আশ্চর্য! সে কোন্ যুগের কথা। সাতাশিটা বছর পার হয়েছে মাঝে। মাত্র আঠারো বছর বয়স তখন রবি ঠাকুরের। তার চিন্তার রাজ্যে সেই তখন জন্মগ্রহণ করেছে পাগলা মেহের আলীর কণ্ঠস্বর। আজও সেটা তেমনি অটুট তাজা।

—তফাৎ যাও! সব ঝুঁট হ্যায়!

নিবিষ্ট মনে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। মন দিয়ে দেখছিলাম, চোখ দিয়ে দেখছিলাম, কান দিয়ে দেখছিলাম। এই তন্ময়তার ফাঁকে ত্রিপুরারি কখন সরে গিয়ে কোন্ জায়গায় বসে গেছে, খেয়াল করিনি। হঠাৎ সব ক'টা ধমনীর সবটুকু রক্ত একসঙ্গে নাড়া খেল বুঝি। বিষম চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম।

—তফাৎ যাও! সব ঝুঁট হ্যায়!

না, পাগলা মেহের আলীর বুক-কাঁপানো গলা নয়। রমণীর কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ এমন এক অকল্পিত বৈচিত্র্যের ধাক্কায় আমার মুখে কথা সরল না খানিকক্ষণ। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছি। রমণীর কণ্ঠস্বর না, রমণীই বটে।

দু'হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাসছে মুখ টিপে।

যশোমতী পাঠক। সহাস্যে যুক্তকরে নমস্কার জানালো।

আমার অবস্থা দেখে মহিলা আরো একটু জোরে হাসতে হুঁশ ফিরল যেন। ওদিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে ত্রিপুরারি ছুটে এলো। অদূরে আমাদের গাড়িটার পাশে মস্ত আর একখানা ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়িয়ে।

ত্রিপুরারিকে দেখে হোক, অথবা প্রায়-অপরিচিত একজনের কাছে এই লঘু বিস্ময় সৃষ্টির দরুন হোক, উৎফুল্ল হাসিটুকু মহিলা আর বাড়তে দিল না। ফলে, সপ্রতিভ হাসির আভাসটুকু সমস্ত মুখময় ছড়িয়ে থাকল। সবিনয়ে বলল, আপনি খুব মন দিয়ে দেখছিলেন।

চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটালাম বোধহয়।

ত্রিপুরারি খুব হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে আছে। পারলে আমার হয়ে সে-ই মাথা নেড়ে দেয়। চিন্তার ব্যাঘাত ঘটুক না ঘটুক, মহিলার এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে বিব্রত বোধ করছি কেন, সে শুধু আমিই জানি। যুক্তকরে আনত হলাম, এবং ততোধিক বিনয়ে জবাব দিলাম, ব্যাঘাত কিছু ঘটাননি।...আপনিও বেড়াতে বেরিয়েছিলেন নাকি?

হাসিমুখে মাথা নাড়ল। আমার মুখের ওপর দু'চোখ নড়াচড়া করল একটু। হাসিটুকু হালকা গাম্ভীর্যের পর্দায় ঢাকতে চেষ্টা করে বলল, আমি এসেছিলাম রোগী দেখতে। এসে শুনলাম, রোগী ভর-দুপুরেই বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছেন। তারপর সাবরমতীর ধারেও তাঁকে না দেখে ভাবলাম এখানেই আছেন।

ত্রিপুরারি হেসে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ তার কর্ত্রীর নির্ভুল ভাবনার তারিফ করল। আমার প্রচ্ছন্ন শঙ্কা ঠিক-ঠিক হাসি-চাপা দেওয়া গেছে কিনা বলতে পারব না। মহিলার পরের স্বাভাবিক প্রশ্নটা আরো অস্বস্তিকর। দু'চোখ তেমনি মুখের ওপর রেখেই জিজ্ঞাসা করল, এখন কেমন আছেন?

জবাব দেবার আগেই বিপাকে পড়ার ভয়ে ত্রিপুরারি ফস ফস করে বলে উঠল, খুব ভালো না, তবু কিছুতে বাড়িতে রাখা গেল না, বেরিয়ে তবে ছাড়ল।

যশোমতী বলল, ভালো করেছেন, আমি তো ভালই দেখছি এখন, কাল আপনি ঘাবড়ে দিয়েছিলেন প্রায়। এই উক্তি ত্রিপুরারির উদ্দেশে। তারপর আমার দিকে ফিরে আবার বলল, ডাক্তারবাবু অবশ্য দেখে গিয়ে জানিয়েছেন তেমন কিছু হয়নি, তবু কালই আসা উচিত ছিল আমার, গেস্ট্রা ছিলেন বলে হয়ে উঠল না। আজ চারটের গাড়িতে শেষ গেস্ট্ বিদায় নেবার পর কর্তব্য করতে বেরিয়েছিলাম। আপনি এত ভালো আছেন দেখে অবশ্যই আরো বেশি খুশি হয়েছি।

হাসিমুখের এই আন্তরিক কথাগুলো কানে কেন যেন খুব সরল ঠেকল না। কেবলই মনে হল, মহিলা বুদ্ধিমতী, এই সাদাসিধে উক্তির পিছনে কিছু একটা কৌতুক প্রচ্ছন্ন। অবশ্য, শারীরিক অসুস্থতার মিথ্যাচার প্রসঙ্গে নিজে আমি সচেতন বলেও এ-রকম মনে হতে পারে।

দু'চার কথার ফাঁকে আরো খানিকক্ষণ শাহীবাগ দেখা হল। যশোমতী জিজ্ঞাসা করল, এর ওপর লিখবেন নাকি ?

—ভাবিনি কিছু...।

ঠোঁটের ফাঁকে সকৌতুক হাসি দেখা গেল আবার। বলল, এখানে এসে সব লেখকই খুব ইন্সপায়ার্ড হয়ে শাহীবাগ দেখেন, দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটান এখানে, মনে হয় ফিরে গিয়েই বড় গোছের কিছু একটা লিখে ফেলবেন। কিন্তু শেষে ক্ষুধিত পাষাণের ভয়েই আর কিছু লেখেন না বোধহয়।

অযোগ্যতার খোঁচা কিনা বোঝা গেল না। মন্তব্য করলাম, ক্ষুধিত পাষাণের পর লেখা তো খুব সহজ নয়।

স্বীকার করে নিয়ে তক্ষুনি মাথা নাড়ল।—তা বটে।

ফেরার সময় মহিলা তার গাড়িতে ওঠার জন্য আপ্যায়ন করল। কোনরকম আপত্তি করার অবকাশ না দিয়ে ত্রিপুরারিকে বলল, আপনি আপনার গাড়ি নিয়ে চলে যান, আপাতত এঁকে আমার বাড়িতে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

নিজে বাড়ি বয়ে দেখতে এসেছিল, তারপরে সাবরমতীর ধারে খোঁজাখুঁজি করে এই পর্যন্ত এসেছে—আমার আপত্তির যথার্থ কোনো কারণ নেই আর। তা'ছাড়া এই রমণীসঙ্গ অবাঞ্ছিত নয়। কিন্তু ত্রিপুরারিও আপত্তি করল না দেখে ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করলাম একটু। অসুখের ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ুক ক্ষতি নেই, কিন্তু তার গুরুত্বও না এরপর ফিকে হয়ে যায়।

তাই মৃদু দ্বিধা প্রকাশ করলাম, আজ থাক্ না, আর একটু তাজা হয়ে পরে না হয় একদিন যাব'খন। আছি তো এখন দিন কতক।

মুখের দিকে তুই এক পলক চেয়ে থেকে যশোমতী জিজ্ঞাসা করল, কেন, শরীরটা এখনো তেমন ভালো লাগছে না ?

প্রশ্নটা নয়, চোখের চাপা হাসিটা আমাকে বিব্রত করেছে। তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে বাঁচার চেষ্টা, বললাম, না, শরীর এখন ভালই আছে।

—তবে আর কি. আসুন। আর কথা না বাড়িয়ে নিজের হাতে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

অতঃপর বিনা বাধায় আমাকে উঠে বসতে দেখে ত্রিপুরারিরই দায় বাঁচল যেন। গাড়ি ছাড়তে ও-পাশের দরজার কোণে ঠেস দিয়ে মহিলা হাসিমুখে বলল, আপনি এখানে আসছেন শোনার পর থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ করার বিশেষ ইচ্ছে ছিল। এ ক'দিনের মধ্যে হয়েই উঠল না···কিন্তু সে-জন্যে আমার থেকেও ঘোষবাবু বেশি দায়ী—তিনি আমাকে বললেন, বন্ধু আমার ঘরের লোক, তার জন্য আপনাকে একটুও ব্যস্ত হতে হবে না, আপনি এদিকের অভ্যাগতদের দিকে মন দিন।

এ আবার কোন ধরনের উক্তি! মহিলার ঠোঁটের ফাঁকে সহজ মিষ্টি হাসিটুকু লেগে আছে। কিন্তু আমার ঘেমে ওঠার দাখিল। একটু আগে ত্রিপুরারির সামনে মহিলার আচরণে বা মুখের সামান্য হাসিতে যে কৌতুক প্রচ্ছন্ন মনে হয়েছিল, এখন সেটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠার আশঙ্কা। জবাব না দিয়ে বোকার মতো আমি তার কথার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করলাম যেন।

গাড়িতে বসার শিথিল ভঙ্গিটুকুও চুরি করে দেখার মতই লোভনীয়। কিন্তু এর পরের উক্তি কোন্‌দিকে গড়াবে আপাতত সেই সশঙ্ক প্রতীক্ষা আমার। যশোমতী বলল, গান শুনে সেদিন আপনি প্রশংসা করে গেলেন, কি লজ্জা, এত লোকের মধ্যে আমি ঠিক খেয়ালই করতে পারলাম না—একদিন তো মাত্র দেখেছিলাম। পরে মনে হয়েছে। তার ওপর আবার ঘোষবাবুর কথায় পড়ে নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করলাম না, আমার ভদ্রতাজ্ঞান আর অতিথিপরায়ণতার বহর

দেখে আপনি তো একেবারে অসুখই বাঁধিয়ে বসলেন। খুব লজ্জা পেয়েছি।

সুবিনয়িণী যথার্থই লজ্জা কতটুকু পেয়েছে জানি না, কিন্তু গাড়ি থামালে আমি বোধহয় পালিয়ে বাঁচতুম। যে মহিলা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চালাচ্ছে, কটন্ চেম্বারের প্রেসিডেন্ট হয়েছে—তার বুদ্ধির প্রতি আমার খুব যে অনাস্থা ছিল তা নয়। শুধু এমন এক রমণীর এই সুচারু হৃদয়ের দিকটাই আমি হিসেবের মধ্যে আনিনি। অসুখ শুনে ব্যস্ত হয়ে বাড়িতে ডাক্তার পাঠাবে, আর তারপর ফাঁক পেয়েই স্বয়ং রোগী দেখতে চলে আসবে—এ সম্ভাবনার কথা কে ভেবেছিল।

এই পরিস্থিতিতে যে কাজ সব থেকে সহজ এবং শোভন আমি তাই করলাম। আরো আগেই যা করা উচিত ছিল। হাসতে চেষ্টা করলাম আর তারপরে হাতজোড় করে বললাম, আমি একটি মূর্খের মতো কাজ করেছি, অপরাধ নেবেন না।

—কি আশ্চর্য, মহিলা হেসে উঠল, অপরাধ তো আমার, আপনার রাগ করাই তো স্বাভাবিক—কি ভেবেছিলেন বলুন তো, এ রকম অভ্যর্থনা জুটবে জানলে কলকাতা ছেড়ে আসতেন না বোধহয়?

এমন সঙ্কটে এই মুখের দিকে চেয়ে এই চোখে চোখ রেখে জবাব দেওয়া যে কত কঠিন, তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। মিথ্যার খোলস আগেই ছেড়েছি, এবারে গোটাগুটি সমর্পণ ভিন্ন গতি নেই। বললাম, দেখুন, এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরারির মুখে, আর আরো দু-চারজন বাঙালীর মুখে আপনার এতবড় পরিচয় পেয়েছি যে মনে মনে বোধহয় হিংসেই হয়েছিল। আর সে-জন্যেই হয়তো নিজের ঠুনকো আত্মসম্মানের দিকটা মাথা উঁচিয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম, ত্রিপুরারি আপনার কর্মচারী বলেই তার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে আপনি অবহেলার চোখে দেখলেন।

মহিলার সমস্ত মুখখানাই কমনীয় হাসিতে ভরে উঠছিল এবার। কিন্তু শেষের কথায় লজ্জা পেয়ে বলে উঠল, ছি, ছি, ঘোষবাবু আমাদের

আপনার লোক, তাঁকে আমি বন্ধু মনে করি। কিন্তু আপনার একটুও অন্যায় হয়নি, আপনি উচিত শিক্ষাই দিয়েছেন। আপনার বই-টইগুলো আমার পড়া আছে যখন এ-রকম ভুল করা আমার উচিত হয়নি। বলতে বলতে আবারও হেসে উঠল।

যুক্ত করে করে বললাম, আর লজ্জা দেবেন না।

তক্ষুনি তরল জবাব দিল, দেব, যদি না আপনি আমার ভুল সংশোধন করার সুযোগ দেন। দিন সাতেক অন্তত এখন আপনি খুব লক্ষ্মী ছেলের মতো আমার গেস্ট্ হয়ে থাকুন তো। চিন্তা নেই, বাড়ি গিয়েই আমি টেলিফোনে ঘোষবাবুকে জানিয়ে দিচ্ছি আপনি দিনকতক এখন ফিরছেন না।

অস্বীকার করব না, এই নতুন জায়গা, নতুন জায়গার মানুষেরা, এই সাবরমতী গত ক'দিন ধরে আমাকে যত না আকৃষ্ট করেছে, স্বল্প আলাপে সূচ্যগ্রবুদ্ধি এই সুদর্শনা মহিলা আমাকে তার থেকে অনেক বেশি টেনেছে। অন্তরঙ্গ আমন্ত্রণও লোভনীয় মনে হয়েছে তাই। কোনো অবিবাহিত রমণীর পক্ষে এ-ধরনের দ্বিধাশূন্য আমন্ত্রণ সঙ্গত কিনা, সে সমস্যা মনের কোণেও উঁকিঝুঁকি দেয় নি।

তবু অভ্যাসগত ভব্যতার দিক আছে একটা। বললাম, এতখানি অপরাধের পরেও আমার ভাগ্য প্রসন্নই ধরে নিলাম।···কিন্তু আজ থাক, পরে আপনার আতিথ্য সানন্দে মাথা পেতে নেব।

মহিলা সহজ আন্তরিকতায় মাথা নাড়ল। বলল, উঁহু, আজই, মানে আজকের থেকেই। আসলে আপনি লজ্জা পাচ্ছেন। রাজি না হলে আমার হাতে অস্ত্র আছে—ঘোষবাবুর কাছে আপনার অসুখের কথা ফাঁস করে দেব। তাঁর এখনো ধারণা আর একটু হলেই অসুখটা আপনার বেশ খারাপের দিকে গড়াতো। কালও বলছিলেন সে কথা।

এরপর সানন্দে এবং শশব্যস্তে বশ্যতা স্বীকার। বললাম, ওর স্ত্রীর হাতে প্রায় ধরা পড়েছি, তার ওপর আপনার এই অস্ত্র ঘাড়ে পড়লে এ-জায়গা ছেড়েই পালাতে হবে আমাকে।

যশোমতী পাঠক খুশি হয়ে হাসতে লাগল। আলাপ আরো

সহজতর করার চেষ্টা আমার। বললাম, খুব খুশি-চিত্তে আপনাকে ইচ্ছেমত অতিথি-সৎকারের সুযোগ দিতে রাজি, কিন্তু আমার দিক থেকেও সামান্য একটুখানি শর্ত থাকবে।

রমণীমুখের চকিত কারুকার্য নয়নাভিরাম। সভয়ে বলে উঠল, কি শর্ত, আপনার গল্পের মেটিরিয়াল জোগাতে হবে না তো?—এমনিতেই তো আমাকে নিয়ে শহরে ঢি-ঢি।

ঠিক এই মুহূর্তেই, অর্থাৎ, এই উক্তির পরেই কি নিয়ে লিখব সে-চিন্তাটা আমার অবচেতন মন থেকে ঘুচে গেছল কিনা সঠিক বলতে পারব না। হয়তো তাই। কিন্তু মহিলার ওই কথা আর ওই হাসির সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনের ভিতরটা তলিয়ে দেখার অবকাশ তখন ছিল না। হেসে জবাব দিলাম, এইটুকুর মধ্যে অত বড় লাভের দিকে হাত বাড়াতে সঙ্কোচ—আমি গান শোনার বায়না পেশ করতে যাচ্ছিলাম।

প্রসন্নবয়ানে মহিলা তৎক্ষণাৎ রাজি। বলল, এ আবার একটা শর্ত নাকি! সাহিত্যিককে গান শোনাব এ তো ভাগ্যের কথা, ভালো লাগলে যত খুশি শুনবেন।

মস্ত ফটকের ভিতর দিয়ে গাড়ি ঢুকে গেল। চারিদিকে পাঁচিল ঘেরা। সামনে লন্, পিছনে বাগান। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলা যেতে পারে। দূর থেকে আগেও একবার দেখেছিলাম। কিন্তু দূর থেকে ঠাওর হয় না।

না, এ-হেন আবাসে অতিথিকে ডেকে আনার ব্যাপারে রমণীরও সঙ্কোচের কারণ না থাকাই স্বাভাবিক। মহিলা সংসারী নয় বটে, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে এখানে অনেকগুলো সংসারের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। প্রাসাদ-সংলগ্ন হাল-ফ্যাশানের গেস্ট্-হাউস। ম্যানেজার, সেক্রেটারী, কেয়ার-টেকার আর দাস-দাসী—সব মিলিয়ে এখানকার বাসিন্দার সংখ্যা কত, আজও সঠিক বলতে পারব না। বাড়ির পিছনদিকে একসারি পাকা সার্ভ্যান্টস্ লজ্। সামনের দিকে গেস্ট্-

হাউস, আর ও-ধারের একপাশ জুড়ে ম্যানেজার, সেক্রেটারী আর কেয়ারটেকারের আলাদা আলাদা কোয়ার্টার্স।

এ-রকম এক জায়গায় এসে পড়ে আমার প্রতি মুহূর্তে বিব্রত বোধ করার কথা। ত্রিপুরারির বউয়ের নীরব তদারকেই কত সময় বিব্রত বোধ করেছি। এখানে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে দু'জন করে লোক দৌড়ে আসে—কিছু চাই কি না। অথচ চাওয়ার অপেক্ষায় যে এখানে থাকতে হয় না, সে বোধহয় ওরাও জানে। যে ব্যবস্থা তার ওপরেও কিছু চাইতে হলে গবেষণা করে বার করতে হবে। প্রথম আধঘণ্টা একঘণ্টা এই পরিবেশে নিজেকে ভয়ানক বে-খাপ্পা লাগছিল বটে। কিন্তু আশ্চর্য, তারপরে সেভাবটা কেটে যেতে সময় লাগেনি।

ঐশ্বর্যপুরীই বটে, তবু অতটা সহজ নিঃসঙ্কোচ হতে পেরেছিলাম কি করে ভাবলে অবাক লাগে। পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তো সাত দিন থাকতে হবে ভেবে উতলা হয়ে পড়েছিলাম। মনে হয়, ঐশ্বর্য এখানে সীমিত নয় বলেই সঙ্কোচ আপনই সরে গেছে। কৃত্রিম হ্রদকে বহু রকমে সাজিয়ে গুছিয়ে চোখ ঠিক্‌রে দেওয়া যায়। কিন্তু সমুদ্রের আর এক রূপ। সমস্ত উচ্ছলতা নিয়েই সমাহিত রূপ তার। এও যেন অনেকটা তাই। প্রথমে তাক লাগে বটে, পরে মনে হয় ঐশ্বর্য এখানে ধ্যানে বসেছে। কোন রকম হঠাৎ-চমক নেই, দৃষ্টিকে পীড়া দিয়ে ঈর্ষা জাগানোর ঠমক নেই। যা আছে, তা থাকলেই যেন মানায়।

নিজস্ব ঐশ্বর্য বলতে যশোমতী সাগ্রহে প্রথমে আমাকে যে জিনিসটি দেখাল, সেটা তার লাইব্রেরি! লাইব্রেরি অনেক দেখেছি, কিন্তু এত বড় অথচ এমন সুচারুশৃঙ্খলাবদ্ধ নিজস্ব পাঠাগার কমই চোখে পড়েছে। শুনলাম এটি তদারক করার জন্য একজন এক্সপার্ট লাইব্রেরিয়ানও আছে। বাংলা ছেড়ে বিশাল ইংরেজি সাহিত্যের ধারা নিয়েও কেউ যদি গবেষণা করতে চান, মনে হয় এখানে বসেই তিনি মোটামুটি রসদ পেয়ে যেতে পারেন।

লজ্জা পেলাম, যখন আধুনিক লেখকদের সারি থেকে যশোমতী হাসিমুখে আমার লেখা প্রতিটি বই টেনে টেনে দেখাতে লাগল

কিন্তু প্রশংসার বদলে অনুযোগের সুরটাই স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করল। বলল, আপনার কোনো কোনো লেখা, বিশেষ করে ট্র্যাজেডি-গুলো এত বেশি আপত্তিকর যে পড়তে পড়তে মনে হত আপনাকে সামনে পেলে তর্ক তো করবই, ঝগড়াও হয়ে যেতে পারে। অথচ এখন দেখুন কিছুই মনে পড়ছে না।

লেখক মাত্রেই প্রীত হবার কথা, আমিও ব্যতিক্রম নই। তবু বললাম, আমার লেখার ওইটেই বোধহয় বড় গুণ, পড়ার পর আর মনে রাখার বালাই থাকে না।

যশোমতী হেসে ফেলেও একটু জোর দিয়েই বলল, না, অতটা নিন্দে অবশ্য করছি না, কিন্তু বেশিরভাগই ট্র্যাজেডি লেখার দিকে আপনার অত ঝোঁক কেন? আর ট্র্যাজেডি নয় যেগুলো, তারও তলায় তলায় কিছু-না-কিছু ট্র্যাজিক এলিমেন্ট থাকবেই।

হেসে সমালোচনা যথার্থ মেনে নিয়েই জবাব দিলাম, আচ্ছা, আপনার খাতিরে একটা বই অন্তত পরের সংস্করণে অন্যরকম করে দিতে রাজি আছি—যে-কোনো একটা বইয়ের নাম করুন, বদলে স্ট্রেইট্ কমেডি করে দেব।

বিপদাপন্ন মুখশ্রী যশোমতীর। প্রায় হার মেনে মন্তব্য করল, আপনি আচ্ছা জব্দ করতে পারেন।

খুশি মুখে প্রসঙ্গ বদল করলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, এত বই আপনি পড়ার সময় পান কখন?

—কেন, বই পড়েই তো সময় কাটাই কোন রকমে। আর কি কাজ?

—এত বড় একটা ব্যবসা চালাচ্ছেন—ত্রিপুরারিতো বলে আপনার মতো এতবড় ব্যবসা এখানে আর কারো নেই।

হেসে জবাব দিল, নিজের জিনিস সবাই বড় দেখে, ঘোষবাবুর তো কথাই নেই। তা ছাড়া ব্যবসা খুব বড় হয়ে গেলে আপনিই চলে। চালানোর একটা শো রাখতে হয় বটে, কিন্তু আসলে তেমন কিছু করতে হয় না।

ভালো লাগছিল। প্রতিটি কথা ভালো লাগছিল। হাসি ভালো লাগছিল। হাসির আভাসটুকুও ভালো লাগছিল।

শহর দেখার জন্য আর লেখার রসদ সংগ্রহের জন্য পরদিন থেকে ঝকৃঝকে একটা গাড়ি আমার হেপাজতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সাত দিন ছেড়ে বাকি পনেরো দিনই এখানে আমি অতিথি হয়ে ছিলাম। যশোমতী অনুরোধ করেছে। আমার যেটুকু সঙ্কোচ তা ত্রিপুরারির জন্য। ওর বউও ভাবতে পারে বড়লোকের আতিথ্য পেয়ে ওদের ভুলেছি। কিন্তু আপত্তি করা দূরে থাকুক, বরং সাগ্রহে সায় দিয়েছে। আড়ালে উৎসাহ দিয়েছে। ওখানেই থেকে যাও বন্ধু, অনেক মনের মতো মাল-মশলা পেয়ে যাবে—তাছাড়া আমার সঙ্গে দেখা তো রোজই হচ্ছে, বললে দু'বেলাই আসতে রাজি আছি। সাহিত্যিকের বন্ধু হলেও যে এত খাতির মেলে এ বাপু এই প্রথম জানলাম। গলা খাটো করে আর সেই সঙ্গে কনুইয়ের একটা গুঁতো দিয়ে আবার বলল, একটুও ঘাবড়াবার দরকার নেই, যা জানার ইচ্ছে শপাং করে মুখের ওপর জিজ্ঞাসা করে বসবে। তোমাকে দেখার আগে থেকেই তোমাকে পছন্দ যে হে, নইলে অত করে বলত না।

সকালের দিকে আমার হোস্টেসের অবকাশ কম। চায়ের টেবিলে দেখা হয়। তখনই যেটুকু কথাবার্তা হয়। তারপর সে কাজ নিয়ে বসে, আমি হয় গাড়ি নিয়ে বেরোই নয়তো লাইব্রেরিতে থাকি। এরপর দেখা হয় দুপুরে খাবার সময়। ফ্যাক্টরী থেকে এই সময় ঠিক ঘড়ি ধরে ফিরে আসে। আমার ধারণা ছিল এই রীতিতেই বুঝি অভ্যস্ত কর্ত্রীটি। কিন্তু পরে একজন পরিচারকের মুখে শুনলাম তা নয়, বাড়িতে অতিথি আছে বলেই ফিরে আসে, নইলে তার দুপুরের খাবার ফ্যাক্টরীতেই নিয়ে যেতে হয়।

শুনে খুশি হয়েছি আবার সঙ্কোচও বোধ করছি। একটু এ-দিক ও-দিক হলেই অতিথি বিগড়ায় ভেবেই ভদ্রমহিলা কষ্ট করে আসে কিনা কে জানে। সেদিন বললাম, আপনি তো ফ্যাক্টরীতেই লাঞ্চ করেন শুনেছি, আমার জন্যেই কষ্ট করে আসতে হচ্ছে আপনাকে—

এর কিচ্ছু দরকার নেই, যারা আছে তারা আদর যত্ন কম করছে না।

যশোমতী তক্ষুনি বলল, আপনি আমার ঘরের খবর নিতে গেছেন কেন? তরল কৌতুক-ভরা প্রসন্ন মুখ, আমার বার কতক শরৎবাবু পড়া আছে মশাই—সামনে বসে না খাওয়ালে আপনাদের মেজাজ ঠিক থাকে না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিলাম, শরৎবাবুর যুগ গেছে, মেয়েরা বসে এখন শুধু বিষম খাওয়ায়।

চোখ পাকালো, মিথ্যে কথা, শরৎবাবুর যুগ যে একেবারে যায়নি সেটা আপনারও দুই একখানা বই থেকে প্রমাণ করে দিতে পারি।

গল্প জমে বিকেলে বা সন্ধ্যার পর। আমি সেই প্রতীক্ষায় থাকি। সেদিন গাড়ি নিয়ে বহুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ফেরার পর প্রথম সাক্ষাতে মহিলা জিজ্ঞাসা করল, আজ কি দেখলেন?

—বিশেষ কিছু না। ঘুরলাম শুধু।

ঈষৎ কৌতুকে আবার প্রশ্ন করল, আপনি এখানকার কি নিয়ে লেখার কথা ভাবছেন?

—লিখবই যে এ আপনাকে কে বললে?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে জবাব দিল, ঘোষবাবু বলছিলেন লেখার জন্যেই নাকি আপনি থেকে গেলেন এখানে, নইলে সাহিত্য-অধিবেশন শেষ হলেই পালাতেন।

স্বীকার করলাম, বললাম, বাসনা সেই রকমই ছিল বটে। কিন্তু কি লিখব এখনো ঠিক করা হয়ে ওঠেনি। কখনো পুরাণ হাতড়ে বেড়াচ্ছি, কখনো ইতিহাস, কখনো বা এখানকার বিগত রাজনীতি। লেখা হয়তো শেষ পর্যন্ত হবেই না, কারণ ওগুলোর একটার ওপরেও নির্ভরযোগ্য দখল নেই।

মুখের দিকে চেয়ে থেকে যশোমতী হাসল মুখ টিপে।—কেন বর্তমান পছন্দ হচ্ছে না?

আশায় আশায় বড় লোভনীয় বাসনার দিকেই বেপরোয়া হাত বাড়িয়ে ফেললাম। কনুইয়ে গুঁতো দিয়ে ত্রিপুরারি শপাং করে বলে

বসার. পরামর্শই দিয়েছিল। ওর কল্যাণে আর এখানকার প্রবাসী বাঙালী আলাপীদের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার ফলে গল্পে গল্পে যে রসদের সন্ধান পেয়েছি, সেটা সত্যিই আরো কতগুণ লোভনীয় হয়ে উঠেছে এই ক'দিনে তা আর কে জানে?

বক্তব্যের ভূমিকাস্বরূপ ঘটা করে বড় নিঃশ্বাস ফেলতে হল একটা, বললাম, বর্তমান বড় কৃপণ, নিজেকে কেবল আগলে রাখে। ফলে কেউ তার সম্পর্কে বাড়িয়ে বলে কেউ কমিয়ে। সঠিক হদিস কেউ দিতে পারে না, লিখি কি করে বলুন?

মহিলা যথার্থ অবাক। —আপনি কার কথা বলছেন?

আমি হাসতে লাগলাম। সেই হাসি থেকেই তক্ষুনি বুঝে নিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখে রক্ত-কণা ছোটাছুটি করতে লাগল যেন। তারপর সামলে নিয়ে দু'চোখ কপালে তুলে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। —এই মতলব আপনার, অ্যাঁ? আপনি কোথায় কি শুনেছেন শুনি?

সরলতার একটা সহজ ফল আছেই। সবিনয়ে জানালাম, শোনার ব্যাপারে প্রথম সহায়তা আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি, শাহীবাগ থেকে ফেরার পথে সেদিন আপনিই বলছিলেন, আপনাকে নিয়ে শহরে ঢি-ঢি।

মুখ থেকে লজ্জার আভা মিলাতে সময় লাগল। জিজ্ঞাসা করল, আর সেই শুনেই আপনি কি নিয়ে ঢি-ঢি খোঁজ-খবর করতে লেগে গেলেন?

মাথা নাড়লাম। তাই।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসি চেপে চুপচাপ চেয়ে রইল একটু।—আমি এই শহরের একজন মহা গণ্যমান্য ব্যক্তি বে-ফাঁস কিছু লিখে ধরা পড়েছেন কি মানহানির কেস করব, খুব সাবধান।

আমি বিনয়াবনত আরো নির্দ্বিধায় আর এক ধাপ এগোলাম। —সেই জন্যেই তো আপনার সাহায্যপ্রার্থী।

লজ্জাগোপনের সুচারু প্রয়াস আবারও।—আপনি ভয়ানক

লোক, আমি খাল কেটে কুমীর এনেছি।

কি একটা অছিলায় তখনকার মতো উঠে গেছে। খানিক বাদে গানের বায়না পেশ করতে সহজ আন্তরিকতায় সম্মতি-জ্ঞাপন করেছে। গান আগেও দু'-তিন সন্ধ্যায় শুনেছি। কিন্তু এই দিনে সর্বরকমে ভাগ্য প্রসন্ন মনে হল। কারণ, মুখ বুজে বসে এই দিন গান আমাকে একা শুনতে হয়নি। দোসর পেয়েছিলাম। সব থেকে সুবাঞ্ছিত দোসর বোধ হয়...

বাইরে থেকে, অর্থাৎ ত্রিপুরারির মুখে এবং বাঙালী ভদ্রলোকদের রসালো জটলা থেকে যে রিপোর্ট পেয়েছিলাম, তাতে মনে মনে প্রতিদিনই এখানে আমি একজনকে আশা করেছি।

কিন্তু আমার আসার সঙ্গে তার আসাটা এ-পর্যন্ত বড় বেখাপ্পা রকমের অমিল হচ্ছিল।

সে শঙ্কর সারাভাই।

এই রাত্রিতেই তার সাক্ষাৎ মিলল।

যশোমতী পাঠক দু'চোখ বুজে গানে তন্ময় তখন। মেঝেতে পুরু গালচে, কারো আসা-যাওয়া টের পাবার কথা নয়, পেলও না। ভদ্রলোক এলো। আমার তন্ময়তার ছেদ পড়ল, নিভৃতের একটা অনুভূতি আনন্দে চঞ্চল হল। শঙ্কর সারাভাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে গায়িকাকে দেখল একটু। তারপর দু'হাত জোড় করে আমার উদ্দেশে নমস্কার জানালো। তারপর তেমনি নিঃশব্দে পাশের আসনে বসল। সপ্রতিভ মুখের অল্প অল্প হাসিটুকু আজ আরো অনেক বেশি ভালো লাগল আমার।

গানের মাঝেই একটু বাদে চোখ মেলে তাকালো যশোমতী পাঠক। আমার পাশে দ্বিতীয় আগন্তুক দেখার ফলে গানের তাল কাটল না বটে, কিন্তু মুখে পলকের লালিমার ছোপ স্পষ্টতর হল বোধ করি। আমার দিকে তাকালো একবার। দু'চোখ বুজেই গাইতে লাগল আবার। শঙ্কর সারাভাই গান শুনছে কি তন্ময় হয়ে কিছু চিন্তা করছে বোঝা ভার। তার দু'চোখ অদূরের দেয়ালের ছবিটার

দিকে। আমার ধারণা, যে সময়ে গান শেষ হতে পারত, তার থেকে কিছু'দেরিই হল।

তবু শেষ খানিক বাদে হলই। এরপরেও চোখ বুজে থাকা সম্ভব নয়। যশোমতী তাকালো। হাসল। নিজেই আগে কথা বলে প্রশংসা এবং আবার গানের অনুরোধ একসঙ্গে বাতিল করল হয়তো। আমাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে শঙ্কর সারাভাইয়ের উদ্দেশে প্রশ্ন করল, আলাপ আছে?

আমার দিকে চেয়ে শঙ্কর সারাভাই আর একদফা পরিচয়সূচক মাথা ঝাঁকালো। কিন্তু যশোমতী আমার নাম বলেনি বা পরিচয় দেয়নি। হাসিমুখে ভদ্রলোক সম্মুখবর্তিনীর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল তারপর। নিজেদের ভাষায় বলল, আলাপ হয়েছিল বোধহয়, তাছাড়া মাননীয় অতিথিকে নিয়ে তুমি খুব ব্যস্ত সেটা আগেই শুনেছি।

কেন জানি না, তাড়াতাড়ি নিজেকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা আমার। বললাম, ওনার ব্যস্ততার জন্য আমি নিজেই খুব লজ্জিত।

ঝুঁকে চলা আর মাথা ঝাঁকিয়ে কথা বলা ভদ্রলোকের স্বভাব বোধহয়। সানন্দে মাথা ঝাঁকালো।—আপনার লজ্জার কিছুমাত্র কারণ নেই, ওঁর কাছে আপনারা প্রিভিলেজ্‌ড্‌ ক্লাস্‌, লেখকদের সাত খুনও উনি মাপ করে দিতে পারেন—এ তো মাত্র একটা খুন।

ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায়, মহিলাকে ব্যস্ত রাখার দরুন সেই একটা মাত্র খুন যাকে করা হয়েছে সেই ব্যক্তিটি উনি। এতবড় ঘরটাকে সচকিত করে হা-হা শব্দে হেসে উঠল। জোরালো পুরুষ, জোরালো হাসি। এ-রকম এক হাসিতে স্বল্প পরিচয়ের সমস্ত সঙ্কোচ ধুয়ে মুছে যাবার ম তা। হাসি মিলাতে সাগ্রহে মহিলাকে লক্ষ্য করছি আমি। সেই মুখে ছদ্ম ভ্রুকুটি।—অত হাসার কি হল?

মুখখানা কাঁচুমাচু করে ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরল।—হাসি পেলে মেপে হাসা যায়, আপনি বলুন?

আমি মাথা নাড়লাম। যায় না।

যশোমতী পাঠক নিজেই হাসতে লাগল এবার। বলল, লেখককে আমি তোমার কাছে পাঠাব ভাবছিলাম, ভদ্রলোক বেশ মুশকিলে পড়েছেন। গল্পের প্লট খুঁজছেন—পাচ্ছেন না। হতাশ হয়ে দেশে ফেরার মতলব করছেন, তুমি দাও না কিছু ব্যবস্থা করে।

চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, মন দিয়ে রসদ আমি নিজেই সংগ্রহ করেছি। শঙ্কর সারাভাইয়ের পরিচয় যশোমতী আমাকে দেয়নি। এটা যে ভুল তা আমার মনে হয়নি। কিন্তু ভদ্রলোককে যে আমি চিনি সেটা সে বুঝেছে। তবু কোনো রকম বিড়ম্বনা বা সঙ্কোচ দেখিনি। অতিথির হয়ে এই সুপারিশও খুব সাদাসিধেভাবেই করল। এর আড়ালে যে কৌতুক প্রচ্ছন্ন সে শুধু উপলব্ধির বস্তু। নির্লিপ্ত চোখে মুখে ওই কৌতুক চিকচিক করছে কিনা দেখার জন্য আমার অবাধ্য দৃষ্টি ওই মুখখানাকেই চড়াও করেছিল।

দু'চোখ বড় বড় করে প্রায় আমার মুখোমুখি ঘুরে বসল শঙ্কর সারাভাই।

—আপনার নামটা কি মিস্টার··· ?

নাম যশোমতীই বলে দিল।

আরো একটু সহানুভূতি নিয়েই যেন শঙ্কর সারাভাই আমাকে নিরীক্ষণ করল। তারপর বলল, মহিলার অনুরোধ আমি সচরাচর রক্ষা করে থাকি। আমাদের দেশে এসে আপনি এরকম সমস্যায় পড়েছেন সাহায্য তো করাই উচিত। কিন্তু—আমি জমিজমার প্লট বুঝি, গল্পের প্লট—সে আবার কি ?

জবাব দিলাম, খুব তফাৎ নেই, গল্পেরও তো কিছু জমি-জমা দরকার, নয়তো দাঁড়াবে কার ওপর ?

হাসিমুখে যশোমতী পাঠক সেতারে রিন-রিন শব্দ করতে লাগল। ছদ্ম বিরক্ত মুখ করে শঙ্কর সারাভাই বাধা দিল, আঃ, ব্যাপারটা বুঝতে দাও ভালো করে। আবার আমার দিকে ফিরল, তা আপনার কি রকম প্লট চাই, নরম মাটির না শক্ত মাটির ? আই মিন, ঠিক কোন্

রকম প্লটে কি ফসল ফলাতে চান না বুঝলে ব্যবস্থা করি কি করে?

জবাব দেওয়ার ফুরসৎ মিলল না। বেগতিক দেখে যশোমতী ধমকে উঠল তাকে, তোমাকে আর ব্যবস্থা করতে হবে না, থামো।

—দেখলেন? একেই বলে অস্থিরমতি রমণী-চিত্ত। শঙ্কর সারাভাইয়ের আর এক দফা সেই জোরালো হাসি।

গল্পে গল্পে রাত মন্দ হল না। আর রাত হওয়ার দরুন এক সময় এই আসর ভাঙল বলে ঘড়ি বস্তুটার ওপরেই রাগ হতে লাগল আমার। যাবার আগে আন্তরিক সৌজন্যে শঙ্কর সারাভাই তার বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন করল আমাকে। যার খাতিরে এই আমন্ত্রণ তাকে কিছু বলল না দেখে ঈষৎ বিব্রত বোধ করেছি।

কিন্তু মহিলা নেমন্তন্নের ধার ধারে বলে মনে হল না। যথা দিনের যথাসময়ে যশোমতীই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। শঙ্কর সারাভাই বাংলা বোঝে, বলতে পারে না। আমিও হিন্দী বুঝতে পারি, প্রকাশে বিভ্রাট। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাসি-খুশির মধ্যেই সময় কেটেছে। মনে হয়েছে, শঙ্কর সারাভাই তেমনি এক পুরুষ, অনায়াসে যে সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে যেতে পারে। ভাষার অন্তরায় সেখানে তুচ্ছ।

লেখার প্রসঙ্গে মহিলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমার হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছে, লিখুন তো মশাই, দুনিয়ার সব থেকে সেরা অকরুণ কোনো মহিলার গল্প লিখুন দেখি। সে-রকম গল্প দুনিয়ায় কেউ লিখেছে কিনা জানি না। যদি পারেন একটা মস্ত কাজ হবে, ব্যট্ বি কেয়ারফুল, পাথরের থেকেও শক্ত নারী-চরিত্র চাই— যে নিজের প্রতি অকরুণ, অন্যের প্রতি অকরুণ, অথচ সকলে তাকে করুণাময়ী ভাবছে।

রমণীর ভ্রুকুর শাসন সত্ত্বেও হা-হা শব্দে সেই হাসিই হেসে উঠেছে শঙ্কর সারাভাই।

নিচের পাথরের ওপর উঁচু পাহাড়ী জলপ্রপাত ভেঙে পড়তে দেখেছি আমি। সেই আঘাতে পড়ন্ত জলের বেগকে ভীমগর্জনে শতধা

হয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে একলক্ষ মুক্তার হাসির মত ছড়িয়ে পড়তে দেখেছি। কিন্তু সেদিন এই সরব হাসি দেখে মনে হয়েছিল, জলপ্রপাতের সেই দৃশ্যের সবটুকুই কি হাসি? সবটুকুই সুমহান বিশাল বটে, নিছক হাসি কি সবটুকু?

আরো দু'চার দিন এসে গল্প-গুজব করে গেছি ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে। কি পেয়েছি বা কতটুকু পেয়েছি, সেটা সে-সময় খেয়াল করিনি। এদিকে অবকাশ সময়ে যশোমতীর সঙ্গে বসে গল্প তো করেইছি। আমাকে রসদ জোগানোর আগ্রহে সে একটা কথাও বলেনি কখনো। সহজ অন্তরঙ্গতায় সে তার বাবা, মা আর বড় দাদার গল্প করেছে, ব্যবসার গল্প করেছে, এমন কি কৌতূহল প্রকাশ করলে শঙ্কর সারাভাইয়ের বেপরোয়া স্বভাবের গল্পও করেছে। সেই গল্প করার মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস ছিল না, কোনরকম আবেগের আতিশয্যও না। কিন্তু তবু আমি যেন কিছু একটা উদ্দেশ্যের মোহনার দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছি। পেরেছি যে, সেটা পরের অনুভূতি। তখন উদ্দেশ্য ভুলে কান পেতে শুনেছি শুধু। ঐশ্বর্য-বিলাসে মগ্ন হয়েও সহজতার এই রূপ কোনদিন ভোলবার নয়।

সম্ভাব্য কাহিনীর উচ্ছ্বাস এবং রোমাঞ্চের দিকটা ভরাট করে তোলার লোকের অভাব নেই। ত্রিপুরারি আছে। আর প্রবাসী বাঙালী বন্ধুরা তো আছেই। তাদের কাছে তিল কিছু নেই, সব তাল।

মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিয়েছি। দিয়েছি এই জন্যে যে বোকার মতো অসুখের সেই মিথ্যে আশ্রয় না নিলে, আর ঠিক তেমনি অসহায়ভাবে ধরা না পড়ে গেলে মহিলার মনটিকে ঠিক এমন করে এমন সুরে ধরার সুযোগ পেতাম কিনা জানি না। আর আরো একটা কথা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, প্রায় জ্ঞাতসারেই যশোমতী পাঠক আমাকে কিছুটা প্রশ্রয় দিয়েছে, অর্থাৎ নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার তাগিদ ভুলেছে। গোচরে হোক বা অগোচরে হোক, সমস্ত পরিপূর্ণতারই একধরনের বেদনাভার আছে। সেটা হয়তো আপনিই প্রকাশের পথ খোঁজে। প্রশ্রয় হয়তো এই কারণে।

আজকের যশোমতী পাঠকের পরিপূর্ণতার আড়ালে এই বেদনার দান কতটুকু, সেটা শুধু কল্পনাসাপেক্ষ কিনা বলতে পারব না। মোট কথা, যে দুটি নারী-পুরুষের হৃদয়চিত্র আমি আঁকতে চলেছি, তাতে কতখানি রঙ ফলানো হয়েছে, সে-সম্বন্ধে আমার নিজেরই কোনো ধারণা নেই। যদি হয়েও থাকে রঙ ফলানো, সে রঙ আমার নিজস্ব নয়। সেই রঙের জন্য আমি ঋণী ত্রিপুরারির কাছে আর প্রবাসী বাঙালী বন্ধুদের কাছে তো বটেই, হয়তো শঙ্কর সারাভাই আর যশোমতী পাঠকের কাছেও।

॥ চার ॥

যশোমতী পাঠক একবার বাড়ি থেকে পালিয়েছিল।

আজকাল ছবিতে গল্পে যে-রকম পালানো দেখা যায়, ঠিক সেই-রকম পালানো। আর ছবিতে পালানোর যে সব কারণ দেখা যায়, সেই গোছেরই পালানো। যশোমতী পাঠক সেই পালানোর মহড়া দিয়েছে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে। বয়স যখন তার টেনে-টুনে এক কুড়ির বেশি নয়—তখন।

সে-দিনের সেই যশোমতীকে নিয়ে কল্পনার অভিসারে গা ভাসায়নি শহরের অভিজাত ঘরের বয়সকালের এমন একটি ছেলেও ছিল কিনা সন্দেহ। সেই রোমান্স নিয়ে যে বড় রকমের হৃদয়বিদারক অঘটন কিছু ঘটে যায়নি, সেটাই আশ্চর্য। শহরের সর্বত্র তখন এমন আধুনিকতার ছাপ পড়েনি। মেয়েরা বেশির ভাগই তখন বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে অন্তরীণ। তারা লেখা-পড়া শিখছে বটে, স্কুলে কলেজেও যাচ্ছে—কিন্তু সেটা যতটা সম্ভব পুরুষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে দৃষ্টি বাঁচিয়ে। আর তাদের সংখ্যাও নামমাত্র। কারণ পনেরো না পেরুতে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় তখন। বাইরের দিকে একটু তাকাবার অবকাশ যখন মেলে তখন তারা পাকাপোক্ত মায়ের আসনে বসে।

এমন দিনেই তরুণ মনে মেয়েদের এক বিশেষ অস্তিত্বের জোরালো ঘোষণার রোমাঞ্চ জাগিয়েছিল যশোমতী পাঠক। সেই ঘোষণা প্রাণ-সম্পদ হয়ে দেখা দেবে কি প্রগতির বিকার হয়ে, রক্ষণশীল পরিণত বয়সের মহোদয় বা মহিলারা নিঃসংশয় নয় আদৌ। তবু কেউ উৎসাহ দিয়েছে, কেউ বা খুব সন্তর্পণে একটু উপদেশ দিয়েছে—কিন্তু বাধা কেউ দিতে পারেনি। মেয়েদের ক্লাব হয়েছিল, মেয়েদের গান-বাজনা শেখার কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। মেয়েদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে বছরে দু-তিনবার অন্তত গোটা শহর মেতে উঠেছিল।

এই সমস্ত পরিকল্পনা আর উদ্দীপনার মূলে যশোমতী পাঠক। ইচ্ছে থাকলেও বাধা দেওয়া সম্ভব হয়নি এই কারণেই।

পনেরো বছরে স্কুলের পড়া শেষ করেছে যখন, তখন সকলে তাকে লক্ষ্য করেছে। উনিশ বছরে কলেজের পড়া শেষ করেছে যখন, তখন বহু তরুণের বুকের তলায় আগুন জ্বলেছে। কুড়ি বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে যখন, তখন সে বলতে গেলে শহরের সমস্ত প্রগতি-পন্থী রমণী-কুলের মুরুব্বি।

এই সবই সম্ভব যে জিনিসটি অঢেল পরিমাণে থাকলে—সেই বস্তুটি টাকা। যশোমতীর বাবা চন্দ্রশেখর পাঠকের সেই পরিমাণ টাকা ছিল, যে পরিমাণ টাকা থাকলে স্বর্গের দরজা আর নরকের দরজা দুই-ই অক্লেশে খোলা যেতে পারে। দ্বিতীয় দরজার প্রশ্ন এখানে নেই কারণ, নিজের উপার্জনের টাকা চেনার মতো চোখ লোকের সচরাচর থাকেই। বিশেষ করে সে যদি ব্যবসায়ী হয়। চন্দ্রশেখরও টাকা চিনত, টাকার সম্মান করতে জানত, টাকার জাল ফেলে টাকা তুলতে পারত।

সূতো আর কাপড়ের কলের ব্যবসা এখানে সুদূরকালের। কিন্তু সেই যুগে ম্যাঞ্চেস্টার-ফেরৎ চন্দ্রশেখরই বস্ত্রশিল্পের অগ্রগণ্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, অনুরাগীদের মুখে এমন কথাও শোনা গেছে। ব্যবসার স্বর্ণ-শিখরে আরোহণের তাগিদে একবার নয়, একাধিকবার সে সাগর-পাড়ি দিয়েছে।

এই মানুষের সুরূপা কন্যা বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত অবিবাহিতা

থাকলে লোকের চোখে কাঁটা ফোটে না। প্রায় তুলনীয় অভিজাত ঘরে এই ব্যতিক্রম বরং অনুকরণীয় বলে গণ্য হয়। বাপ বা অভিভাবকের তাড়ায় বিয়ে যাদের হয়ে গেছে, একটু বেশি বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার চটক দেখে অনেকে তাদের মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু প্রায় সমতুল্য ঘর সেদিন খুব বেশি ছিল কিনা সন্দেহ। চন্দ্রশেখরের কট্‌ন্ মিল যখন জাঁকিয়ে উঠেছে—তার সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী তখন একজনও ছিল কিনা সন্দেহ।

গর্বিত, রাশভারী মানুষ চন্দ্রশেখর। সমালোচনা বরদাস্ত করতে পারে না, কোনরকম প্রতিবাদও সহ্য করতে পারে না। নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়েছে—নিজের শক্তিতে চলে ফেরে ওঠে বসে। নিজের মগজের ওপর অফুরন্ত আস্থা তার। ফলে, অনেকে তাকে দাম্ভিক স্বেচ্ছাচারী ভাবে, ভয় তো করেই। কিন্তু বিপুল বিত্তের অধিকারী এই মানুষটি ভিতরে ভিতরে লোক খারাপ ছিল না। প্রবল ব্যক্তিত্বের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রেখে লোকের উপকার ছাড়া অপকার কখনো করেনি। কোনো কিছু দৃষ্টি এড়াতো না, কিন্তু ঘরের মেয়েটি যে তার আচার আচরণে সর্বতোভাবে তারই উত্তরাধিকারিণী হয়ে উঠেছিল, সে-সম্বন্ধেই খুব সচেতন ছিল না ভদ্রলোক।

সচেতন হয়েছিল কিছু দেরিতে।

সকলে সমীহ করত তাকে। মনে মনে স্ত্রী কমলাদেবীও একটু ভয়ই করত। ভয় করত বলেই সাড়ম্বরে সেটা অস্বীকারও করত সর্বদাই। কিন্তু জীবন-সংগ্রামের শুরু থেকে চেনা বলে ভদ্রলোকের খিটির-মিটির বাধত এই একজনের সঙ্গেই।

চন্দ্রশেখর সেটা এড়াতে চেষ্টা করত, কিন্তু পেরে উঠত না সব সময়। এত অর্থ আর এতবড় ব্যবসার একটা আনুষঙ্গিক উৎপাতও শরীরে দেখা দিয়েছিল। সেটা ব্লাডপ্রেসার। চুপ করে থাকবে ভাবলেও সর্বদা হয়ে ওঠে না। ফলে চিৎকার চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করে তোলে, যখন মেজাজ চড়ে। বাড়ির শান্তি বজায় রাখার জন্য একটা স্বাধীনতা বরাবর দিয়ে এসেছে। টাকার স্বাধীনতা। ব্যাঙ্কে

স্ত্রীর নামে, ছেলের নামে, আর মেয়ের নামে অঢেল টাকা জমা করে রেখেছে। টাকা অন্যায়ভাবে তছনছ করা হচ্ছে কিনা সেটা শুধু খোঁজ-খবর করত ছেলে গণেশ পাঠকের বেলায়। ছেলেরা যত সহজে টাকা নষ্ট করতে পারে, মেয়েরা তার সিকিও পারে না বলে তার ধারণা। টাকা নষ্ট হলেও আক্ষেপ নেই খুব, কিন্তু ছেলে বিপদে পা বাড়ালে সেটা সহ্য হবে না। মেয়ে অথবা মেয়ের মায়ের খরচ নিয়ে ভদ্রলোক একটুও মাথা ঘামাত না। তাদের খরচ বলতে তো শুধু শাড়ী-গয়না-পার্টি আর পার্টির চাঁদা। কত আর খরচ করবে?

তবু স্ত্রীর সঙ্গে যে এক এক-সময় ঝগড়া বেধে যেত, তার একটা কারণ আছে। কমলাদেবী মহিলাটি একেবারে যে নির্বোধ তা নয়। কিন্তু স্বামীর বুদ্ধি আর চিন্তার সঙ্গে তাল রেখে চলা সত্যিই কঠিন ব্যাপার। অথচ এমন একজনের ঘরণী সে, সর্বদা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেই বা কি করে। নিজের যথাযোগ্য মর্যাদা বজায় রাখতে গিয়ে, অর্থাৎ সমান তালে বুদ্ধি আর চিন্তা খাটাতে গিয়েই যত গণ্ডগোল। মহিলা এমন কাণ্ড করে বসে এক-একসময়, বা এমন কিছু বলে যে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা দায়। বাইরের অনেক আচার-অনুষ্ঠানে শুধু মাত্র স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়েই ভদ্রলোকের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। আর তাই নিয়েই তুমুল হয়ে যায় এক-একদিন।

বাবা-মায়ের এই ঝগড়াঝাঁটি যশোমতী বেশ উপভোগ করে। মায়ের হেনস্থা দেখে তার স্বাধীনচেতা মন এক এক সময় ভ্রূকুটি করে ওঠে। আবার বয়স্কদের ছেলেমানুষী দেখে হেসে গড়ায়। তবু বাইরের দিক থেকে বাবার চেয়েও মায়ের ওপরেই তার টান বেশি। তার কারণ, বাবার মেজাজ যে তার নিজেরও। ফলে, মেজাজ যে বেশি দেখায় তার ওপরেই তার মেজাজ চড়তে চায়।

কিন্তু বাড়িতে একদিন গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠল যশোমতীকে নিয়েই। অর্থাৎ, তার বিয়ে নিয়ে। যশোমতী তখন এম-এ পড়ছে। যশোমতী ততদিনে মেয়েদের ক্লাব করেছে। যশোমতী ততদিনে অনেক আসরে গানের খ্যাতি কুড়িয়েছে। যশোমতী এমন অনেক কিছু

করেছে যা তার বয়সে কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। ফলে যশোমতী তখন নিজের থেকে বেশি বুদ্ধিমতী আর কাউকে মনে করে না।

কিন্তু তার বিয়ে নিয়ে বাড়িতে বাবা-মায়ের একটা বিবাদের প্রহসন অনেকদিন ধরেই তলায় তলায় জমাট বেঁধে আসছিল। যশোমতী তা লক্ষ্য করত আর উপভোগ করত। বাবা-মা আর দাদার ত্রিমুখী ধারা দেখে তার বেশ মজাই লাগত। বাবা কারো সঙ্গে পরামর্শ করার মানুষ নয়। তার সব থেকে প্রিয়পাত্র গোঁফওলা বিশ্বনাথ যাজ্ঞিক। চোখে পড়ার মতো প্রশ্রয় বাবা সচরাচর কাউকে দেয় না। কিন্তু বিশ্বনাথের ব্যাপারে তার পক্ষপাতিত্ব যশোমতীর চোখে অন্তত পড়ত। বাড়ির যে-কোনো অনুষ্ঠানে ওকে নেমন্তন্ন করা চাই। কোথাও বেড়াতে যাওয়া হবে ঠিক হলে বাবা তক্ষুনি বলবে, বিশ্বনাথকে খবর দেওয়া যাক, ও সঙ্গে থাকলে নিশ্চিন্তি।

যশোমতীর মতেও হয়তো লোকটা খুব মন্দ নয়, অনেক ব্যাপারে তার খুঁত ধরতে চেষ্টা করেও সামনাসামনি বিরূপ হবার মতো কোনো বড় গোছের ত্রুটি দেখতে পায় নি। তার ওপর লোকটা ধীর-স্থির বিনয়ী স্বল্পভাষী। বাড়িতে সর্বদাই যাওয়া-আসা। কিন্তু ওই গোঁফ চক্ষুশূল যশোমতীর। সে মুখের কথা খসালেই বিশ্বনাথ গোঁফ নির্মূল করে ফেলবে, তাতে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে বলতে যাবে কেন? ওই গোঁফ থেকেই ভিতরের রুচি বোঝা যায়। আসলে গোঁফের এই ত্রুটি আবিষ্কার যে উপলক্ষ মাত্র, যশোমতী নিজেও তা ভালো জানে না। ছেলেটার আসল অপরাধ, সে তার বাবার নির্বাচিত ব্যক্তি। বাবার ব্যবস্থা নাকচ করে দেবার মতো সাবালিকাত্ব যশোমতী অর্জন করেছে। বাবার আদরের মানুষ বলেই তার ওপর রাগ। বাপকে বশ করে যে মেয়ে ধরতে চায়, তার দিকে তাকাতেও রাজি নয় যশোমতী।

অথচ বাবার দুনিয়ায় এক মাত্র বিশ্বনাথই তার মেয়ের যোগ্য ছেলের মতো ছেলে। বাবার এক-নম্বর সেক্রেটারী। বাবার সঙ্গে বার-দুই বিলেত ঘুরে এসেছে। সৎ ব্রাহ্মণবংশের ছেলে। বনেদী

বড় ঘর। কর্মঠ। এরই মধ্যে ব্যবসার নাড়ী-নক্ষত্র সব বুঝে নিয়েছে। তাদের নিজেদের বাড়িতে টাকার ছড়াছড়ি, শুধু বাবার আকর্ষণেই নাকি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। দরকার পড়লে এই এতবড় ব্যবসাটা সে নিজের হাতে চালাতে পারে এখন, এই বিশ্বাসও বাবার বদ্ধমূল।

আর সেই দরকার একদিন-না-একদিন তো পড়বেই। কারণ, ক'বছর আগেই দাদার জন্য বিরাট একটা আলাদা মিল কিনেছে বাবা। সেই মিলের একচ্ছত্র মালিক দাদা। দাদা সেটা চালাচ্ছে এখন। বাবা তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, নিজের মিল যত পারে বড় করে তুলুক—বাপের মিলের কোনো অংশ সে যেন আশা না করে। অর্থাৎ বাবার অবর্তমানে এই মিলের মালিক হবে মেয়ে। এই থেকেই মেয়ের প্রতি বাপের প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতিত্বটুকু বোঝা যাবার কথা। কিন্তু তখন বোঝার মতো চোখ কারো ছিল না। যশোমতীর তো ছিলই না, কারণ, ব্যবসা চালানোর ব্যাপারে বিশ্বনাথের মুখাপেক্ষী না হলে অথৈ জলে হাবু-ডুবু খেতে হবে মেয়েকে—বাবার এই ধারণার বিরুদ্ধেই যশোমতী মনে মনে ভ্রূকুটি করে এসেছে সর্বদা।

যাই হোক, নিজের মিল বাবার সাহায্যে দাদা ভালই দাঁড় করিয়েছে। দাদা বয়সে সাত-আট বছরের বড় যশোমতীর থেকে। দাদাটি বিয়ে করেছিল বাইশ বছর বয়সে। মস্ত বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছিল তার। স্বভাবতই এই ভ্রাতৃবধূটিও বড় ঘরের মেজাজ নিয়েই এসেছিল এ-বাড়িতে। প্রথম দু'চার বছর ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয় হোক সে মানিয়ে চলেছে। তার পরেই তার হাব-ভাব চাল-চলন বাপের বাড়ির ধারায় বদলাতে শুরু করল। এক পরিবারে দুই কর্ত্রীর আধিপত্য টেঁকে না। মায়ের সঙ্গে বউয়ের একটু-আধটু মনকষাকষির সূত্রপাতেই দাদার আলাদা বাড়ি হয়েছে। ভালো জমি বাবা আগেই কিনে রেখেছিল, দাদার বাসনা বুঝে বাড়িও বাবাই তুলে দিয়েছে। সেই বাড়িতে সর্বাধুনিক হাল-ফ্যাশনের ব্যবস্থাগুলো শুধু দাদার টাকায় হয়েছে। অতএব ষোল বছর বয়স না হতেই যশোমতী জানে,

বাবার এই বাড়ির একচ্ছত্র ভাবী মালিক সে-ই।

যাই হোক, বাবার মগজে চেপে বসে আছে বিশ্বনাথ যাজ্ঞিক। তার সঙ্কল্প, ফুরসত মতো বিয়েটা দিয়ে দেবেন। আর তারপরেও মেয়ে-জামাই চোখের আড়াল হবে না। এখানেই থাকবে তারা। সঙ্কল্পের কথা বাবা মুখ ফুটে কখনো বলে নি অবশ্য। অন্তত, এখন পর্যন্ত যশোমতী নিজের কানে বলতে শোনে নি। কিন্তু বাবার মনে কি আছে বোঝা একটুও কঠিন নয়।

দাদা আলাদা বাড়িতে আছে বলেই তার সঙ্গে প্রীতি এবং সদ্ভাব সম্পূর্ণ বজায় আছে। সে নিয়মিত আসে, বাবা-মায়ের খোঁজ-খবর করে। খোঁজ-খবরটা যশোমতীর আরো বেশি নিতে শুরু করেছে ইদানীং—সোজা তার কাছেই আসে, গল্প করে। যশোমতী এবং তার মায়েরও ছেলের বাড়িতে যাওয়া-আসা আসে। এই হৃদ্যতার ফলেই বোনের ওপর কিছুটা জোর আছে ধরে নিয়েছিল দাদা। মনে মনে তাই যশোমতীর জন্যে সে-ও একটি পাত্র স্থির করে বসে আছে। অবশ্য নিজের তাগিদে করে নি, করেছে স্ত্রীর তাগিদে—আর শ্যালকের তাগিদে। শুধু শ্যালক নয়, শ্যালক বন্ধুও বলা যেতে পারে।

এই শ্যালকটি স্বয়ং দ্বিতীয় পাত্র—বীরেন্দ্র যোশী। দাদার নিজের শ্যালক, অর্থাৎ বউদির ভাই। দাদার থেকে বছর দুই ছোট হলেও তারা পরস্পরের গুণমুগ্ধ ভক্ত। দাদার ব্যবসায়ের সে ডান হাত। বিশ্বনাথ যাজ্ঞিক বাবার যেমন ডান হাত, সে-রকম নয়। তার থেকে অনেক বেশি। বাবার ধারণা, ডান হাত দিয়ে সে আর একটি ডান হাত গড়ে তুলেছে, কিন্তু দাদার বিশ্বাস এই শ্যালক-বন্ধুর একাগ্র নিষ্ঠা আর পরিশ্রমের ফলেই তার ব্যবসা এমন চট করে ফুলে ফেঁপে উঠতে পেরেছে।

যশোমতী ধরেই নিয়েছে তাকে বিয়ে করার ইচ্ছেটা সে-ই সঙ্গোপনে দাদার কাছে প্রকাশ করেছে। আর তারপর দাদা-বউদি মেতে উঠেছে। এই মাতামাতিটা আজকাল একটু বেশিই করেছে তারা। দাদার বাড়ি গেলেই তার দেখা অবধারিত মিলবে। বউদিই

হয়তো আগে থাকতে খবর দিয়ে রাখে ভাইকে। বীরেন্দ্র যোশীর ইচ্ছেটা তার হাব-ভাবে অনেক আগেই যশোমতী বুঝে নিয়েছিল। তার দিক থেকে উৎসাহ বোধ করার মতো কোনরকম সদয় আভাস না পেয়ে শেষে দাদাকে মুরুব্বি পাকড়েছে। লোকটির প্রতি দাদা এত নির্ভরশীল যে হয়তো তাকে আশ্বাসই দিয়ে বসেছে, কিছু ভাবনা নেই, ব্যবস্থা হবে।

যখন-তখন দাদা তার শ্যালক-বন্ধুকে নিয়ে এ বাড়িতে হানা দিচ্ছে আজকাল। পরম স্নেহভরে হাঁক-ডাক করে বোনকে ডাকে। আর ফাঁক পেলেই বন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। ছদ্ম বিস্ময়ে যশোমতী এক একসময় হাঁ করে চেয়েই থাকে বীরেন্দ্র যোশীর দিকে—অর্থাৎ এত গুণ কোনো এক মানুষের থাকে সেই বিস্ময়েই যেন তার চোখের পলক পড়ে না।

আনন্দে পুলকে বীরেন্দ্র যোশী ঘামতেই থাকে বোধহয়। এখানে বিয়ে হলে এই দিকের বিশাল সম্পত্তিও নিজেদের মধ্যেই থেকে গেল …দাদার কানে বউদির এই মন্ত্র ঢোকানও বিচিত্র নয়।

কিন্তু এই পাত্রও যে আদৌ পছন্দ নয়, সে শুধু যশোমতীই জানে।

মায়ের হাতেও তার বিশেষ পছন্দের পাত্র আছে একটি। তৃতীয় ক্যাণ্ডিডেট। রমেশ চতুর্বেদী। বড় মিল-মালিকের ছেলে সে-ও। রমেশ চতুর্বেদীর মায়ের সঙ্গে যশোমতীর মা কমলা দেবীর ইদানীং খুব ভাব। ভাবের সমস্ত রাস্তা রমেশের মা-ই প্রসারিত করেছে। সেটা ছেলের মুখ চেয়ে। রমণীমহলে মহিলাটি কমলা দেবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে চেষ্টা করা দূরে থাক, উল্টে তাঁর কথায় সর্বদা সায় দিয়ে চলে। মায়ের বিচারবিবেচনা বুদ্ধির প্রশংসা তার মুখে যত, আর কারো মুখে ততো নয়। আর ছেলের তো কথাই নেই, মাসি বলতে অজ্ঞান। সে যে অনুষ্ঠানের মাতব্বর, মাসি অর্থাৎ যশোমতীর মায়ের সেখানে সর্বাগ্রগণ্য মর্যাদা। যশোমতী দেখে আর হাসে আর ভাবে এমন ভাবী শাশুড়ী-ভক্ত মানুষ সচরাচর দেখা যায় না বটে।

অতএব মায়ের মতে রমেশ চতুর্বেদী হীরের টুকরো ছেলে। বিয়ে

না হতেই যে ছেলে তাকে এতটা মর্যাদা দেয়, বিয়ে হলে সে কি করবে? অভিজাত মহলে একটু বিশেষভাবেই গণমান্য হয়ে ওঠার ইচ্ছেটা মায়ের একটু বেশিই। তার ধারণা জামাই হলে রমেশ এ ব্যাপারে সকলের থেকে কাজের হবে। বছরে দু'তিনটে বড় ফাংশানের মাতব্বর সে বটেই, তার জামাই হলে ভবিষ্যৎটা আরো উজ্জ্বল তো হবেই। যশোমতী মায়ের বাসনা বুঝে মনে মনেই শুধু হাসে, বাইরে নির্বোধের মতো থাকে। কারণ, তার বিবেচনায় রমেশ চতুর্বেদীও বাতিল। কেন বাতিল, সেটা অত তলিয়ে ভাবে নি, নির্বাচনটা মায়ের বলেই হয়তো নির্দ্বিধায় বাতিল।

সকলকে বাদ দিলেও ক্যাণ্ডিডেট তার নিজের হেপাজতেও জনা দুই অন্তত আছে। প্রত্যাশীর সংখ্যা তার ঢের বেশি, কিন্তু তাদের মধ্যে এই দু'জন আর কোনো সুপারিশের ওপর নির্ভর না করে বুদ্ধিমানের মতো নিজেরাই এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। শিবজী আর ত্রিবিক্রম। এরাও মস্ত ঘরের ছেলে। কুল-মান-যশে কারো থেকে ফেলনা নয়। অন্যদের মতোই রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। লেখা-পড়ায় তো ভালই আবার পাঁচ কাজে চটকদার উদ্ভাবনী শক্তিও আছে। বিশ্বনাথ বাবার মুখ চেয়ে আছে, রমেশ চতুর্বেদী মায়ের— আর বীরেন্দ্র যোশী দাদার। এদের তুলনায় শিবজীর চালচলন শিবজীর মতোই সুতৎপর, আর ত্রিবিক্রমের রসিকতার বিক্রম অন্তত তিনগুণ বটে। এই দুজনের একজনকেই যে একেবারে স্বতঃসিদ্ধভাবে গ্রহণ করে বসে আছে যশোমতী, এমন নয় আদৌ। তবে ঘরের কল্পনা যদি কখনো-সখনো করতে হয়, এই দুজনের একজনকে নিয়েই করতে চেষ্টা করেছে। কখনো ভাল লাগে নি, কখনো বা একেবারে মন্দ মনে হয় নি। তবে অন্য সকলের থেকে এই দুজনের প্রতি যশোমতীর একটু অনুকম্পা বেশি, কারণ, তারা শুধু তারই ওপর নির্ভর করে আসছে। তাদের সুপারিশ সরাসরি তারই কাছে।

দাদা বলে, যোশীর শিকারে বেরুবার ইচ্ছে, আমরাও যাব ভাবছি, তুই যাবি?

অবধারিত ভাবেই যশোমতীর ভুঁ চোখ কপালে উঠবে। কারণ, দাদা এক-এক সময় যোশীর এক-একটা গুণ আবিষ্কার করে থাকে। তারপর চোখের নীরব বিস্ময় চৌচির হয়ে গলায় এসে ভাঙে।—…কি আশ্চর্য, তার আবার শিকারের শখও আছে নাকি!

—শখ মানে? নেশা! ক'টা বছর ব্যবসা নিয়ে মেতেছিল বলে, নইলে কোন্ গুণ না আছে তার? এ-রকম একটা ছেলেও তো আজকাল আর দেখা যায় না। দেখা যায় না সেই খেদে দাদার দীর্ঘনিঃশ্বাই পড়ে।

চমৎকৃত না হয়ে উপায় নেই যশোমতীর, মাথা নেড়ে সায় দেয়, সত্যি…ভদ্রলোক গান-বাজনায় ভালো, খেলাধুলোয় তো কথাই নেই, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ছেড়ে না দিলে লেখাপড়াতেও তার জুড়ি ছিল না শুনেছি, ব্যবসায়ও এত মাথা, এখন আবার শুনছি শিকারেও ওস্তাদ। আর আজকালকার ছেলেগুলো যা হয়েছে, কিছুতে পাকা হতেই মেরুদণ্ড বেঁকে যায়।

দাদার উদ্দীপনা চতুর্গুণ। গলা খাটো করে বলে, সেই জন্যেই তো বলছি, ওই রকম একটা ছেলেকে আত্মীয় করে নিতে পারা ভাগ্যের কথা—

যশোমতীর বোকা বোকা বিস্ময়, তোমার নিজের শালা… আত্মীয়ই তো!

ফলে বোনকে বোকাই ভাবে দাদা, এই এক ইঙ্গিত যে কতবার কত ভাবে করেছে, ঠিক নেই। কিন্তু ওর মাথায় কিছু ঢুকলে তো, বাবার টাকায় হৈ-চৈ করে, লোকে ভাবে বুদ্ধিমতী। ফলে মাথায় ঢোকানোর চেষ্টায় সেই অগূঢ় ইঙ্গিতের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। শুনে যশোমতী লজ্জা পায় প্রথম, পরে চিন্তিত মুখে বলে, কিন্তু বাবার যে আবার অন্যরকম ইচ্ছে।

—দূর দূর দূর! বিতৃষ্ণায় নাক-মুখ দেখার মতোই কুঁচকে ওঠে দাদার।—কোথায় যোশী আর কোথায় বিশ্বনাথ। আত্মসম্মানবোধ থাকলে কেউ সেক্রেটারির কাজ করে! নিজেদের একটা কর্মচারীকে

বিয়ে। বংশের কে কবে রাজা-উজীর ছিল বাবার কাছে সেটাই বড়। তুই জোর দিয়ে আপত্তি কর, লেখাপড়া শিখেছিস, অন্যের কথায় বিয়ে পর্যন্ত করতে হবে নাকি? আর বাবা তো তোকে একটু ভালোই বাসে, তোর আপত্তি শুনলে এগোবে না।

দাদার বরাবরই বিশ্বাস তার থেকেও বাবার চাপা স্নেহ এই বোকা বোনটার প্রতিই অনেক বেশি।

নিরীহ এবং চিন্তাচ্ছন্ন মুখে যশোমতী প্রস্তাব করে, আমার হয়ে বাবার কাছে আপত্তিটা তুমিই করে দাও না?

দাদা তিক্ত বিরক্ত, বিয়ে করবি তুই আর আমি যাব আপত্তি করতে? তাছাড়া বাবা অমনি ধরে নেবে আমার শালার টানেই ব্যাগড়া দিতে গেছি।

যশোমতী আরো কাতর মুখ করে জবাব দেয়, ধরলেই বা, সেটা তো আর সত্যি নয়, তুমি তো আমার মুখ চেয়েই বলতে যাচ্ছ। তা যদি না পারো তাহলে থাকগে, আমার কপালে যা আছে তাই হবে।

প্রায় হাল ছেড়েই দাদা আবার নতুন করে বোঝাতে বসে তাকে, সাহস দেয়, উদ্দীপনা সঞ্চার করে। যশোমতী শেষে তাকে ভরসা দিয়ে বলে, আচ্ছা, মনে মনে কিছুদিন আগে জোর গলায় আপত্তি করি, শেষে ঝপ করে বাবাকে একদিন বলে ফেলতে পারব।

সুযোগ পেলে মা-ও তার প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়। তবে মা দাদার মতো অত বাঁকা রাস্তা ধরে এগোয় না। সোজা ব্যাপার ছাড়া মাথায় ঢোকে না, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলতেও পারে না। মা সোজাসুজি বলে, মিসেস চতুর্বেদী তো মুখের কথা পেলেই কাজে নেমে পড়ে, আমাদের দিক থেকে আর দেরি করা উচিত নয়, রমেশের মতো ছেলের জন্য কত মেয়ের মা তো হাত বাড়িয়েই আছে।

আবার সেই নির্বুদ্ধিতার পুনরাভিনয়।—মেয়ের মা হাত বাড়িয়ে আছে কি মা?

—আঃ। কমলা দেবী বিরক্ত, কিছু যদি বুঝিস—হাত বাড়িয়ে আছে মানে রমেশের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছে।

—ও…। তা দিচ্ছে না কেন?

—কতবার বলব তোকে, তারা যে আমাদের সঙ্গেই কাজ করতে চায়!

যশোমতীর মুখখানা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবেই এবার। মাকে তাতিয়ে তোলার মোক্ষম উপায়ই জানা আছে তার, অতএব হেসে ফেললে মুশকিল। তাই তার মতে সায় দেবার মতো করেই সমস্যাটা ব্যক্ত করবে। বলবে, দাদা যে আবার তার শালার কথা বলে?

—কি! মায়ের মেজাজ চড়বে তৎক্ষণাৎ।—এখনো বুঝি সে সেই মতলবে আছে? এক মেয়ে এনেই খুব আক্কেল হয়েছে, আবার ওই-খানে! আস্পর্ধার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। সাফ না বলে দিবি। তাছাড়া বীরেন্দ্রও ছেলে আর রমেশও ছেলে…কার সঙ্গে কার তুলনা!

একজনের তুলনায় আর একজন ছেলে কিনা মায়ের প্রায় সেই সংশয়। মেয়েকে বোকার মতো চেয়ে থাকতে দেখে তার অস্বস্তি বাড়ে, আবার তোকে কি বলেছে শুনি?

করুণ অবস্থা যশোমতীর মুখের, বলছিল, যোশীর মতো এত গুণের ছেলে অর্ডার দিলেও আর মিলবে না, ভগবানের হাত ফস্কে ওই একজনই এসে গেছে।

রসিকতার ধার দিয়ে না গিয়ে মা রেগে লাল, ও বলল আর তুই অমনি ভুলে গেলি?

—ভুলব না বলছ?

—দেখ্, তোর বয়স হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছিস, একটু বুদ্ধি রেখে চলতে চেষ্টা কর। এই সব ওই বউয়ের কারসাজি, একজনকে তো কেড়েছে আবার তোর দিকে চোখ পড়েছে। রমেশের পাশে ওই যোশী একটা বাঁদর—যাকে বলে একটা কাক—বুঝলি?

মায়ের রাগের মুখে এই গোছেরই উপমা বেরোয়। যশোমতীর দু'চোখ কপালে, উচ্ছ্বসিত হাসির দমক আর ঠেকাতে পারেই না বুঝি।

এদিকে শিবজী আর ত্রিবিক্রম চুপ করে বসে নেই। তারা

বিশ্বনাথ যাজ্ঞিককে চেনে রমেশ চতুর্বেদীকে চেনে। আর তাদের খুঁটির খবরও রাখে। ওরা নিজেরা দু'জনে আবার একাত্ম বন্ধু। ফলে রেষারেষিটা বাইরে থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। রমেশ বা বীরেন্দ্রর জন্য তাদের চিন্তা নেই। খোদ কর্তার ক্যাণ্ডিডেট বলে তাদের যা কিছু দুর্ভাবনা বিশ্বনাথকে নিয়ে আর পরস্পরকে নিয়ে। যখন আসে, প্রায়ই একসঙ্গে আসে দু'জনে। আর বৈচিত্র্যের আশায় দু-একটা প্রস্তাব তারাও করে, অনেকদিন একঘেয়ে কাটছে, একটু এক্সকারশনে বেরুলে হত...

যশোমতী চোখের কোণে দু'জনকেই লক্ষ্য করে নির্লিপ্ত জবাব দেয়, বীরেন্দ্র যোশী শিকারে যাবার কথা বলছিল !

সঙ্গে সঙ্গে মুখে আঁচড় পড়ে ওদের। শিবজী বলে, হুঁঃ! বাপের আমলের বন্দুকে মরচে পড়ে গেছে শুনেছি—

ত্রিবিক্রম নড়ে-চড়ে বসে বিতৃষ্ণার আবেগ সংযত করে হাল্‌কা সুরেই জিজ্ঞাসা করে, কোথায় শিকারে যাবে, চিড়িয়াখানায় ?

এই সবই উপভোগ করে যশোমতী। ছেলেদের নিয়ে খেলা করে যে মেয়ে, যশোমতী তাদের একজন নয়। সে কাউকে ডাকে না, কাউকে কোনো রকম চটুল আশায় বা আশ্বাসে ভোলায় না। নিজের স্বভাব কৌতুক ছাড়া কারো সঙ্গে রঙ্গ-রসে মেতেও ওঠে না। তবু আসেই যদি সব, ও কি করতে পারে ? তাই বাস্তবিকই মজা লাগে তার। বাবাই শুধু কিছু বলে না। অর্থাৎ তার বিবেচনার ওপর কথা বলার কেউ নেই—এই ভাব।

কিন্তু এ-ধরনের পারিবারিক অথবা বাইরের মানুষদের নিয়ে প্রহসন যত কৌতুককরই হোক, শুধু এই নিয়ে দিন কাটানো শক্ত। তার সান্নিধ্যে আসার রেষারেষি যাদের, সকলেই তারা বিত্তবান। তাদের ঘিরে অনেক মেয়ের বাবা মায়ের আগ্রহ। কিন্তু বিত্তের মোহ আর যারই থাক যশোমতীর থাকার কথা নয়। সে যে কোন্ বিত্ত খোঁজে, নিজেও ভালো করে জানে না। এক-এক সময় কেমন ক্লান্তি

অনুভব করে। এ ক্লান্তি ঠিক বাইরের নয় তাও অনুভব করতে পারে। বিলাস-প্রাচুর্যে ভরা জীবনের এই বাঁধা-ধরা ছকের মধ্যে কি যেন ফাঁক খোঁজে একটা। পড়াশোনা করে, গান করে, ক্লাব নিয়ে মেতে ওঠে। কিন্তু তবু ওই অগোচরের ফাঁকটা যেন ভরাট করে তোলা যায় না।

এমন দিনে, বাবার সঙ্গে মায়ের তুমুল বেধে গেল। বাধল মেয়ের বিয়ে নিয়েই। আলোচনার গোড়ায় দাদাও উপস্থিত ছিল, মনে মনে সে অনেক শক্তি সংগ্রহ করে অনেক ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল। বাপ-মায়ের মুখের উপর এক বীরেন্দ্র ছাড়া আর সকলকে বাতিল করার সঙ্কল্প মনের তলায় দানা বেঁধে উঠেছিল। সম্ভব হলে আর ফাঁক পেলে নিজের ইচ্ছেটা যশোমতীর ইচ্ছে বলে চালিয়ে দিতেও আপত্তি নেই। কিন্তু চেষ্টার মুখেই বেগতিক দেখে পালিয়েছে।

প্রশ্নটা মা-ই তুলেছিল।—মেয়ে এম-এ পাস করতে চলল, বিয়েটা আর কবে হবে?

বাবা বলল, দিলেই হয়, চমৎকার ছেলে তো হাতের কাছে রয়েছে।

মা জেনেশুনেই আকাশ থেকে পড়ল।

—কে চমৎকার ছেলে, বিশ্বনাথ? সেক্রেটারির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে! কি-যে উদ্ভট চিন্তা তোমার মাথায় আসে····লোকে বলবে কি? আমি তো ভাবতেও পারি নে—তার থেকে রমেশ অনেক ভাল ছেলে, তাদেরও খুব ইচ্ছে।

যশোমতী ও-ঘরের আড়াল থেকে দেখছে, শুনছে, হাসছে। মায়ের দিকে বাবা এমন করে তাকালো যাতে ভরসা পেয়ে দাদা বলল, আমার বিবেচনায় বিয়েটা বীরেন্দ্রর সঙ্গে হলেই সব থেকে ভালো হয়, তাদেরও খুব আগ্রহ।

—বীরেন্দ্র কে? বাবার গম্ভীর দৃষ্টিটা সরাসরি দাদার মুখের ওপর।

আর দাদার এই মুখ দেখে দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে যশোমতী হাসি সামলাচ্ছে। মাথা চুলকে দাদা জবাব দিল, ইয়ে···আমাদের বীরেন্দ্র।

—তোমাদের বীরেন্দ্র ! ও…তোমার সম্বন্ধী বীরেন্দ্র ?

—আজ্ঞে।

—তা খুব আগ্রহটা কার ?

—ওদের বাড়ির সকলেরই…।

নিশ্বাস রুদ্ধ করে দেখছে যশোমতী, শুনছে। মা ঝলসে ওঠার আগে বাবাই গম্ভীর মুখ করে জবাব দিল, তোমার বোনকে বিয়ে করার বা ঘরে নেবার আগ্রহ অনেকেরই হতে পারে। অন্যের আগ্রহের কথা ভেবে কাজ নেই, তোমার বোনের বিয়ে আমাদের আগ্রহ অনুযায়ী হবে।

ব্যস, দাদার আর কথা বলার সাহস নেই। মনে মনে বোনকে তাতানোর সঙ্কল্প নিয়েই প্রস্থান করতে হল তাকে। ঘরে পুরো দমে পাখা ঘুরছিল, তা সত্ত্বেও ঘেমে নেয়ে একাকার। দাদা চলে যেতে বাবা আবার বলল, রমেশের সঙ্গে নয়, বিয়ে বিশ্বনাথের সঙ্গেই হবে। আমি অনেক ভেবেই স্থির করেছি।

সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মর্যাদায় ঘা পড়ল যেন। দাদার মতো মা-ও যে নিজের ইচ্ছেটাকে যথাস্থানে তুলে ধরার কত-রকম জল্পনা-কল্পনা করেছে আর কতবার কতরকমভাবে মন স্থির করছে সে শুধু যশোমতীই আঁচ করতে পারে। বাবার এক কথায় সব ধূলিসাৎ যেন। বলে উঠল, মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দাও না তার থেকে—

বাবা রাগলেও গোড়ার দিকে খানিকক্ষণ ঠাণ্ডা মুখেই কথা বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু বচন কদাচিৎ মোলায়েম হয়ে থাকে। বলল, তোমাদের মেয়েদের যেখানেই ফেলা হোক, হাত-পা বেঁধেই ফেলতে হয়। জলে না ফেলে আমি ভালো জায়গাতেই ফেলছি। যা বোঝো না, তা নিয়ে মাথা ঘামিও না।

বাবার এই অবজ্ঞার কথা শুনে এ-ঘরে যশোমতী ভুরু কোঁচকাল। কিন্তু ও-ঘরে মায়ের গোটাগুটি মানহানি ঘটে গেছে। মোটা শরীর নিয়ে ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে মা ফুঁসে উঠল, কি বললে ? আমাদের

হাত-পা বেঁধে ফেলতে হয়? আমার মেয়ে আমি বুঝি না, আর তুমি দিনরাত ব্যবসায় ডুবে থেকে সব বোঝো? আমার মেয়ের বিয়ে কোথায় দেবে আমাকে জিজ্ঞাসা করারও দরকার মনে করো না, কেমন? আমাদের মান-মর্যাদা বলে কিছু নেই—রমেশের মাকে আমি আশা দিয়েছি সেটা কিছু নয়?

বাবার মন্থর পায়চারি করা থেমে গেল। স্নায়ু তেতে ওঠার উপক্রম হলেই ও রকম পায়চারি করে থাকে। চাপা গর্জন করে উঠল, মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা শাড়ি গয়না দেওয়া নয়, কে তোমাকে আশা দিতে বলেছে?

মায়ের পাল্টা জবাব, কেন দেব না? আমি মেয়ের ভালো-মন্দ বুঝি না?

এই থেকেই বিবাদ চড়চড় করে অন্তরায় একেবারে। বাবা অজস্র কথা বলতে লাগল। মায়ের প্রিয়পাত্রের প্রতি অর্থাৎ রমেশ চতুর্বেদীর প্রতি যশোমতীর এতটুকু টান নেই, কিন্তু তবু গোটা মেয়েজাতটার প্রসঙ্গে বাবার অপমানকর উক্তিগুলি যেন তপ্ত গলানো সিসের মতো যশোমতীর কানে ঢুকতে লাগল। যা বলে গেল তার সারমর্ম, ভালো-মন্দ বোঝা দূরের কথা, অন্যের ওপর নির্ভর না করে তুনিয়ায় এক পা চলার মুরোদ নেই মেয়েদের। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা হাতের ওপর এনে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে বলেই আজ মান-মর্যাদার কথা। টাকায় মুড়ে রাখা হয়েছে বলেই তুনিয়াটা কি তারা টের পায় না—শো-কেসের পুতুলের মতো নিরাপদ আভিজাত্যের কাচ-ঘরে সাজিয়ে না রাখলে নিজেদের ক্ষমতায় তু'দিন যাদের বেঁচে থাকার সামর্থ্য নেই তুনিয়ায়, তাদের আবার মতামত, তাদের আবার বিবেচনা। আরো বলেছে বাবা। বলেছে পায়ে হেঁটে একদিন রাস্তায় নেমে দেখে এসো কেমন লাগে, কত ধানে কত চাল—তারপর মান-মর্যাদার কথা বোলো। আর বলেছে, এই বাড়ি-ঘর এই ঐশ্বর্যের বাইরে গিয়ে দশ পা মাটিতে ফেলে হেঁটে দেখে নাও মাটির তুনিয়াটা কেমন, তারপর ভালো-মন্দ বোঝার দম্ভ দেখিও। হুঁঃ, ভালো-মন্দ বোঝে, মান মর্যাদার বড়াই

—কে ফিরে তাকায় তোমাদের দিকে আগে একবার বুঝে আসতে চেষ্টা করলে ওই লম্বা লম্বা বুলি আর মুখে আসত না।

মায়ের এক একটা ক্রুদ্ধ জবাবের ইন্ধন পেয়ে বাবা এ-রকম অজস্র কথা বলে গেল। কথা নয়, এক এক প্রস্থ গলানো আগুন ঝরলো যেন। প্রতিটি রোষোক্তিতে সমস্ত নারীজাতির মান-সম্ভ্রম একেবারে যেন আঁস্তাকুড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

মা তখনকার মতো কান্না জুড়ে দিতে বাবা ক্ষান্ত হল। কিন্তু যশোমতী কাঁদবে কি, তার দু'চোখ ধকধক করে জ্বলছে। সে এম-এ পড়ে, সে গানের স্কুল করেছে, সে মেয়েদের ক্লাব করেছে, সে যেখান দিয়ে হেঁটে যায় পুরুষের সঙ্গোপন অভিলাষ তার সঙ্গে ছোটে—এই নিয়েই পরম আনন্দে ছিল সে। কিন্তু বাবা এ-সব কি বলছে? বাবাও পুরুষ, পুরুষের চোখে আসলে তাহলে কতটুকু মর্যাদা তাদের? বাবার এই উক্তি যেন সমস্ত পুরুষেরই উক্তি। আজ যারা আশায় আশায় যশোমতীর দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে, তারাও একদিন ওই কথাই বলবে। না যদি বলে, টাকার লোভে টাকার খাতিরে বলবে না। কিন্তু মনে মনে বাবা যা বলল তাই বলবে। বাবা যা ভাবে তাই ভাববে। বাবার তাহলে এই ধারণা? এই বিশ্বাস? তার টাকা আছে বলেই এই অভিজাত সমাজে তাদের যেটুকু দাম যেটুকু খাতির, যেটুকু মর্যাদা! তারা শো-কেসের পুতুল, আভিজাত্যের কাচ-ঘরে লালন করে কোনো রকমে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়, নিজের পায়ের নির্ভরে দুনিয়ায় দুটো দিন তাদের বেঁচে থাকারও ক্ষমতা পর্যন্ত নেই! এত তুচ্ছ এত অক্ষম এত কৃপার পাত্রী তারা? বাবার এমন কথা!

সমস্ত রাত ধরে আগুন জ্বলল যশোমতীর মাথায়। কিছু একটা করতে হবে তাকে, জবাব দিতে হবে। সমস্ত মেয়েজাতের ওপর পুরুষের এত অবজ্ঞা এত অপমান সে বরদাস্ত করবে না। যশোমতী জবাব দেবে। দেবেই। সমস্ত রাত ধরে সঙ্কল্প দানা বেঁধে উঠতে লাগল।

পরদিন মা গম্ভীর, কিন্তু যশোমতীর মুখ পাথরের মতো কঠিন।

জীবনে কিছু একটা আমুল পরিবর্তন ঘটে গেছে তার। রাতের সঙ্কল্প দিনের আলোয় আরো বেশি আঁট হয়ে বসেছে মুখে।

যশোমতী প্রতীক্ষা করছে।

সকালে খুব ভালো করে চান করে উঠেছে। তারপর আবার প্রতীক্ষা করছে। এই বাড়ির কোনোদিকে সে তাকাতে পারছে না, কোনোদিকে চোখ ফেরাতে পারছে না—সর্বত্র শো-কেস দেখছে। আভিজাত্যের নিরাপদ শো-কেস। এই শো-কেস যোগায় বলে পুরুষের এত গর্ব এত দর্প আর তাদের প্রতি এত অবজ্ঞা।

যশোমতীর দম বন্ধ হবার উপক্রম।

দশটা না বাজতে বড় গাড়ি নিয়ে বাবা অফিসে বেরিয়ে গেল। যশোমতী আগেই ঠাণ্ডা মাথায় খেয়ে নিয়েছিল কিছু। কোনো ব্যাপারে ছেলেমানুষি করবে না। শো-কেস ভাঙতে চলেছে, ছেলে-মানুষী করলে দ্বিগুণ হাসির ব্যাপার হবে। সে বাস্তবে নামতে যাচ্ছে, বাস্তব দেখতে যাচ্ছে, বাস্তব বুঝে চলতে হবে।

বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মাকে বলল, এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে, ফিরতে দেরি হবে।

এটুকু মিথ্যার আশ্রয় না নিলেই নয়। যাই হোক, এই মিথ্যার পরমায়ুও বেশি হবে না নিশ্চয়। সত্য যা, তার আলমারির দেরাজে লেখা আছে। মাকে লেখে নি, তার জ্বালা আর যাতনা মা বুঝবে না। কতখানি অপমান বাবা করেছে মা জানে না। তাই আলমারির দেরাজে খামের চিঠি বাবার উদ্দেশ্যে লেখা। লিখছে, শো-কেসের পুতুল হয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই, মাটির তুনিয়া দেখতে চললাম, এই তুনিয়ায় বেঁচে থাকার সামর্থ্য যদি না-ই থাকে, তখন নিজেই তোমার শো-কেসে ফিরে আসব আবার, আর তোমার সব অপমান মাথায় তুলে নেব। তার আগে দয়া করে খোঁজ করো না।— যশোমতী।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ব্যাঙ্কে এলো প্রথম। বাস্তব বুঝে চলতে হবে, তাই টাকা কিছু লাগবেই। দ্বিতীয় একখানা শাড়ি শুধু শৌখীন বড়

ব্যাগটার মধ্যে পুরে নিয়েছে। ওই ব্যাগ ছাড়া সঙ্গে আর কিছু নেই।

প্রথমেই টাকা তুলতে হবে ব্যাঙ্ক থেকে। বলতে গেলে শূন্য হাতে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। ব্যাঙ্কে এলো। চেকে টাকার অঙ্ক বসানোর আগে ভাবল কত টাকা তুলবে। পঞ্চাশ হাজার, ষাট হাজার, সত্তর হাজার—যা খুশি তুলতে পারে। কত যে আছে সঠিক হিসেব রাখে না, আছে যে অনেক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার নামে থাকলেও কার টাকা তুলবে? বাবারই টাকা। যে-বাবার মতে তারা শো-কেসের পুতুল, নিজের পায়ের ওপর ভর করে যারা দাঁড়াতে শেখে নি। অতএব যত কম তোলা যায়, কারণ যা তুলবে তা ধার হিসেবেই তুলবে। সেই ধারও একদিন শোধ করবে। করবেই। ভেবেচিন্তে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা তুলল। এতকালের প্রকৃতি ডিঙিয়ে পাঁচ হাজার টাকার থেকে নগণ্য অঙ্কের টাকা আর ভাবা গেল না। টাকা চেক-বই কলম ব্যাগে পুরে আবার বেরিয়ে পড়ল।

কোথায় যাবে বা কি করবে এখনো ভাবা হয় নি। ভাবতে হবে। কিন্তু এখানে বসে নয়, বেশ দূরে কোথাও গিয়ে ভাবতে হবে। যেখানে গেলে কেউ তার হদিস পাবে না। তারপর ভেবেচিন্তে আরো অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। এই আভিজাত্যের শো-কেস থেকে অনেক দূরে।

॥ পাঁচ ॥

শঙ্কর সারাভাইয়ের মাথা আর চিন্তা আর দূরদৃষ্টির ওপর কারো যদি বিশেষ আস্থা থেকে থাকে—সেটা ছিল তার মেসো মহাদেব সারাভাইয়ের।

কিন্তু মগজের ওপর আস্থা যত ছিল, তার চাল-চালন কাজকর্মের প্রতি বিশ্বাস ততো ছিল না। নইলে এতবড় কট্‌ন্ চেম্বারের সে সুপারিনটেনডেণ্ট, কত লোককে এখানে ঢোকাল, কতজনের সংস্থান

করে দিল, কতজনকে ওপরে তুলল, ঠিক নেই। মানুষ করতে পারল না শুধু স্ত্রীর আদরের বোনপোটিকে। তার মতো বি. এসসি. পাস করে সাত বছর ধরে ছোকরা ভ্যারেণ্ডা ভাজছে। তার অফিসে চাকরি করার জন্য কতদিন সাধাসাধি করেছে, কিন্তু এখনো হতভাগা আকাশ-কুসুম কল্পনা নিয়ে আছে। চিন্তা করলে কাজের চিন্তা করতে পারে সেটা তার থেকে বেশি আর বোধহয় কেউ জানে না। কিন্তু সেদিকে না মাথা না মন।

বাপের যা ছিল কুড়িয়ে কাঁচিয়ে ব্যবসায় ঢেলেছে। সেও শহরে নয়, এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে মৌলায় গিয়ে। ব্যবসা বলতে ভাঙাচোরা মেশিন একটা, নিত্য অচল হয়, আর গোটাকতক তাঁত। বিধবা বড়বোনকে নিয়ে সেখানেই থাকে—হাঁড়িতে জল ফোটে, দোকানে চাল। তবু ব্যবসা করার গোঁ যায় না। ওদিকে মূলধনের অভাবে মাসের মধ্যে দশদিন ফ্যাক্টরি বন্ধ। চলুক না চলুক গাল-ভরা নাম না হলে মন ওঠে না—চাল নেই চুলো নেই, তবু ফ্যাক্টরি। আজ যন্ত্র বিগড়ল, কাল সুতোয় টান পড়ল—এমনি একটা না একটা লেগেই আছে।

মেসো নিঃসন্তান। অতএব বোনপোর প্রতি স্ত্রীর স্নেহ ঠেকাবে কি করে। টাকার দরকার হয়ে পড়লে মাসি-অন্ত প্রাণ ছেলের। মাসিও টাকা চেনে না এমন নয়। কিন্তু একবার যদি হুকুম হয়ে গেল, দাও, তো দাওই। কম করে দু-তিন হাজার টাকা এ পর্যন্ত তাকেও শ্রীমানের ওই ব্যবসায় ঢালতে হয়েছে। সেই টাকা সব জলে গেছে। বার কয়েক ঘা খেয়ে তবে স্ত্রীর একটু টনক নড়েছে। ভদ্রলোকের রোজগার ভাল, খরচ কম। তাই হাতে আছেও কিছু। কিন্তু কৃপণতার ধাত। শঙ্করকে মনে মনে পছন্দ করে, কিন্তু তাকে দেখলে অস্বস্তি বোধ করে। ভয়, এই বুঝি খসাতে এলো কিছু।

কিন্তু তবু এই ছেলেটাকে পছন্দ করারও একটা কারণ আছে। ভদ্রলোকের টাকার ওপর লোভ খুব। আগে আগে এই লোভে শঙ্কর ভালই ইন্ধন যুগিয়ে এসেছে। যে বিশ্বাসের ফলে টাকার মুখ দেখা

যায়, সেই বিশ্বাসটাকে সকলেই আঁকড়ে ধরতে চায়। ম্যাজিকের মতো হাতে-নাতে সেই ফল দেখিয়ে ভদ্রলোককে ঘায়েল করেছে সে। তাই তার ওপর ক্ষোভও যেমন তলায় তলায় আশাও তেমন।

ব্যবসায় দুর্বুদ্ধি মাথায় চাপার আগে কিছুকাল শেয়ার-বাজারে ঘোরাঘুরি করেছিল আর সেখানে থাকতে ছোকরার মাথাও ভালো খুলেছিল। সেখানকার কিছু মাথাওয়ালা লোকের সঙ্গে খাতিরও হয়ে গিয়েছিল। তাদের পরামর্শের সঙ্গে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বেশ দু'পয়সা বাড়তি রোজগারের সহায়তা করেছিল মেসোর। দুশো টাকা হাতে নিয়ে পনেরো-বিশ দিনের মধ্যে চার পাঁচশো টাকা এনে দিয়েছে—এমন বার কতক হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্বাস বাড়তে বাড়তে মেসো এক-একবার হাজার দু-হাজার টাকাও তুলে দিয়েছে শঙ্করের হাতে। দেবার সময় তার হাত অবশ্যই কেঁপেছে আর সে টাকা ফিরে না আসা পর্যন্ত রাতে ভালো ঘুম হয় নি। তারপর আবার যে পরিমাণ টাকা ফিরেছে, তাতেও ঘুম হয় নি। শঙ্করকে এই নিয়েই থাকতে বলেছে সে, দিন-কাল সম্পর্কে অনেক গুরুগম্ভীর উপদেশ দিয়েছে। এমন কি উদার চিত্তে তার আর তার দিদির ভারও নিতে চেয়েছে। কিন্তু সুবুদ্ধি থাকলে তার এই দশা হবে কেন, তাহলে তো তার অফিসে চাকরিই করত একটা। মাথা দিয়ে কাজ করলে উন্নতিও যে সহজেই করতে পারত কোন সন্দেহ নেই। তার ওপর আপনার জন যখন আগেই মাথার ওপর। চাকরিটা করলে মেসোর দুর্ভাবনা থাকত না, হাতের মুঠোতেই রাখা যেত ওকে। আর মন দিয়ে তখন বাড়তি রোজগারের চেষ্টায়ও লাগা যেত। লাভ তাতে দু'জনেরই হত। কিন্তু চাকরির নাম মেসো আর মুখেও আনবে না। কারণ খোদ মালিককে বলে সেবারে চাকরি একটা ঠিক করেই ফেলেছিল। যেদিন জয়েন করার কথা সেদিন থেকে দু'মাসের মধ্যে আর তার টিকির দেখা নেই। তারপর তার অনুপস্থিতিতে লুকিয়ে লুকিয়ে মাসির কাছে আসা হয়েছে।

তার আগে মাসির ছটফটানি, বাউণ্ডুলেটা কোথায় উবে গেল,

মৌলায় চিঠি দিয়েও জবাব পায় না। শেষে একদিন চুপি চুপি এসে নালিশ, চাকরি নেয় নি বলে মেসো আর মুখ দেখবে না ধরে নিয়ে আসা বন্ধ করেছে।

আর যায় কোথায়, আপিস থেকে মেসো বাড়ি ফিরে দম ফেলতে না ফেলতে মাসি মারমূর্তি।—নিজে তো গোলাম হয়েইছে এখন সকলকে ধরে ধরে গোলামি না করাতে পারলে আর মুখ দেখবেন না। ব্যবসা করে ছেলেটা যা-হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, কোথায় উৎসাহ দেবে তা না, ছেলেটার বাড়ি আসা বন্ধ করেছে। এ-রকম লোকের নিজেরই মুখ দেখাতে লজ্জা করা উচিত, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অথচ, আপিসে বোনপোর একটা ভাল চাকরি হোক দু'দিন আগেও স্ত্রীটির সেই আগ্রহ তার থেকে একটুও কম ছিল না।

শঙ্করের হাতে টাকা দিয়ে জীবনে প্রথম মার খেয়েছিল মহাদেব সারাভাই মাস ছয়েক আগে। ভালো একটা ফাটকার টিপ আছে শুনে মাত্র চারশো টাকা দিয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা ছেলে হারিয়ে বসল। টাকার খাম কি করে নাকি পকেট থেকে পড়ে গেল জানে না। চারশো টাকা কি করে হারায় মহাদেব সারাভাইয়ের ধারণা নেই। টাকার খাম পকেট থেকে পড়ে গেলে জানতে পারে না কি করে তাও ভাবতে পারে না। বিশ্বাস করবে কি করবে না সেটা পরের কথা। নির্লিপ্ত মুখ করে যে-ভাবে চারশো টাকা খোয়ানোর খবরটা দিল, চার লক্ষ টাকা থাকলেও সে-রকম পারা যায় কিনা জানে না। শুনে তার রাগ করতেও ভুল হয়ে গেছে, মাথায় হাত দিতেও। হাঁ করে খানিকক্ষণ পর্যন্ত ওই মুখখানাই দেখতে হয়েছিল।

—কি বললি, চারশো টাকা হারিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, সতের ধাঁধায় থাকি, কখন যে···

—পকেট থেকে পড়ে গেছে?

—হ্যাঁ, কিছু ভেব না, চারশোর বদলে চৌদ্দশো পুরিয়ে দেব'খন শিগ্‌গীরই।

ব্যস, ওটুকুতেই সব আক্ষেপ সব খেদ শেষ ছোকরার।···চারশোর

বদলে হাজার টাকা অর্থাৎ ছাঁকা ছ'শো টাকা ঘরে তোলার লোভে টাকাটা বার করেছিল ভদ্রলোক।

শঙ্কর তখনো শেয়ার-বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে শুনেই খুশি হয়ে হাতে যা ছিল চাওয়ামাত্র দিয়েছিল। যে হারে টাকা ফিরবে বলে তাকে নিশ্চিন্ত করা হয়েছিল, সে-তুলনায় চারশো টাকার চারগুণ বেশি দেওয়ার লোভই হয়েছিল। স্ত্রী সদয় থাকলে হয়তো তার থেকেও বেশি দিত। কারণ তখন আর অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই। অনেকবারই দিয়েছে আর অনেকবারই তার অনেক বেশি ফিরেছে। কিন্তু স্ত্রীটি বাড়তি রোজগার হলে হাত বাড়িয়ে সেটা আদায় করে নিতে যেমন পটু, টাকা বার করে দেবার বেলায় তেমনি নির্মম। বিশেষ করে জুয়াখেলায় টাকা খাটানো হবে শুনলে। ফাটকা বাজারে টাকা খাটানো আর জুয়াখেলার মধ্যে একটুও তফাত দেখে না রমণীটি। তার ওপর বোনপো নিজের ব্যবসা নিয়ে সরে দাঁড়াতে এরই মধ্যে ভদ্রলোক নিজের বুদ্ধিতে ফাটকা-বাজী করে কিছু টাকা খুইয়েছে। সেই থেকে স্বামীর ওপর খড়গহস্ত মহিলা। তারপর থেকে টাকার কণ্ট্রোল গোটাগুটি তার হাতে। হাত-খরচের টাকাও সেই থেকে ভদ্রলোককে হাত পেতে স্ত্রীর হাত থেকে নিতে হয়।

এই দুরবস্থার সময় শঙ্কর এসে মেসোকে সরাসরি বলেছিল, দু'শো পাঁচশো যদি পারো চটপট বার করো, ভালো খবর আছে একটা— অন্যের লাভ যুগিয়েই গেলাম।

অনেক দিন বাদে ভদ্রলোকের নির্জীব রক্ত চনমনিয়ে উঠেছিল। কিন্তু হাত শূন্য। অতএব গেল বারের চারশো টাকা মেসো শঙ্করের হাতে দিয়েছিল অ্যাকাউণ্টস বিভাগ থেকে ধার করে। আর সেই টাকা খোয়া গেছে। পকেট থেকে চারশো টাকা গলে গেল আর লাটসাহেব তা টেরও পেল না। স্ত্রীর অগোচরে সে টাকা যে কি ভাবে শোধ হয়েছে, তা শুধু সে-ই জানে। শোধ করার পর মনে মনে স্থির করেছিল, এই ছোকরার সঙ্গে আর কোন দিন কোন সম্পর্কই রাখা চলবে না, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে থাক।

মাস ছয় বাদে সেদিন দুপুরে সম্পর্কচ্যুত এই শঙ্কর আবার এসে হাজির তার কাছে। বাড়িতে নয়, একেবারে তার অফিস-ঘরে।

এসেই মেসোর পাশে চেয়ার টেনে বসল। হাব-ভাবে কোন রকম সঙ্কোচের লেশমাত্র নেই, দুনিয়ায় যেন বিব্রত বোধ করার মতো কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি কখনো ঘটে নি। তাকে দেখে মহাদেব সারাভাই ছ'মাস আগের চারশো টাকা লোকসানের জ্বালাটা নতুন করে অনুভব করল। কাজের ফাইলে চোখ রেখে বক্রদৃষ্টিতে তাকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি খবর ?

ভণিতা বাদ দিয়ে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, মোটা কিছু টাকা রোজগার করার ইচ্ছে আছে ?

সঙ্গে সঙ্গে রাগে মুখ লাল মেসোর। ফিরে জিজ্ঞাসা করল, গেলবারের মতো ?

পকেট থেকে কিছু কাগজপত্র বার করে পরীক্ষা করতে করতে শঙ্কর জবাব দিল, পকেট থেকে সেবারে তোমার টাকার খামটা পড়েই গেল তার আর কি করা যাবে—তা সেটা ভুলতে ক'বছর লাগবে তোমার ? নিজের কাছে থাকলে কিছু না জানিয়ে ওটা দিয়েই দিতাম।

দেখা গেল তার এই কাগজপত্রের সঙ্গেও একশো টাকার তিনখানা নোট বেরিয়ে এসেছে। মেসো কাজ ভুলে আর বিগত টাকার শোক ভুলে রেগে গিয়ে বলে উঠল, এই টাকাও তো যাবে দেখছি, বাজে কাগজের সঙ্গে না মিশিয়ে টাকাটা আলাদা রাখা যায় না ? টাকার ওপর কোন দরদ আছে তোর !

কাগজে লেখা কি হিজিবিজি হিসেব দেখতে দেখতে শঙ্কর জবাব দিল, যাবে না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এটা একজনের কাছে চালান হয়ে যাবে। এই তিনশো টাকায় কম করে ছশো টাকা ঘরে আসবে—একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর। রোদে ঘোরাঘুরি করে আর পা চলছিল না। তোমার এখানে একটু বিশ্রাম করে আবার বেরুব।

মেসো মুখ গোঁজ করে বলল, তা বেরোও, কিন্তু তোমার হাতে

আর এক পয়সাও দিচ্ছি না আমি।

—দিও না। মুখে আগ্রহের চিহ্ন মাত্র নেই, হিসেবের ওপর চোখ—কিন্তু পরে যেন আবার বলো না আগে বললি না কেন। চা আনতে বলো।

বেল্ বাজিয়ে মেসো বেয়ারাকে চায়ের হুকুম করল। কিন্তু ভিতরটা উসখুস করছে কেমন। মুখ দেখে মনে হল না আর সাধবে বা কি ব্যাপার খোলসা করে বলবে। চারশো টাকা খুইয়েছে বলে, কিন্তু এ-যাবৎ দিয়েছে যা সেটা মনে পড়লে চেষ্টা করে রাগ করে থাকা যায় না। মেসো লক্ষ্য করছে ছোকরা মনোযোগ দিয়ে কি একটা অঙ্ক কষছে এখন। একশো টাকার নোট তিনখানা টেবিলের কাগজপত্রের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে তখনো। কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, ওই টাকা কার?

—আমার। যা ছিল কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে এসেছি।

—তুই নিজে ফাটকায় খাটাবি?

মুখ তুলে তাকানো বা ভালো করে বুঝিয়ে জবাব দেবারও ফুরসত নেই যেন।—হ্যাঁ, কপাল ভালো থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যে ওর ডবল ঘরে ফিরবে। তা না হলে পনেরো দিনের মধ্যে।

নিজের টাকা খাটাতে যাচ্ছে শুনে ভদ্রলোকের লোভ যত অস্বস্তিও ততো। জিজ্ঞাসা করল, ডবল না ফিরে উল্টে তোর এই সামান্য টাকা যদি সব যায়?

—যাবে না। গম্ভীর মুখে নিতান্ত আত্মীয় বলেই যেন আর একবার প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখার কথা বলাটা কর্তব্য বোধ করল। —যদি পারো হাজার দুই বার কর। যাবে মনে হলে নিজের যথাসর্বস্ব নিয়ে আমি মৌলা থেকে ছুটে আসি?

অকাট্য যুক্তি। ফলে দুর্বার প্রলোভন। কিন্তু দু'হাজার শুনে মেসোর চোখ কপালে। আবার দু'হাজার শুনেছে বলেই লোভটাও প্রবল। সে-রকম খবর কিছু না থাকলে দু'পাঁচ শো চাইত। বলল, দু'হাজার টাকা কোথায় পাব আমি। ব্যাঙ্কের পাস-বই তো তোর

মাসির হাতে।

শঙ্কর নির্লিপ্ত।—থাক তাহলে।

কিন্তু থাক বললেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। নিশ্চিত লাভের উৎসটা কোথায় সে সম্বন্ধে মেসো খোঁজ-খবর করতে লাগল। ফলে মেসোর প্যাড টেনে নিয়ে শঙ্কর হাতে-কলমে তাকে বোঝাতে বসল। গাছের ফলের মতো কোথায় কোন রহস্যের ডালে টাকা ঝুলছে, কাগজ-কলম হাতে পেলে শঙ্কর সেটা যত পরিষ্কার করে বোঝাতে পারে মুখে ততো না। মেসোর তখন মনে হয় এই কাগজ-কলম যেন ছেলেটার হাতে টাকার ফল পাবার একখানা আঁকশি।

কিন্তু বাধা পড়ল। এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে প্রায় চোখ রাঙিয়েই গেল মেসোকে। তার বক্তব্য ছ'দিন ধরে ওমুক দরকারী ফাইল আটকে বসে থাকলে কাজ চলে? তিন দিন ধরে ফাইল খুঁজে খুঁজে হয়রান সকলে, শেষে জানা গেল ফাইল এখানে ঘুমুচ্ছে।

অনুযোগ শুনে মেসোর বিড়ম্বিত মুখ। আমতা-আমতা করে আগন্তুককে নিশ্চিন্ত করতে চেষ্টা করল—পরদিনের মধ্যেই ফাইল পাঠাচ্ছে সে। একসঙ্গে অনেক ফাইল জমে গেছল বলে পেরে ওঠেনি।

লোকটি চলে যেতে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, তোমার অফিসার নাকি?

মেসো তেমন খেয়াল না করে জবাব দিল না, আমার আণ্ডারে কাজ করে। তারপর বলো—

আণ্ডারের লোকের দাপট দেখে মুচকি হেসে শঙ্কর আবার প্যাডের হিসেব বিশ্লেষণে মন দিল। লাভের রহস্যটা যখন প্রায় বেরিয়ে আসার মুখে ঠিক তক্ষুনি আবার ব্যাঘাত। ঘরের হাফ-দরজা ঠেলে আর একটি সুদর্শন মাঝবয়সী লোকের আবির্ভাব।

এসেই ভারিক্কি চালে বলল, আপনি কি অফিস লাটে তুলে দেবেন নাকি? একসঙ্গে চারজন ক্লার্ককে হুট করে ছুটি দিয়ে বসলেন, ডিপার্টমেণ্ট চালাবে কে?

বিব্রত মুখে মেসো কৈফিয়ত দিল, কেন, ওরা তো কাজ মোটামুটি

করে রেখে গেছে শুনলাম, তা ছাড়া খুব দরকার বলল যে—

ভদ্রলোকের মুখে এবং গলার স্বরেও রাজ্যের বিরক্তি।—দরকার তবে আর কি, গোটা অফিসটাই ক্লোজ্ করে দিন তাহলে। এক্ষুনি রিজার্ভের লোক পাঠিয়ে দিন, ছুটি যারা নেয় তারা কাজ সেরে রেখে ছুটি নেয় না।

লোকটি দরজা ঠেলে বেরিয়ে যেতে শঙ্কর আবার জিজ্ঞাসা করল, ইনি বুঝি তোমার অফিসার ?

মেসো বিরক্ত।—অফিসার হতে যাবে কেন, আমার আণ্ডারে ক্লিয়ারেন্স ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্জ—

শঙ্কর হেসে উঠল, বলল, সব থেকে নিচের কেরানী হওয়া উচিত ছিল তোমার। নিচের লোককে এই রকম আশকারা দাও তুমি! তোমার অধীনের লোকেরা ওপরওলার মতো এসে মেজাজ দেখিয়ে যায়, লজ্জাও করে না তোমার ?

ক্ষুব্ধ মুখে মেসো বলল, এই রকমই ইম্‌পার্টিনেণ্ট হয়েছে সব আজকাল। সেদিনের ছেলে সব, রাগ করলেও পরোয়া করতে চায় না, উল্টে তর্ক করতে আসে।

শঙ্কর অভিজ্ঞ ওপরওলার মতোই পরামর্শ দিল, দরজা ঠেলে হুট হুট করে এভাবে ঢুকতেই বা দাও কেন সকলকে, এই জন্যই তো এত প্রশ্রয় পায়! বেয়ারাকে দিয়ে খবর পাঠালে তবে ঢুকতে দেবে। তা না, যে খুশি এসে চোখ রাঙিয়ে যাচ্ছে।

মর্যাদা বজায় রাখার জন্য মেসো তক্ষুনি তার কথায় সায় দিয়ে বলল, সব ঢিট করে দেব একদিন—আমি রাগলে সাঙ্ঘাতিক অবস্থা। তারপর এদিকের কি ব্যাপার তুই বল্ ভালো করে।

ব্যাপার প্রায় শেষ করেই এনেছিল শঙ্কর সারাভাই। শেষ লাভের অঙ্কটা যা ছক কেটে দেখাতে বাকি। চৌকোস মাস্টারের সহজ করে দুরূহ আঁকের ফল দেখানোর মতো শঙ্কর তাও দেখিয়ে দিল। এটুকু শেষ হতে মহাদেব সারাভাই এক ধরনের যাতনা বোধ করতে লাগল যেন। লাভের যাতনা। বলল, কিন্তু টাকা পাই কোথায় ?

শঙ্কর চুপ। এ সমস্যায় সমাধান তার হাতে নেই। মেসো আর কোন পথ না পেয়ে শেষে তারই শরণাপন্ন যেন।—তুই-ই না হয় তোর মাসিকে যা-হোক কিছু বলে দেখ্ না চেক-বইটা বার করতে পারিস কি না। তোকে তো ছেলের মতোই দেখে, মাথা থেকে একটা কারণ-টারণ যদি বার করতে পারিস, দিলে দিতেও পারে। আমি বললে কানেও তুলবে না।

চেক-বই কি করে বার করা যায় সেই চিন্তা শঙ্কর সারাভাই করেই এসেছে। তবু ধীরে-সুস্থেই উপায় বাতলালো সে। বলল, এমনিতে চেক-বই চাইতে গেলে মাসি আমাকেও ছেড়ে কথা কইবে নাকি—সতের রকমের জেরা করে শেষে ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া করবে। …এক কাজ করা যায়, আমার ফ্যাক্টরির খুব একটা বড় অর্ডার পেয়েছি বলা যেতে পারে। মোটা টাকা লাভের আশা আছে জানিয়ে যদি তাকে বুঝিয়ে বলি দিন সাতেকের জন্য হাজার খানেক টাকা দরকার—পার্টির পেমেন্ট পেলেই টাকাটা দিয়ে দেব, আর লাভের অংশও দেব—তাহলে?

মেসোর চোখে-মুখে সমস্যা সমাধানের উদ্দীপনা। স্ত্রীর চোখে এত সহজে ধুলো দেবার রাস্তাও আছে কল্পনা করতে পারে নি। শুধু ধুলো দেওয়া নয়, একেবারে নিজেকে বাঁচিয়ে ধুলো দেওয়া। কিন্তু সমর্থনসূচক আনন্দটা ব্যক্ত করার মুখেই আবার বাধা। সামনের হাফ্-দরজার ওধারে দুটো পা দেখা গেল—দরজা ঠেলে কেউ প্রবেশোদ্যত। শঙ্করের আগের কথায় হোক বা টাকা পাওয়ার সম্ভাবনার গরমে হোক, মেসো দরজার দিকে চেয়ে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠল।—হু ইজ্ দেয়ার? সময় নেই অসময় নেই যতসব—বেয়ারা।

গর্জনটা যে এমন জোরালো হয়ে উঠবে শঙ্কর ছেড়ে মহাদেব সারাভাই নিজেও ভাবে নি বোধকরি। আচমকা হুঙ্কারে ঘরের বাতাসসুদ্ধ ভারি হয়ে গেল বুঝি। কিন্তু হাফ-দরজা খুলেই গেল তবু। আর ঘরে এসে যে দাঁড়াল তাকে দেখামাত্র ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল মেসো। তারপরেই বিবর্ণ পাণ্ডুর সমস্ত মুখ। কাঁপতে

কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দে বলতে চেষ্টা করল, সা-সা-সা—সার!

ঘরে ঢুকেছে চেম্বারের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর পাঠক। কিন্তু শঙ্কর তাকে চেনে না। মেসোর আর্ত মুখভাব দেখে সে-ও বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে রইল শুধু।

চন্দ্রশেখর পাঠক সামনে এগিয়ে এলো। মন্থর গতি। হাত দুটো প্যান্টের পকেটে। চোখের কোণ দিয়ে একবার সামনের লোককে অর্থাৎ শঙ্করকে দেখে নিল। তারপর টেবিলের এধারে মেসোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃদু গম্ভীর স্বরে বলল, এত গরম কিসের, ভেরি বিজ্‌ই?

আবারও শুধু সা-সা ভিন্ন আর কোনো আওয়াজ বেরুলো না মেসোর গলা দিয়ে। যাবার পথে অফিস-সংক্রান্ত কিছু একটা কাজের কথা বলার জন্যই ঘরে ঢুকে পড়েছিল চন্দ্রশেখর পাঠক। বাইরের লোক দেখে তা আর বলা গেল না। প্যান্টের হাত দুটো কোমরে উঠল, আবার ফিরে দেখলেন একবার। তবে উপস্থিতিতে এ-ভাবে চেয়ারে বসে থাকার লোক বেশি দেখে নি।—হু ইজ্‌ হি?

শঙ্করকে চেয়ারে আরাম করে বসে থাকতে দেখে মেসোর দ্বিগুণ অস্বস্তি। বলল, আমার···মানে আমার ওয়াইফের···মানে আমার শালীর ছেলে সার।

বলা বাহুল্য, শালীর ছেলে দেখে বড়কর্তা আদৌ মুগ্ধ হল না। উল্টে তার চোখ পড়ল প্যাডের হিজিবিজি ছক্‌টার ওপর—শেয়ারের দাম ফেলে আঁক কষে শঙ্কর যা এতক্ষণ ধরে বুঝিয়েছে মেসোকে। তুখোড় বুদ্ধিমান মানুষ বড়সাহেব, তার কেরামতিতে শেয়ার-বাজার ওঠে নামে—এক পলক তাকিয়েই কিছু যেন বুঝে নিল। মহাদেব সারাভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু অথচ বক্র শ্লেষে জিজ্ঞাসা করল, ডিড্‌ আই ডিসটার্ব ইউ?

মহাদেবের মুখ পাংশু, তার পিছনের একটা হাত ক্রমাগত শঙ্করকে ইশারা করছে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে। কিন্তু হাঁ করে শঙ্কর

অভিব্যক্তিসম্পন্ন আগন্তুকটিকেই দেখছে। আগন্তুক অফিসের হোমরা-চোমরা একজন বুঝেছে, কিন্তু কে-যে ঠিক ধরে উঠতে পারছে না। শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁট ঘষে মহাদেব সভয়ে জোরে জোরে মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ একটুও ডিসটার্ব করা হয় নি। বড়সাহেবের মেজাজ জানে, কাগজে কি হিসেব হচ্ছিল যদি আঁচ করে থাকে, অর্থাৎ কোন্ তন্ময়তা ভঙ্গের ফলে সুপারিনটেনডেণ্টের ক্ষণকাল আগের ওই গর্জন সেটা যদি টের পেয়ে থাকে, তাহলে মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়াও বিচিত্র নয়। বড়সাহেবের রোষাগ্নিতে সত্যি সত্যি কাউকে পড়তে হয় নি কিন্তু পড়লে কি হবে সেই-ত্রাসে শঙ্কিত সকলে।

বড়সাহেব আর এক নজর শঙ্করকে দেখে নেবার আগেই টেবিলের টেলিফোন বেজে উঠল। এই টেলিফোন যে মুশকিল আসান, জানে না। তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে মহাদেব শুকনো গলায় সাড়া দিল। পরক্ষণে শশব্যস্তে বড়সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিল ফোন।

—আপনার সার···

হাত বাড়িয়ে রিসিভার নিয়ে এবারে বড়সাহেব সাড়া দিল। পরক্ষণে দুই ভুরু কুঁচকে যেতে দেখা গেল তার। অপ্রত্যাশিত কিছু যেন শুনল। তারপরেই ব্যস্ত হয়ে ওধারের রমণীর উদ্দেশে বলল, আচ্ছা, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। রমণী · কারণ মহাদেব বামাকণ্ঠই শুনেছিল মনে হল। ঝপ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে দ্রুত ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল বড়সাহেব। শঙ্কর সারাভাইয়ের মনে হল, ভদ্রলোক যেন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে চলে গেল।

কিন্তু মহাদেব সারাভাইয়ের কিছুই লক্ষ্য করার ফুরসত হয় নি। ভালো করে কাঁপুনিই থামছে না তার। ঘামে সমস্ত মুখ ছেড়ে জামা পর্যন্ত ভিজে গেছে। বড়সাহেব ঘর ছেলে চলে যেতে আর তারপর তার ভারি পায়ের শব্দও নিঃসংশয়ে মিলিয়ে যেতে অবসন্নের মতো ধুপ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল। তার অবস্থা দেখে শঙ্কর কি করবে বা কি বলবে ভেবে না পেয়ে উঠে রেগুলেটার ঘুরিয়ে পাখার

স্পীড বাড়িয়ে দিল।

এই মুহূর্তে তার ওপরেই তিক্ত বিরক্ত মহাদেব সারাভাই। এই ছোঁড়া না এলে তো আজ এ-রকম বিভ্রাটে পড়তে হত না তাকে। আর এ-ভাবে তাতিয়ে না দিলে অমন স্বভাব-বিরুদ্ধ গর্জনও করে উঠত না। তারপরেও নবাবপুত্তুরের মতো চেয়ারে বসে থেকে এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যে কম নাজেহাল করেছে তাকে! মুখবিকৃত করে বলে উঠল, বড়সাহেবকে দেখেও চেয়ারটা ছেড়ে একবার উঠে দাঁড়ালি না পর্যন্ত, বোকার মতো হাঁ করে বসেই রইলি!

মেসোর অবস্থা দেখে সন্দেহ আগেই হয়েছিল, তবু খোদ বড় সাহেবই যে মেসোর ঘরে এসে হাজির হয়েছে সেটা ধরে নেওয়া কঠিন। নিঃসংশয় হওয়া গেল। নাম-ডাকের মতোই রাশভারী চাল-চলন বটে। তবু নির্লিপ্ত মুখেই জবাব দিল, কে তোমার বড়-সাহেব আর কে তোমার নিচের, কি করে বুঝব বলো—সকলেরই তো সমান হম্বি-তম্বি তোমার ওপর। ...যাকগে, কি আর হয়েছে।

—কি হয়েছে! যথার্থ অসহায় বোধ করছে মহাদেব সারাভাই, কাগজের এসব লেখা দেখে গেল না! আড়ে আড়ে ক'বার ও প্যাডটার দিকে তাকিয়েছে তুই লক্ষ্য করেছিস? কি মুশকিলেই যে ফেললি আমাকে—

কেউ দেখে গেল বলে নয়, মনে মনে অন্য কারণে শঙ্কা বোধ করছে শঙ্কর সারাভাই। তার আসার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে গেল কিনা বুঝছে না। আপাতত মেসোকেই আগে ঠাণ্ডা করা দরকার। বলল, দেখে গিয়ে থাকলে তোমাকে এরপর খাতিরই করবে দেখো, এ-সব ব্যাপারে তারও লক্ষ লক্ষ টাকা খাটছে।

বিস্ময় সত্ত্বেও একটু যেন জোর পেল মেসো। তারও লক্ষ লক্ষ টাকা খাটছে! এই সব ফাটকা-টাটকার ব্যাপারে? আঃ, এদিকে তাকা না! তোকে কে বলল?

এ লাইনে যারা ঘোরে সকলেই জানে, অম্লানবদনে মিথ্যার আশ্রয় নিল শঙ্কর, আজকের এই মওকার খবরও তার অজানা আছে

ভাবো নাকি! আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে না কেন, তোমার সামনেই জিজ্ঞাসা করতাম এই ডিল্‌টার প্রসপেক্ট কি-রকম।

যাক, মেসো অন্ধকারে যেন আলো দেখল একটু, মহাজনগত পন্থা অনুসরণের ব্যাপারটা ধরা যদি পড়েও থাকে—ফলাফল অকরুণ না হবারই কথা। বলল, যা হবার হয়েছে, এখন চল, দেখি কি করা যায়।

শঙ্কর সারাভাইয়ের ভিতরটা চঞ্চল হয়ে আছে। মেসোকে হাত করা গেছে যখন, মাসির কাছ থেকে টাকা বার করতে খুব বেগ পেতে হবে না হয়তো। নিঃসন্তান মাসি তাকে ভালইবাসে। তবু টাকা হাতে না আসা পর্যন্ত স্বস্তি বোধ করার কথা নয়। তা ছাড়া একটা নৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে বিলক্ষণ যুঝতে হয়েছে। যা বলা হবে সেটা সত্যি কথাই। কিন্তু মেসোর বেলায় গোটাগুটি মিথ্যের আশ্রয়ই নিতে হল তাকে। ...আশ্চর্য পরিস্থিতি, সত্যি যা মাসি তাই জানবে অথচ মেসো সেটা ছলনা ভাববে! ছলনা ভাববে বলেই সায় দেবে তার কথায়। সত্যি জানলে বাড়িতে ঢুকতে দিতে চাইত না।

কিন্তু এই অস্বস্তির ফাঁকে ফাঁকেও চেম্বারের বড়সাহেব চন্দ্রশেখর পাঠকের মুখখানা চোখে ভাসছে তার। ভদ্রলোককে দেখার ইচ্ছে ছিল, আজ দেখা হয়ে গেল। ব্যবসায়ী জীবনে তার একাগ্র নিষ্ঠা আর সহিষ্ণুতার গল্প কত শুনেছে ঠিক নেই। শঙ্করের মতো সংগ্রামী জীবন যাদের, তাদের চোখে বিরাট সফল মানুষ চন্দ্রশেখর পাঠক। নিজের চেষ্টায় এত বড় হয়েছে, নিজের বুদ্ধির বলে আজ দেশের একটা প্রধান শিল্পের উপর তার অপ্রতিহত প্রতাপ।

ভদ্রলোকের কীর্তির সব থেকে বড় নজির সম্ভবত বর্তমানের এই কট্‌ন্‌ চেম্বার। ভিন্ন নামে মিল-মালিকদের এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আরও আছে। কট্‌ন্‌ চেম্বারের পাশে সে-সব নিষ্প্রভ এখন। চন্দ্রশেখর পাঠক নিজে এই চেম্বারের স্রষ্টা, ফলে নিজেই সর্বেসর্বা। এখন সব থেকে বড় বড় মিলগুলো এই চেম্বারের আওতার মধ্যে এসে গেছে। নতুন মিল মালিকেরা স্বপ্ন দেখে কবে ওই চেম্বারের সভ্য হবে।

তাই চন্দ্রশেখর পাঠকের শুধু নিজের ব্যবসায় নয়, সমস্ত দেশের বস্ত্র-শিল্পের ব্যবসার নীতি এই চেম্বারের দখলে।

প্রতিষ্ঠানটিকে জনপ্রিয় করে তোলার ফন্দি-ফিকিরও ভদ্রলোক কম জানে না। এখানকার সমস্ত ব্যবসায়-মহলে সাড়া জাগিয়ে মহা সমারোহে চেম্বারের বাৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সেই অনুষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য যেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উৎসাহ উদ্দীপনা আর প্রেরণা যোগানো। কিন্তু আসলে এটাই বোধহয় চেম্বারের সব থেকে বড় প্রচারানুষ্ঠান। সেই প্রচারই বড় প্রচার যে দেশের সর্বসাধারণের চোখ টানে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের তৈরি সেরা কাপড়ের স্যাম্প্‌ল্‌ নিয়ে মস্ত এক-জিবিশন হয় প্রতিবার। সেই সব স্যাম্প্‌ল্‌ নিয়ে এক্সপার্টরা বিচারে বসে।—কার কাপড় সব থেকে ভালো। কাপড় বলতে সবই অবশ্য শাড়ি। পাড় নক্সা ফিনিশিং ইত্যাদির বিচারে যে শাড়ি প্রথম হবে, সেই শাড়ির নির্মাতার ভাগ্যে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার। এইভাবে জাঁকজমক করে আর মর্যাদা দিয়ে ছোট ব্যবসায়ীকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার প্রেরণা যুগিয়ে থাকে চেম্বার।

শঙ্কর সারাভাইয়ের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন, তার খেলনার মতো কাপড়ের ব্যবসাও একদিন মস্ত বড় হবে, এই সব মিল-মালিকদের মতো নিজস্ব মিল হবে তারও। শঙ্কর সারাভাইয়ের এমন অনেক নাম মুখস্থ, যারা তার মতোই নগণ্য ছিল একদিন—যারা ছোট থেকে বড় হয়েছে। ওই চন্দ্রশেখর পাঠকের জীবনেই কি কম ঝড়-ঝাপটা গেছে। অতএব একটা আশার আলো সামনে রেখেই এগোতে চেষ্টা করছে শঙ্কর। কিন্তু তার আশায় আলোটা জোনাকির আলো। ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে। এই আশা নিজের কাছেই শূন্যে প্রাসাদ গড়ে তোলার মতো অবাস্তব মনে হয় এক-একসময়। তবু এই আশা নিয়েই বেঁচে আছে। এটুকু আশা গেলে পায়ের নিচে মাটিও সরে যাবে জানে বলেই চোখ-কান বুজে একেই আঁকড়ে আছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কট্‌ন্‌ চেম্বারের এক লক্ষ টাকার প্রাইজের সিকেটা কোনদিন তার ভাগ্যে ছিঁড়বে এমন আশা সে কখনো করে

না। তার প্রথম কারণ, মৌলা থেকে ট্রেন ভাড়া গুণে এখানে এসে একজিবিশনের কাপড় সে প্রতিবারই পরখ করে দেখে থাকে। কোনো একটা কাপড়ও দৃষ্টি এড়ায় না, সব খুঁটিয়ে দেখে। এই সব কাপড় যারা পাঠায় তারা অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হলেও তার তুলনায় অনেক বড়। তাদের সরঞ্জাম আছে, যন্ত্রপাতি আছে। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কি থার্ডহ্যাণ্ডে কেনা শঙ্করের একটা মাত্র ছোট ভাঙা কল্ মাসে কম করে দশদিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। আর এটা-ওটা বদলে নিজের হাতে মেরামত করে যে কাপড় তৈরি হয় সেটার সাহায্যে, তার মান কোন্ স্তরের সেটা নিজেই সে খুব ভালো জানে। যে শস্তার কাপড় বা শাড়ি সে নিজের হাতে তৈরি করে, তার খদ্দের তারই মতো অবস্থার লোক। বিশ-ত্রিশখানা করে এই কাপড় তৈরি করার উপকরণও সব মাসে হাতে থাকে না। কাপড় ছেড়ে তখন শুধু গামছাই তৈরি করতে হয়। আর মেশিন বিগড়ালে তো তাও হয়ে গেল। অতএব, একজিবিশনে স্যাম্প্‌ল্ পাঠানোর চিন্তাটাই তার কাছে হাস্যকর।

কিন্তু পাঠাবার মতো হলেও শঙ্কর সারাভাই তা পাঠাত না নিশ্চয়। কারণ তার ধারণা, চেম্বারের বিচারকদের মান যাচাইয়ের পর্বটা প্রহসন মাত্র। এ যাবত অনেকবার সে একজিবিশনে গিয়ে স্বচক্ষে সব স্যাম্প্‌ল্ পরখ করে এসেছে। তার বিবেচনায় যে কাপড়ের পুরস্কার পাওয়া উচিত, তা একবারও পায়নি। অতএব তার বিশ্বাস ধরপাকড় তদ্‌বির-তদারক আর সুপারিশের জোর যার বেশি—পুরস্কার শুধু সে-ই পেয়ে থাকে। আর, চেম্বারের দিক থেকে ওই ঘটা করে পুরস্কার দেওয়ার একমাত্র লক্ষ্য শুধু যে আত্মপ্রচার, একজিবিশন এলাকার মধ্যে দাঁড়িয়েই সে অনেক সময় নির্দ্বিধায় সেই মতামত ব্যক্ত করেছে। সমস্ত কাগজে বড় বড় হরপে প্রতিষ্ঠানের উৎসবের বিজ্ঞপ্তি বেরোয়, অনুষ্ঠানের বিবরণ ছাপা হয় ক'দিন ধরে, পুরস্কার-সভার বড় বড় ছবি বেরোয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের প্রতি চেম্বারের দরদের কথা ফলাও করে লেখা হয়। এই প্রচার-গত সুনামের মূল্য এক লক্ষ টাকার পুরস্কার মূল্যের অনেক গুণ বেশি।

এই কারণেই শঙ্করের নিস্পৃহতা। কিন্তু তা হলেও প্রতিষ্ঠানের নিয়ামকটির অর্থাৎ চন্দ্রশেখর পাঠকের শক্তির বুদ্ধির আর বিচক্ষণতার প্রশংসা না করে পারে না সে। মানুষটি ব্যবসার ধারা আমূল বদলে দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর সামান্য অবস্থা থেকে শিল্পপতিদের মধ্যে ভদ্রলোক আজ সর্বাগ্রগণ্য যে তাতেও ভুল নেই। আজ তাকেই দেখল।

অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল শঙ্কর। সমস্ত পথ মেসো কি বলল আর কি উপদেশ দিল কানেও ঢোকেনি ভালো করে। মনটা মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিল। দুই একবার মনে হয়েছে, থাক্ কাজ নেই মাসির বাড়ি গিয়ে, মেসোকে যা-হোক দুই এক কথা বলে এখান থেকেই চলে গেলে হয়। কিন্তু অদৃশ্য একটা টানে এসেই গেল শেষ পর্যন্ত। মৌলার বাড়ি থেকে বেরুবারে আগে পর্যন্ত অনেক ভেবেছে, সমস্ত পথ ট্রেনে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে এসেছে। এখন ফেরাও শক্ত। না, ফিরতে সে চায় না। ফ্যাক্টরীর কথা মনে হলেই অটুট সঙ্কল্পে চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে যায় তার, এক-একটা সঙ্কটে সমস্ত নীতিবোধ আর বিবেকের যাতনা দু'হাতে ঠেলে সরিয়েই সে যেন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। ব্যবসাটা তার চোখে যেন বিকলাঙ্গ অপুষ্ট শিশু একটা। সরঞ্জাম যোগাতে পারলে আর পুষ্টির ব্যবস্থা করলে সেটা শক্ত সমর্থ পরিণত রূপ ফিরে পেতে পারে।

শঙ্কর সারাভাই কোনো ব্যবস্থাই করতে পারছে না। চোখের সামনে ওই শিশুর তিলে তিলে ক্ষয় দেখছে সে। এই পরিতাপের শেষ নেই। তাই আজ সে বিবেক নামে বস্তুটার একেবারে বিপরীত দিকে মুখ করে মৌলা থেকে রওনা হয়ে পড়েছে।

তাকে দেখামাত্র মাসি অনুযোগ করল একপ্রস্থ। দু'মাসের মধ্যে দেখা নেই এমন আপনার জন এলেই বা কি না এলেই বা কি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষে বোনপোর প্রস্তাব শুনে মাসির দু' চোখ কপালে। এক

হাজার টাকা চাই! এ আবার কি সাঙ্ঘাতিক কথা! এক হাজার টাকা কি দুই একশ টাকা নাকি সে চাইলেই বার করে দিতে পারবে!

মাসি মহিলাটি বাইরে রুক্ষ ভিতরে নরম। একটা ব্যাপারে তার খটকা লাগতে পারত, কিন্তু লাগল না। বোনপো সাধারণত টাকা গয়না চাইতে হলে মেসোর আড়ালে চায়। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে দু'জনে একসঙ্গে এসেছে আর হাজার টাকা চাওয়া সত্ত্বেও ঘরের লোকটার মুখ বিকৃত হল না। টাকার অঙ্কটা বড় বলে মাসির নিজেরও একটু ধাক্কা লেগে থাকবে হয়তো, তাই মেসো মুখ ভার বা মনোভাবের প্রতি তক্ষুনি সচেতন হতে পারেনি। শঙ্কর বলল, টাকা না দিলে এবারে মরেই যাব মাসি—মস্ত একটা বায়না নিয়েছি, কাজ শেষ হলেই এই প্রথম মোটা কিছু ঘরে আসবে—ব্যবসা দাঁড় করানোর ধকলও কিছুটা সামলে যেতে পারব হয়তো। মাত্র সাত দিনের মতো চাই, লাভের চার আনা অংশও না হয় আসলের সঙ্গে ফেরত দিয়ে যাব—কিন্তু টাকাটা না দিলেই নয়।

মাসি তক্ষুনি রেগে গিয়ে জবাব দিল, তোর লাভের টাকা তুইই ধুয়ে জল খাস, আমাকে আর লোভ দেখাতে হবে না। কিন্তু আমি টাকা পাব কোথায়, বড় জোর পঞ্চাশ ষাট টাকা দিতে পারি।

মাসির মনে মনে ধারণা এই করে বড় জোর একশ টাকার মধ্যে রফা করে ফেলবে। কিন্তু ধারণাটা গণ্ডগোলের দিকে টেনে নিয়ে গেল ঘরের লোকটাই।

ঈষৎ সহানুভূতির সুরে মহাদেব বলল, মুশকিল হয়েছে এটাকে এক রকমের বিপদও বলা যেতে পারে আবার সুদিনের আশাও বলা যেতে পারে। অর্ডার ক্যানসেল করতে হলে বিপদ, সাপ্লাই করতে পারলে আশা।…দিন রাত ফ্যাক্টরীটাকে নিয়ে এত খাটছে এত পরিশ্রম করছে, হাজার খানেক টাকায় দিন যদি ফেরে…দিলে হত।

এবারে অবশ্য একটু অবাক হবারই পালা মাসির। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা উল্টো ধারণাও জন্মালো আবার। হাজার টাকারই দরকার তাহলে, আর সেটা এমনই দরকার যে ঘরের লোক পর্যন্ত সদয়।

বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে মহিলা বলে উঠল, কিন্তু অত টাকা আমি পাব কোথায়, ঘরে থাকে নাকি?

মাথা চুলকে মেসো জবাব দিল, তাই তো ঘরে আর এত টাকা কোথায়।

চকিত ইশারাটা শঙ্করের বুঝে নিতে একটুও বেগ পেতে হল না। বলল, ঠিক আছে, মেসো চেক্ দিক একটা, কাল প্রথম দিকেই ভাঙিয়ে নিয়ে কাজ সারব।

মাসি কিছু বলার আগে মেসো মন্তব্য করল, তাতে যদি হয় তোর সে ব্যবস্থা অবশ্য করা যেতে পারে নইলে ঘরে কার আর অত টাকা মজুত থাকে···।

মেসোর এত উদারতায় পাছে মাসির সন্দেহ হয় সেই ভয়ে শঙ্কর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ঠিক আছে। এবার আমাকে শিগগীর কিছু খেতে দাও মাসি, সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কিছু খাওয়াই হয় নি।

॥ ছয় ॥

এক হাজার টাকা মাসি ঘরের বাক্স থেকেই বার করতে পেরেছিল। বলেছে, কুড়িয়ে বাড়িয়ে হয়ে গেল দেখছি, আবার ব্যাঙ্কে যাবি, চেক্ ভাঙাবি—তোর সুবিধেই হল।

সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে মেসো বার পাঁচেক তাকে সাবধান করেছে আবার যেন টাকাটা খোয়া না যায়। কোথায় কোন্ পকেটে রাখল, অন্য কাগজ-পত্রের সঙ্গে মিশে গেল কিনা দেখে নিয়ে আর এগিয়ে দিতে এসে শেষ বারের মতো আরো বার দুই সতর্ক করে তবে ভদ্রলোক ছেড়েছে তাকে।

আবারও মনটা খিঁচড়ে গেছে শঙ্কর সারাভাইয়ের। টাকাটা মেসোর পকেটে গুঁজে দিয়ে পালাতে ইচ্ছে করেছে। না পেরে নিজের ওপরেই দ্বিগুণ আক্রোশে জ্বলছে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়েছে তার। ফ্যাক্টরী বাঁচানো নিজে বাঁচার সামিল। ওটার সঙ্গে তার

সত্তার যোগ। সে শেষ দেখবে। শেষ দেখার আগে এই যোগ ছিঁড়তে দেবে না।

কি-কি চাই তার লম্বা লিস্ট একটা করাই ছিল। নগদ টাকা ফেললে মাল তুলতে কতক্ষণ আর। মস্ত একটা সুতোর মোট আর অন্যান্য বহু টুকিটাকি উপকরণের তেমনি বড়সড় একটা বোঁচকা নিয়ে প্রায় গলদঘর্ম হয়ে স্টেশনের বাসে উঠল শঙ্কর সারাভাই।

ওঠার মুখেই ছোটখাট অপ্রিয় ব্যাপার ঘটে গেল একটা। সেদিনের অর্থাৎ কুড়ি বছর আগের পাবলিক বাসের অবস্থা আজকের মতো ছিল না। লোক গুণে তোলা হত না। ঠাসাঠাসি ভিড় হত, যার শরীরের তাগত বেশি সে-ই উঠে পড়ত। আর স্টেশনের বাসে ভিড় তো লেগেই আছে।

পর পর দুখানা বাস ছাড়তে হয়েছে। সঙ্গের মোট দেখে ড্রাইভার বাধা দিয়েছে। তা'ছাড়া ভিড়ও খুবই বেশি ছিল। মেজাজ এমনিতেই বিগড়ে ছিল শঙ্কর সারাভাইয়ের। মাসির হাত থেকে টাকা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা সেই যে তেতে আছে এখনো ঠাণ্ডা হয়নি। ফাঁক পেলেই ভিতর থেকে কে যেন চোখ রাঙাচ্ছে এ-রকম মিথ্যা আর ভাঁওতাবাজির ওপর ক'দিন চলবে? পরক্ষণে নিজের ওপরে দ্বিগুণ বিরক্ত, মাসির কাছে তো একেবারে মিথ্যে বলতে হয়নি, আধা-সত্যি যা তাই জেনেছে মাসি। টাকা ব্যবসার জন্যেই নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে টাকা ফেরত দেওয়া যে সম্ভব হবে না সেটা শঙ্করের থেকে বেশি আর কে জানে? তা'ছাড়া শিগগীর আর এই শহরে আসা হবে না। এলেও মেসোর কাছ থেকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। মাসিকে অবশ্য মেসো কখনোই বলতে পারবে না কোন্ মতলবে সে-ও দরাজ মুখে টাকা বার করে দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। ফলে বাড়িতে অন্তত মেসো প্রকাশ্যে রাগারাগিও করতে পারবে না। কিন্তু মনে মনে তাকে ভস্ম করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। টাকা হাতে এলে বা দিন ফিরলে মেসোর টাকা সে কড়ায়-ক্রান্তিতে শোধ করে দেবে কেবল একটু সময় চাই। আবার

এ-ও মনে হল, তেমন দিন কোনোদিন আসবে এমন ভরসা শঙ্কর সারাভাই করে কি করে ?

এর ওপর দু'দুটো বাস ছাড়তে হওয়ায় মেজাজ আরো গনগনে হয়ে আছে। ওপরওয়ালার কিছু চক্রান্ত ছিল বলেই শঙ্কর সারাভাই তৃতীয় বাসখানায় উঠতে পারল।

বাস-কণ্ডাক্টর বাধা দেবার অবকাশ পেল না। পেল না বলেই তার রাগ। ভিড়ের মধ্যে মাল নিয়ে ওঠার জন্য গজগজ করতে লাগল। তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে শঙ্কর সারাভাই যতটা সম্ভব ভিতরে সেঁধিয়ে যেতে চেষ্টা করল। তাতে লোকের অসুবিধে হল বটে কিন্তু নিজে সুফল পেল। ঠিক সামনের সীটটির থেকেই একজন উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে একে-ওকে ঠেলে শঙ্কর সারাভাই সে জায়গাটি দখল করল।

ঘেমে নেয়ে গেছে। ঘাম মুছে ঠাণ্ডা হতে না হতে কণ্ডাক্টর টিকিটের জন্য হাত বাড়াল। তারপরেই তুমুল বচসা।

কণ্ডাক্টর মালের জন্য দু'খানা বাড়তি টিকিট নেবে, শঙ্কর সারাভাই একটার বেশি বাড়তি টিকিট করবে না।

কণ্ডাক্টর না-ছোড়, মালের জন্য দুটো টিকিট কাটতে হবে। শঙ্কর সারাভাই তিরিক্ষি মেজাজে প্রতিবাদ করল, কেন, দুটো টিকিট কাটব কেন ?

তা'হলে নেমে যান।

কি ? আবদার নাকি ? একটা মাল তো বেঞ্চির তলায় ঢুকিয়েছি—একটা টিকিট নিচ্ছি এই বেশি।

ঝগড়া বেধে গেল। কণ্ডাক্টরও ছাড়বে না, সে-ও দেবে না। যাত্রীরা অনেকে বিরক্ত, অনেকে দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। বচসাটা একজনের মুখ থেকে আর একজন লুফে লুফে নিতে আরম্ভ করল। এদিকে পাশের লেডীস সীটে বসে কোনো সুদর্শনা রমণী যে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে দুনিয়ার তাজ্জব কাণ্ড দেখছে কিছু—শঙ্কর অন্তত তা আদৌ লক্ষ্য করেনি। দশ পয়সার একটা টিকিটের জন্য

যে জগতে এ-রকম কাণ্ড হয় বা হওয়া সম্ভব, মেয়েটির ধারণা নেই।

ওপরওয়ালার চক্রান্ত জটিল বলেই বাসের এই মেয়ে যশোমতী পাঠক। জীবনে এই প্রথম সে বাসে উঠেছে। ওঠার পর থেকে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম। ঠাসাঠাসি ভিড়। ওপরের রড থেকে হাত ফসকালে একসঙ্গে পাঁচ সাতটা লোক তার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া বিচিত্র নয়। উঠেই ভেবেছিল নেমে গিয়ে ট্যাক্সি করলে হয়। এ-ভাবে মানুষ যায় সেটা আগে সে চোখে হয়তো দেখেছে, কষ্টটা অনুভব করেনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেন চোখ রাঙালো তাকে। সে মাটির ওপর দিয়ে চলবে বলেই বেরিয়েছে। মাটির ওপর দিয়ে হাঁটবে বলেই বাবার আভিজাত্যের শো-কেস থেকে বেরিয়ে এসেছে। না, আরামের প্রশ্রয় দেবে না, এত লোক যাচ্ছে কি করে!

কিন্তু দশ পয়সার বাড়তি টিকিটের এই নাটকটা ভয়ানক বিস্ময়কর মনে হল তার। স্থান-কাল ভুলে সামনে উপবিষ্ট লোকটাকেই হাঁ করে দেখছে সে। দশটা পয়সার জন্য একজন এ-রকম করছে বলে সঙ্কোচ যেন তারই। দেখল লোকটারই জিত হল, বাড়তি দশটা পয়সা শেষ পর্যন্ত দিলই না। কণ্ডাক্টর হাল ছাড়ল বটে, কিন্তু তার মুখ রাগে কালো।

কণ্ডাক্টরকে ছেড়ে যশোমতী সামনের বিজেতা মূর্তিটি নিরীক্ষণ করতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর প্রচণ্ড ধাক্কা। আচমকা একটা সঙ্কট বুঝি গ্রাস করতে আসছে তাকে। লোকটার মুখের সামনে খবরের কাগজ—বাস চলার বাতাসে কাগজের একটা কোণ উড়তে ভিতরের পাতাটা দেখা যাচ্ছে। বার বার দেখা যাচ্ছে। সেই পাতায় কি দেখল যশোমতী পাঠক?...একবার...তু-বার...তিন বার দেখা গেল ভিতরের ছবিটা। নিজের ছবি নিজের কাছে এমন বিপদের কারণ হতে পারে সে-কি কল্পনা করাও সম্ভব? কাগজের তলার কোণটা বাতাসে ওপরের দিকে উঠলেই ছবিটা দেখা যাচ্ছে—তারই ফোটো।

যশোমতী কি যে করবে ভেবে পেল না। মুখ লাল, কান গরম,

দম বন্ধ করে ছটফট করতে লাগল সে। ধরা বুঝি পড়েই গেল। এই মুহূর্তে দুনিয়ায় ওই কাগজটা ভিন্ন আর বুঝি কোনো সমস্যা নেই তার সামনে। ইচ্ছে করল লোকটার হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

টিকিট ?

যশোমতী চমকে উঠে আত্মস্থ হল। তারই টিকিট চাইছে কণ্ডাক্টর। এতক্ষণ ভিড় ঠেলে আসতে পারেনি বলে টিকিট হয়নি। তাড়াতাড়ি পাশের বড় শৌখিন ব্যাগটার উদ্দেশে হাত বাড়ালো যশোমতী। কিন্তু হাতে কিছু না ঠেকতে সবিস্ময়ে পাশের দিকে মুখ ফেরালো।

ব্যাগ নেই।

যশোমতী প্রথমে বিমূঢ়, তারপর রাজ্যের বিস্ময়। সে ঠিক দেখছে কিনা বা ম্যাজিক দেখছে কিনা, বুঝছে না। পাশে ব্যাগ রেখে সে নিশ্চিন্ত মনে এই অভিনব গণ-যাত্রার কষ্ট আর রোমাঞ্চ অনুভব করছিল। তারপর সামনের লোকটার এই দশ পয়সার ঝগড়া দেখতে দেখতে কিছুই আর খেয়াল ছিল না। আর তারপর ওই ছবির ধাক্কা। পাতা ওল্টালে যে ছবি চোখে পড়বেই, আর তারপর···ধরণী দ্বিধা হও···

টিকিট? বিরক্ত কণ্ডাক্টর দ্বিতীয়বার তাড়া দিল।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙেছে যশোমতীর। এ-দিক ও-দিক আর বেঞ্চির নিচেটা দেখল একবার। নেই। নেই কেন তখনো মাথায় আসছে না। তখনো বুঝতে পারছে না পাশ থেকে ব্যাগটা কোথায় উড়ে যেতে পারে। যশোমতী জেগে আছে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেবল বিপদের স্বপ্ন দেখছে!

সুদর্শনা রমণীর মুখের এই বিমূঢ় সঙ্কট-কারু অনেকেই লক্ষ্য করল। চোখ পড়লে চোখ ফেরানো শক্ত। যেন চাপ রক্ত এসে জমছে মুখে। কিছু একটা হয়েছে সেটা অন্তত বোঝা গেল। একজন যাত্রী জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

আমার ব্যাগটা··· !

কোথায় ছিল ? কোথায় ছিল ? কি ব্যাগ ? কেমন ব্যাগ ? অনেকে মুখর, অনেকে উৎসুক ।

যশোমতী পাশের চার আঙুল শূন্য জায়গাটার দিকে অসহায় চোখে তাকালো শুধু ।

কতবড় ব্যাগ ? এই ভিড়ে ব্যাগ কেউ পাশে রাখে ! এক মুখেই কৌতূহল আর উপদেশ ।

আর একজন মন্তব্য করল, নিয়ে সরে পড়েছে কেউ, উপকার করেছে—

অন্য একজনের মন্তব্যে প্রচ্ছন্ন সংশয়, ব্যাগ সত্যি সত্যি ছিল তো, না উনি আনতে ভুলে গেছেন ?···হাতের ওপর থেকে ব্যাগ টেনে নিলে টের না পাবার কথা নয় । এক কথায়, ব্যাগ হারানোটা অজু-হাত কিনা এও বিবেচনার বিষয় ।

যশোমতী জবাব দেবে কি, সে অকূলে পড়েছে । সমস্ত মুখ ঘেমে লাল । অসহায় দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাকাতেই চোখাচোখি হল যার সঙ্গে, সে শঙ্কর সারাভাই । মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে সে ঘটনাটা বুঝতে চেষ্টা করছে ।

এই মুহূর্তে ভিতরের পাতার ছবি চোখে পড়ার সঙ্কট থেকে যশোমতী বাঁচল বটে, কিন্তু তপ্ত কড়া থেকে জ্বলন্ত আগুনে পড়ার মতো অবস্থা তার ।

কণ্ডাক্টরের মেজাজ এখনো প্রসন্ন হয়নি, তাছাড়া পথে-ঘাটে এ-রকম অনেক আধুনিকার চাল-চলন তার জানা আছে । পয়সা ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে অতি আধুনিকারা ছেলেদের থেকে কোনো অংশে কম যায় না বলেই তার ধারণা ।

সুন্দর মুখ দেখে সে ভুলল না, গম্ভীর মুখে বলল, তাহলে নেক্সট্ স্টপে নেমে যান ।

অমনি শঙ্কর সারাভাইয়ের পুরুষকার চাড়িয়ে উঠল । কণ্ডাক্টরের অকরুণ উক্তি বরদাস্ত করা সম্ভব হল না । প্রতিবাদ করল,

ব্যাগ চুরি গেছে মহিলার, এ-ভাবে বলার অর্থ কি ?

কণ্ডাক্টর তার দিকে ফিরল, গম্ভীর মুখে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, ব্যাগ চুরি গেছে আপনি দেখেছেন ?

—আমি দেখব মানে ! দেখলে চুরি যাবে কেন ?

—তাহলে চুপ করে থাকুন।

—কেন চুপ করে থাকব, শঙ্কর সারাভাই গর্জন করে উঠল, একজন মহিলার ব্যাগ চুরি গেছে শুনেও তুমি এ-ভাবে কথা বলবে কেন ? ভদ্রতাজ্ঞান নেই ?

ব্যস, দ্বিতীয় প্রস্থ শুরু হল। যশোমতী পাঠক নির্বাক দর্শক। ভিড়ের ওধার থেকে একজন টিপ্পনী কাটল, একটু আগে তো নিজের স্বার্থে দিব্বি এক-প্রস্থ লড়েছেন। এখন কণ্ডাক্টর তার ডিউটি করছে তার মধ্যেও আপনার অত শিভালরি দেখাবার কি হল মশাই ?

মুখ আড়াল করে ওধার থেকে আর একজন প্রায় অভব্য টীকা ছুঁড়ল, আ-হা, আপনারই বা কি কাণ্ডজ্ঞান মশাই, শিভালরি দেখাবার মতো সীচুয়েশন যে !

রাগে শঙ্কর সারাভাই ভিড়ের মধ্য থেকে বক্তা দুটিকে তক্ষুনি আহ্বান জানালো, কারা বলছেন এদিকে এগিয়ে আসুন মশাই সাহস করে, আড়াল থেকে কেন—

বাসের কোন কোন ভদ্রলোক রমণীর প্রতি অনুকম্প বশত ছি-ছিও করে উঠল। যশোমতীর সমস্ত মুখ টকটকে লাল। খানিক আগের বচসার পর এই লোকটাই অর্থাৎ শঙ্কর সারাভাই আবার বিনা টিকিটের যাত্রিণীর পক্ষ নিয়েছে বলেই হয়তো কণ্ডাক্টরের গোঁ চাপল। বলে উঠল, আমার ডিউটি পয়সা আদায় করা, টিকিট চেয়েছি তার মধ্যে অত কথার দরকার কি ? ব্যাগ হারিয়েছে বলে আপনার অত দরদ হয়ে থাকে তো আপনিই দিয়ে দিন না ভাড়াটা—টার্মিনাস পর্যন্ত দশটা পয়সা তো ভাড়া এখান থেকে !

—আমি দিয়ে দেব ! পয়সা দেবার নামেই শঙ্কর সারাভাইয়ের গলা শমে নেমে এল।—বা রে, ভদ্রমহিলা হঠাৎ বিপদে পড়েছেন তাই

বলছিলাম, আমি—আমি দিতে যাব কেন ?

কণ্ডাক্টর বলল, তাহলে আর বেশি সহানুভূতি না দেখিয়ে চুপ করে বসে থাকুন।

ওদিক থেকে রসালো উক্তি, দিয়েই ফেলুন দাদা—দশ পয়সায় হীরো হবার মওকা ছাড়বেন না।

আবার হাসির রোল, আবারও ভদ্রলোকদের কারো কারো ছি-ছি। বাসটা থামলে যশোমতী নেমে পড়ে বাঁচত। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে সামনের লোকটার কি হল কে জানে। শঙ্কর সারাভাই মুহূর্ত থমকালো মুখের দিকে চেয়ে। ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, একটা হাত আপনা থেকেই নিজের পকেটে গিয়ে ঢুকল, তারপর পকেট থেকে ব্যাগ বার ক'রে দশটা পয়সা কণ্ডাক্টরকে দিয়ে বলল, একটু ভদ্রতা শিখতে চেষ্টা করো ? বুঝলে কণ্ডাক্টরের কাজ আর কশাইয়ের কাজ এক জিনিস নয়—এই নাও তোমার টিকিটের দাম।

স্বাস্থ্যের দিকে চেয়েই হোক বা যে কারণেই হোক, কণ্ডাক্টর বিনাবাক্যে টিকিট কেটে সেটা শঙ্করেরই হাতে দিল।

—এই নিন। টিকিটটা যশোমতীর দিকে বাড়িয়ে চাপা রুক্ষ মেজাজে শঙ্কর বলল, বাসে উঠলে ব্যাগ খোয়া যায়, পথে-ঘাটে একা বেরোন কেন আপনারা!

আর মনে মনে বলল, দশ-দশটা পয়সা গচ্চা, কি কুক্ষণে মুখ খুলতে গেছলাম—

যশোমতীর মনে হল, তার বাবার মতোই কেউ যেন আবার একপ্রস্থ বিদ্রূপ করল। রাগ হচ্ছে, আবার অসহায়ও বোধ করছে। টিকিটটা লোকটার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে নেমে গেলে হয়। কিন্তু নেমে যাবে কোথায় ? হঠাৎ বুঝি দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে। পরক্ষণে বিরক্তমুখ লোকটা আবার কাগজে মন দিতে যাচ্ছে দেখে ত্রাসে চমকে উঠল। কোন্ দিক সামলাবে যশোমতী ?

নষ্ট করার মতো সময় নেই, ফোটো চোখে পড়লেই হয়েছে। কি মনে পড়তে তাড়াতাড়ি টিকিটটা আবার তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে

মনোযোগ আকর্ষণ করল, এতে আপনারা ঠিকানাটা লিখে দিন দয়া করে।

কেন?

কেন বুঝতে পারছেন না? দু'চোখ একটু বেশি স্পষ্ট করেই তার মুখের উপর তুলে ধরল।

পয়সা ফেরত দেবেন? বাসের মধ্যে আমি কলম নিয়ে বসে আছি?

বিরক্ত মুখেই অন্য দিকে ফিরল শঙ্কর সারাভাই। এদিকে বাসের মধ্যে আবার একটা লঘু রসের সূচনা হতে যাচ্ছে দেখে যশোমতী চুপ করে গেল। কিন্তু যেটুকু হল, তাতেই লোকটার কাগজের প্রতি মনোযোগ কমেছে মনে হল। উসখুস দৃষ্টিটা দুই-একবার ফিরল এদিকে। সদ্য-সঙ্কটে এর থেকে বেশি আর কিছু কাম্য নয়, তাই দুই একবার পাল্টা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পুরুষের রূঢ়তায় অপমানিত বোধ করার মতোই মুখ করে বসে রইল যশোমতী।

স্টেশন।

মোটের বোঝা নিয়ে লোকটা নামল। পিছনে যশোমতী। স্টেশনে যাবে বলেই বাসে উঠেছিল সে-ও। তারপর কোথায় যাবে ঠিক করেনি। সবার আগে এই জায়গাটাই ছাড়তে চেয়েছিল সে। সবার আগে বাবার কাছ থেকে দূরে সরতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে দূর-পাল্লার যে-কোনো একটা ট্রেনে উঠে পড়বে, তারপর বেশি রাতে যে-কোনো একটা স্টেশনে নামবে। তারপর যা হয় হবে।

কিন্তু মাথায় আকাশ ভেঙেছে এখন। ব্যাগ চুরি যাবার দরুন নিজের ওপরেই ভয়ানক রাগ হচ্ছে তার। সকলের ওপর রাগ হচ্ছে। এমন কি ওপরওয়ালার ওপরেও। তাকে জব্দ করার জন্যই এ যেন চক্রান্ত একটা। জব্দ কি সোজা জব্দ! পঙ্গু অবস্থা। যশোমতী কি করবে এখন? ওই রকম চিঠি লিখে কাল বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, আর আজ নিজেই ফিরে যাবে? বাবা কিছু বলবে না, কিন্তু মনে মনে হাসবে। প্রাণ খুলে হাসবে। সে-হাসি যশোমতী

যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। মেয়েরা কত অসহায় আর কত অপদার্থ, সেই নজিরই পাকা-পোক্ত হয়ে থাকবে বাবার মনে। দুনিয়া দেখতে বেরিয়ে একদিনেই এ-রকম নাজেহাল হয়ে ফিরে যাবে? আভিজাত্যের শো-কেস্ই যে তাদের উপযুক্ত জায়গা, ফিরে গিয়ে এটাই ঘটা করে প্রমাণ করবে?

তার থেকে মরে যাওয়া ভাল। রাগে দুঃখে ক্ষোভে মরে যেতেই ইচ্ছে করছে যশোমতীর। কিছুটা নিজের গোচরে কিছুটা বা অগোচরে স্টেশনেই এসে দাঁড়াল সে। আর সেই মুহূর্তেই স্থির করল নিজে থেকে সে কিছুতে বাড়ি ফিরবে না, এর থেকে বাবার তল্লাসীর জালে ধরা পড়ে বাড়ি ফেরা ভাল। কাগজে ছবি তো ছাপিয়েইছে আরো কতভাবে খোঁজাখুঁজি চলেছে কে জানে। ধরা পড়েই যদি তাতে সম্মানটা অন্তত বাঁচবে। কেউ বলবে না অযোগ্য বলে ফিরে এলো। বাবা রাগ করতে পারে, হাসবে না।

আর ধরা যদি না পড়ে, যা কপালে থাকে হবে। গায়ে যা গয়না আছে তারও দাম নেহাত কম হবে না। অবশ্য বেশি ভারী গয়না সে পরে না। তবু হাতের হীরে-বসানো বালা দুটোর দামই তো যা খোয়া গেছে তার থেকে ঢের বেশি। তার ওপর হার আছে, দুল আছে—আঙুলে মুক্তোর আংটি আর কব্জিতে দামী ঘড়িও আছে। দেখা যাক—

সামনেই সেই লোকটা। অর্থাৎ সারাভাই। মোটগুলো রেখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কুলি আসতে মুখ ঘুরিয়ে নিল, অর্থাৎ দরকার নেই। তখনই তাকে যশোমতী দেখল। দেখল শঙ্কর সারাভাইও। একটু লক্ষ্য করেই দেখল যেন।

আপনি কি এই মৌলা প্যাসেঞ্জারে যাবেন?

জায়গার নাম অথবা গাড়ির নাম জীবনে এই প্রথম শুনল যশোমতী। কিন্তু ভাবার সময় নেই, মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাই যাবে।

এই মালগুলো দু'মিনিট দেখবেন দয়া করে, আমি টিকিটটা কেটে

নিয়ে আসি, যাব আর আসব।

বাসের টিকিট কেটে দিয়েছে যখন, এটুকু উপকার দাবি করতে তার দ্বিধা নেই। যশোমতী মাথা নাড়ল। দেখবে।

শঙ্কর সারাভাই হনহন করে চলে গেল। কিন্তু কাউণ্টারে ভিড়, ফিরতে দেরিই হল একটু। ঘেমে সারা। ব্যস্তসমস্ত হয়ে মোটগুলো তুলতে তুলতে বলল, ভিড়ের ঠেলায় প্রাণান্ত, তার ওপর নড়তে চড়তে দিন কাবার। গাড়ি ছাড়তে আর খুব বেশি দেরি নেই—

বড় মালটা এক হাতে নিল, অন্য সব ক'টা মাল অপর হাতের আয়ত্তে আনতে একটু অসুবিধেই হচ্ছিল। যশোমতী তাড়াতাড়ি মাঝারি সাইজের ঝোলাটা তুলে নিয়ে বলল, সব একলা পারবেন কেন, এটা আমি নিচ্ছি—চলুন!

এই সৌজন্যটুকু প্রত্যাশিত নয়। শঙ্কর সারাভাই থমকে মুখের দিকে তাকালো একটু, তারপর এগিয়ে চলল। এও বাসের টিকিট কাটার প্রতিদান ধরে নিল সে।

খানিকটা এগিয়ে আসার পর কি মনে পড়তে ফিরে তাকালো আবার। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোন্ ক্লাসে যাবেন?

যশোমতীর ভাবতে সময় লাগল না একটুও, এত মোট নিয়ে একটা কুলি পর্যন্ত করল না যে, সে কোন্ ক্লাসে যাবে জানা কথাই। মোটের জন্য বাসের একটা বাড়তি টিকিট কাটা নিয়ে কণ্ডাক্টরের সঙ্গে ঝগড়াও এরই মধ্যে ভোলবার নয়।

থার্ড ক্লাস—

লোকটা নিশ্চিন্ত হল যেন একটু। মনে মনে হাসিই পাচ্ছে যশোমতীর। জীবনে দুর্ভাবনা করার অবকাশ এ পর্যন্ত হয়নি বললেই চলে। তাই এ-রকম দুর্বিপাকে পড়া সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে কৌতুক বোধ করতে পারছে। অসুবিধে বোধ করা মাত্র সেটা দূর হতে সময় লাগে না এ-রকম দেখেই অভ্যস্ত সে। এই প্রথম এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে সে যেখানে সুবিধে অসুবিধের কোনো প্রশ্নই নেই।

ঢোকার মুখে গেটে চেকার দাঁড়িয়ে। কিন্তু ভিড়ের জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক নির্বিঘ্নে ঢোকা গেল। লোকাল গাড়ির ভিড়ে অত কড়াকড়ি নেই হয়তো। তবু একটু ভয়-ভয়ই করছিল যশোমতীর।

লোকটা তার সামান্য আগে আগে চলেছে। তার বগলের খবরের কাগজটা হাতের মালের বোঝা সামলাতে গিয়ে দুই-একবার পড়-পড় হয়েছে। ওই কাগজটা চক্ষুশূল যশোমতীর। তার সমস্ত ত্রাস আপাতত ওই এক জায়গায় পুঞ্জীভূত।

আবার ফ্যাসাদে পড়ার ভয়ে প্রথম সুযোগে পিছন থেকে কাগজটা টেনে নিল সে। শঙ্কর সারাভাই ফিরে তাকাতে মিষ্টি করে হেসে বলল, আপনার অসুবিধে হচ্ছিল, আমার কাছে থাক।··· আপনি যাবেন কোথায়?

এই সুতৎপর জিজ্ঞাসার হেতু আছে যশোমতীর। একটু বাদেই হয়তো লোকটা তাকে এই প্রশ্ন করবে, তার গন্তব্য স্থান জানতে চাইবে। প্ল্যাটফর্মে ঢোকার পর কাতারে কাতারে এত অচেনা মুখ দেখে একটু যে অসহায় বোধ করছে যশোমতী তাতে সন্দেহ নেই। ভরসা যদি একটুও কারো ওপর করতে হয়, যার সঙ্গে এই যোগাযোগ, তার ওপরে করাই ভাল।

শঙ্কর সারাভাই জবাব দিল, একেবারে শেষপর্যন্ত—মৌলা। আপনি?

যশোমতী মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, এক জায়গাতেই যাচ্ছে। পাছে আর কিছু জিজ্ঞাসা করে সেই ভয়ে ভিড়ের দরুনই যেন একটু তফাতে পড়ে গেল সে।

ঠাসাঠাসি ভিড়। এগোতে এগোতে আর জায়গার খোঁজে কম্পার্টমেণ্ট দেখতে দেখতে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে শঙ্কর বলল, এই ঘণ্টার গাড়িতে ভিড় লেগেই আছে—

যাই হোক, গায়ের জোরেই ঠেলাঠেলি করে একটা কামরায় আগে উঠল সে। মালের ঠেলায় অনেকে এদিক-ওদিক সরে যেতে বাধ্য হল। বলতে গেলে বেশির ভাগই আধাভদ্র আর নিম্নশ্রেণীর

যাত্রীর ভিড়। অবশ্য ভদ্রলোকও দু'পাঁচজন নেই এমন নয়। নিজে উঠে হাত বাড়িয়ে যশোমতীর হাতের ঝোলাটা নিল শঙ্কর সারাভাই। তারপর দু'হাতে ভিড় ঠেলে সরিয়ে তাকে ওঠাবার চেষ্টা করতে করতে বার কয়েক হাঁক দিল, এই ভাই সরো না, মহিলা উঠতে পারছেন না দেখছ না!

ভিড় ঠেলে ওঠার অভ্যেস থাকলে যশোমতী উঠতে পারত। নেই বলেই পেরে উঠছে না। এক হাতের মুঠোয় কাগজ, অন্য হাতে হ্যাণ্ডেল ধরেছে কোনো রকমে। কিন্তু তারপর লোক ঠেলে ওঠা আর সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এরই মধ্যে তার চকিতে মনে হল কি। এক বিপদের ফাঁকে আর এক বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আশা। মুহূর্তে শঙ্কর সারাভাইয়ের দিকে একবার চোখ চালিয়ে সকলের অলক্ষ্যে অন্য হাতের খবরের কাগজটা টুপ করে ফেলে দিল সে।

ওদিকে সবিক্রমে দু'হাতে ভিড় সরিয়ে শেষে একহাতে প্রায় তাকে টেনেই তুলল শঙ্কর সারাভাই। তবু দু'দিকের চাপাচাপিতে যশোমতীর মুখ লাল। ঘেমেই উঠেছে। শঙ্কর সারাভাই এবারে একে মিষ্টি কথা বলে, ওকে রূঢ় কথা বলে নিজের মাল রাখার জায়গা করল আগে।

ওদিকে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

যশোমতী বসার জায়গা পায় নি তখনো। গা বাঁচিয়ে একটু সরে দাঁড়াবে কোথাও, এমন ফাঁকও নেই। বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত সে এই জগতেই বিচরণ করে এসেছে কিনা ঠাওর করতে পারছে না। যাদের দেখছে, তাদের যেন আর কখনো সে দেখে নি।

মাল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার পর এবারে বসার চিন্তা শঙ্কর সারাভাইয়ের। একজন মেয়েছেলে ভিড়ের মধ্যে এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখতেও বিসদৃশ। শঙ্কর এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে দেখল, ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতে পারলে বসার ব্যবস্থা হতেও পারে। ও-দিকটায় হাত-পা ছড়িয়েও বসে আছে কেউ কেউ। অতএব আবার চেষ্টা।

ইশারায় যশোমতীকে আসতে বলে ভিড় ঠেলে সে এগোতে লাগল—ও-দিকের লোকগুলো একটু সঙ্কুচিত হলে একজনের মতো বসার জায়গা অনায়াসে হতে পারে। কিন্তু দরজার দিক থেকে ভিতরে ঢোকাই মুশকিল।

—মেয়েছেলে ওদিকে যাবে, একটু জায়গা দাও না ভাই। এই একটু একটু করতে করতে যশোমতীকে নিয়ে সত্যি একপ্রান্তের দুই বেঞ্চির মাঝে এসে দাঁড়াল।

বুড়ো মতো এক ভদ্রলোকের উদ্দেশে সবিনয়ে আবার বলল, একটু সরে সরে বসুন না সার দয়া করে, মেয়েছেলে বসবে—

বার বার মেয়েছেলে মেয়েছেলে শুনে যশোমতীর লজ্জাই করছে। বিতিকিচ্ছিরি ভিড়ের দরুন তার গা-ও ঘুলোচ্ছে। এর ওপর আবার অস্বস্তিতে ফেললে ওই বুড়ো মতো ভদ্রলোক। সরি বলা সত্ত্বেও তার মেজাজ প্রসন্ন থাকল না। ঠাস করে বলে বসল, এ-রকম ভিড় দেখেও মেয়েছেলে নিয়ে ওঠেন কেন মশাই! একটা গাড়ি ছেড়ে উঠলেই তো হয়—

সঙ্গে সঙ্গে জবাব শুনেও দুই চক্ষু বিস্ফারিত যশোমতীর। শঙ্কর সারাভাই হাসিমুখে সাদা-সাপটা জবাব দিল, ভুল হয়ে গেছে, আপনার সঙ্গে আগে দেখা হলে পরামর্শ করেই উঠতাম। উঠে যখন পড়েছি, মেয়েছেলে সঙ্গে থাকলে তাকে ফেলেই বা উঠি কি করে। দোষ-ত্রুটি না ধরে আপনি এখন দয়া করে একটু চেষ্টা করে দেখুন, ব্যবস্থা হয় কি না।

বুড়োর রুক্ষু মুখ বিকৃত হল। বচন শুনে এপাশ-ওপাশের কেউ কেউ হাসছে। লোকটার কথায় না হোক, যশোমতীর দিকে চেয়ে অনেকেরই একটু জায়গা করে দেওয়ার আগ্রহ হল। ফলে জায়গাও হল। যশোমতী বসে বাঁচল। তার দু'হাত দূরে শঙ্কর সারাভাই দাঁড়িয়ে। নিজের জায়গার জন্য আর ঝগড়া-ঝাঁটি করার ইচ্ছে নেই বোঝা গেল। পকেট থেকে তোয়ালের মতো একটা রুমাল বার করে ঘাম মুছছে।

ছোট লাইনের লোকাল ট্রেন। কাছাকাছি স্টেশন। দুটো স্টেশন পার হয়ে গেল। কিছুলোক নেমে গেল। দাঁড়িয়ে যারা ছিল তারা কেউ কেউ বসতে পেয়ে গেল। যশোমতীর উল্টোদিকের বেঞ্চিতে শঙ্করও বসার মতো জায়গা পেল একটু। মনটা তার ভালো নেই খুব। গাড়িতে উঠে নিশ্চিন্ত হবার পর মনে পড়েছে কিছু। নিরুপায় হয়ে মেসোর কাছ থেকে যেভাবে টাকা আনতে হল সেটাই ভিতরে খচখচ করেছে। বসতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিবেকের খচ-খচানি বাতিল করে দিয়ে পকেট থেকে ছোট হিসেবের বই বার করল। মন দিয়ে কেনা-কাটার হিসেবটা সেরে ফেলতে লাগল সে।

যশোমতী এক-একবার আড়চোখে দেখছে তাকে, আবার বাইরের দিকে মুখ করে বসে থাকছে। এদিকে ফিরবে কি, আবার কার হাতে খবরের কাগজ চোখে পড়বে—মনে মনে এখন সেই অস্বস্তি। আজই কাগজে ছবি বেরিয়ে গেছে যখন, তার চিঠিখানা প্রত্যাশিত সময়ের আগেই বাবা-মায়ের হাতে পড়েছে। লিখে আসা সত্ত্বেও এ-ভাবে ঢাক পিটিয়ে খবরের কাগজে ছবি ছাপিয়ে তাকে বিব্রত করার দরুনও বাবার ওপর রাগ হতে লাগল। তাকে ধরার জন্য আরো কি করেছে আর করছে, কে জানে। সত্যি সত্যি শো-কেসের পুতুল ভাবে বলেই এত ভাবনা, তার কাছে মেয়েদের একটুও মর্যাদা থাকলে দু'দিন অন্তত সবুর করে দেখত।

—এঁর টিকিট? একটু ঘুরে ইঙ্গিতে যশোমতীকে দেখিয়ে তার টিকিট চাইল চেকার।

—আমি কি জানি! বলতে না বলতে হঠাৎ কোন্ অস্পষ্ট চেতনার ঘায়ে শঙ্কর সারাভাই বিমূঢ় যেন। যশোমতীর দিকেই তাকালো সে। চোখাচোখি হওয়া-মাত্র বিপদ স্বতঃসিদ্ধ মনে হল। তবু জিজ্ঞাসা করল, আপনার টিকিট কোথায়?

যশোমতী নিরুত্তর। ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ার সুযোগ থাকলে সে লাফিয়েই পড়ত।

শঙ্কর আরো রুক্ষ মেজাজে বলে উঠল, কি আশ্চর্য, টিকিট আছে না নেই ?

নিরুপায় যশোমতী সামান্য মাথা নাড়ল শুধু।

সঙ্গে সঙ্গে তার পাশের সেই বুড়ো ভদ্রলোক বক্র মন্তব্য ছুঁড়ল, মেয়েছেলের টিকিট তার হাতে দেওয়া কেন, নিজের সঙ্গে রাখলেই হত!

তিক্ত-বিরক্ত হয়ে শঙ্কর সারাভাই তাকেই ঝাঁঝিয়ে উঠল প্রথম, আপনি থামুন তো মশাই!

যশোমতীর দিকে ফিরল আবার। গলার স্বর সংযত রাখা দায়। —টিকিট নেই তো গাড়িতে ওঠার সময় সেটা মনে পড়ল না—বিনা টিকিটে দিব্বি গাড়িতে উঠে বসলেন ? আমার কাছে কি টিকিট গজাবে এখন! আরো কি বলতে যাচ্ছিল, যশোমতীর নিষ্প্রভ পাংশু মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। চেকারকে সবিনয়ে বলল, দেখুন, স্টেশনে আসার সময় বাসে ওঁর ব্যাগটা চুরি হয়ে গেছে, সে জন্যেই আর কি—

বাস-কণ্ডাক্টরের সঙ্গে টিকিট চেকারের খুব একটা তফাত নেই। শুনে ঠাণ্ডা মুখে বলল, আপনি টিকিট করে নিন এখন, গার্ডকে বলে ওঠেন নি, কিছু ফাইনও লাগবে। মৌলা তো ?··· টিকিট একটাকা দশ আনা আর ফাইন দেড় টাকা—তিনটাকা ছ-আনা দিন—

যাঃ কলা! শঙ্কর সারাভাই প্রথমে বিমূঢ়, পরে তিক্ত-বিরক্ত। —আমি দিতে যাব কেন ?

একটা মজার সূচনা দেখে অনেকেরই দৃষ্টি এদিকে এবারে। চেকারও ঈষৎ বিস্মিত!—তাহলে কে দেবে ? উনি আপনার সঙ্গে নন ?

—আমার—মানে—আমার সঙ্গে আবার কি!

সঙ্গের মহিলা বিব্রত বোধ করছে দেখেও শঙ্কর সারাভাইয়ের এ-রকম ব্যবহার মনঃপুত হল না অনেকেরই। ভিড়ের মধ্যে মালপত্র

লটবহর সমেত মেয়েটিকে সুদ্ধু টেনে গাড়িতে তুলে কি ভাবে জায়গা করে নিয়েছে—এরই মধ্যে সেটা কারো ভোলার কথা নয়। সেই বুড়ো লোকটিই চুপ করে থাকতে না পেরে তিক্ত মুখে ফোঁড়ন কাটল আবার।—টিকিট নেই যখন চুপচাপ টাকাটা গুণে দিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে দিন না, টাকাটা বাঁচানো গেল না যখন কি আর করবেন—উনি আপনার সঙ্গের কেউ কিনা সেটা আমরা সকলেই জানি।

অর্থাৎ, সঙ্গিনীর টিকিট না কেটে টাকা বাঁচাতে চেষ্টা করা হয়েছিল—ধরা পড়ার পরে সুড়সুড় করে টাকা বার করে দেওয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ।

সীট ছেড়ে শঙ্কর সোজা উঠে দাঁড়াল একেবারে। ফলে জোড়া চোখ তার মুখের দিকে ধাওয়া করল। সশঙ্ক ব্যাকুল চোখে তাকালো যশোমতীও।

ধীর গম্ভীর মুখে বুড়ো লোকটাকে ভাল করে দেখেই যেন নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করল শঙ্কর সারাভাই। কিন্তু পেরে উঠল না। আগে সহ্য করেছে বারকয়েক, কিন্তু এই উক্তি বরদাস্ত করার মতো নয়। বলল, ফের আপনি মুখ খুলবেন তো ওই জানলা দিয়ে আপনাকে আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব, বুঝলেন?

বুড়োর মেজাজও তেমনি। রুখে গর্জে উঠল তৎক্ষণাৎ, কি? কি করবে তুমি! মগের মুলুক এটা, কেমন? এক-গাদা লোক ঠেলে বিনা টিকিটে মেয়েছেলে নিয়ে উঠে আবার—

শঙ্কর কি করবে? সাদা চুল দেখল, দাঁত নেই দেখল। না, কিছু করার নেই। বুড়োটা অতি বুড়ো, সেটাই তার জোর। রুদ্ধ রোষে এক ঝটকায় যশোমতীর দিকে ফিরল। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়েও থমকে গেল। যা বলতে যাচ্ছিল বলা হল না। চেয়েই রইল একটু। তারপর চেকারের দিকে ফিরল।

—কত দিতে হবে বললেন?

—তিন টাকা দু আনা।

—ফাইনও দিতে হবে?

—হবে।

—আচ্ছা রিসিট লিখুন।

মানিব্যাগ টেনে নিয়ে টাকা বার করল। একগোছা নোটই আছে বটে এখনো, তবে সবই হিসেবের টাকা।

টাকা গুণে দিয়ে রিসিট নিল। নিয়েই রাগের মাথায় সেটা যশোমতীর দিকে বাড়িয়ে দিল। যশোমতী ভয়ে ভয়ে তাকালো তার দিকে। কি ভেবে শঙ্কর সারাভাই পরক্ষণে আবার হাত টেনে নিয়ে রিসিটটা নিজের ব্যাগেই রাখল।

চেকার চলে গেল। শঙ্কর নিজের আসনে গুম হয়ে বসল। যশোমতী ওদিকে ফিরে জানলার বাইরে মুখ আড়াল করেছে আবার। অপমানের চূড়ান্তই হয়ে গেছে যেন। তিন টাকা দু আনার জন্য এ-রকম পরিস্থিতিতে কেউ পড়ে এ যশোমতীর স্বপ্নেরও অগোচর। এরপর সে কি করবে, পরের স্টেশনে নেমে গিয়ে বাড়িতে টেলিগ্রাম করার ব্যবস্থা করবে একটা? তারপর বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলবে, দুনিয়া দেখতে বেশিদিন লাগল না—একদিনেই দেখা হয়ে গেছে? বলবে তুমি ঠিকই বলেছ, নিজের জোরে বাঁচার শক্তি নেই আমাদের—আমরা শো-কেসে থাকারই উপযুক্ত?

তার থেকে গলায় দড়ি দেবার মতো দড়ি জুটবে না একটু? কিংবা ডুবে মরার মতো একটু জল? আর রেললাইন আর রেল গাড়িও তো আছেই। বাবারই মেয়ে বটে সে, সে রকমই গোঁ। যত অপদস্থ হল, ততো বেশি গোঁ চাপল তার। বাড়ি ফেরার চিন্তা সমূলে ছেঁটে দিল, আর আত্মহত্যার পর নিজের চেহারাটা কল্পনা করতে একটুও ভাল লাগল না। সেটা ভয়ানক বীভৎস ব্যাপার। মনে মনে ভাবল, যত নষ্টের মূলে ওই চোর হতভাগা—বাস থেকে যে তার ব্যাগ নিয়েছে। তাকে হাতে পেলে আর ক্ষমতা থাকলে এই মুহূর্তে তাকে ফাঁসি দিত বোধহয়।

স্টেশন আসছে, যাচ্ছে। কামরার লোক কমছে।

একটা প্রশ্ন কানে ঢুকতেই আবার সচকিত কণ্টকিত হয়ে উঠল

যশোমতী। এদিকে ফিরল না। লোকটা জিজ্ঞাসা করছে, আমার কাগজটা—কাগজটা কি করলেন?

প্রাণপণে বাইরের দিকে ঝুঁকে মাটি দেখছে যশোমতী। কিন্তু রেহাই পেল না।

—ইয়ে, শুনছেন? আমার কাগজটা আপনার হাতে ছিল, কোথায় রাখলেন?

অগত্যা নিরুপায় যশোমতী মুখ ফেরালো। আবারও বিপদের সম্মুখীন। তবে লোকজন নেমে যাওয়ার ফলে ওদিকের আসন অনেক ফাঁকা, এ-দিকে কারো চোখ নেই, আর সেই বুড়ো লোকটাও কখন নেমে গেছে।

—আমার কাগজটা? তিনবার একই কথা জিজ্ঞাসা করতে হল বলে শঙ্কর সারাভাইয়ের বিরক্তি।

যশোমতী কি আর জবাব দেবে, অসহায় চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কাগজ বলে একটা বস্তুর অস্তিত্ব এই যেন প্রথম শুনল।

সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ চড়তে লাগল শঙ্কর সারাভাইয়ের। যশোমতীর এ-পাশ ও-পাশ আর বেঞ্চির তলায় চোখ চালিয়ে সে-ই খুঁজে নিল একটু। তারপর রুক্ষস্বরে বলে উঠল, এটাও হারিয়েছেন? বলি এ-ভাবে একা স্টাইল করে আপনারা বেরোন কেন? আপনার কি ত্রিভুবনে কেউ নেই? সেই—সেই বাসে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে আমার কত লাভ হয়েছে বুঝতে পারছেন? দেখছেন কি? আমার অসুবিধা হচ্ছে বলে কাগজখানা আপনি টেনে নিয়েছিলেন—সেটা কি করলেন?

কি যে হল যশোমতীর কে জানে। একটু দূরে দূরে যারা ছিল তারাও এবারে সবিস্ময়ে ঘুরে বসেছে। ঠিক বুঝতে পারছে না হয়তো কি নিয়ে লোকটার মেজাজ চড়েছে—কিন্তু কথাবার্তার সুর তাদের কানে বেসুরো লাগছে নিশ্চয়ই।

সমস্ত মুখ লাল যশোমতীর। অনুচ্চ কঠিন প্রায় রূঢ় জবাব দিয়ে

বসল, ফেলে দিয়েছি।

—ফেলে দিয়েছেন! জবাবটা অথবা জবাবের এই সুরটাই হয়তো ঠিক বোধগম্য হয়নি শঙ্করের।—মানে আমার কাগজটা আপনি ফেলে দিয়েছেন?…কেন? কেন?

—আমার খুশি।

শঙ্কর অবাক। এতক্ষণ যে মেয়ে দুই ঠোঁট সেলাই করে বসে ছিল, তার এই জবাব শুনে এতগুলো ক্ষতির হিসেব পর্যন্ত ভুল হবার দাখিল। নইলে এতখানি লোকসানের পর এ-রকম উক্তি বরদাস্ত করার লোক নয় সে।

হঠাৎ ভিতরে একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি গুড়গুড় করে উঠতে লাগল শঙ্করের। মাথায় গণ্ডগোল নেই তো কিছু! যে ভাবে এখন মুখের দিকে চেয়ে আছে, মনে হল আর কিছু বললে সে-ও ঠাস করে মুখের ওপর জবাব দেবে।

অতএব আর কিছু না বলে শঙ্কর অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালো, কিন্তু আড়ে আড়ে বার-কতক লক্ষ্য করল মেয়েটাকে। পরনের বেশ-বাস এমন কি পায়ের জুতোজোড়া পর্যন্ত দামী মনে হয়। হাতের হীরে-বসানো মোটা বালা-দুটো আর আংটি ঝকমক করছে। কানের ঝোলানো দুল দু'টাও। গলার হারও কম দামী নয়, হাতে দামী লেডীস রিস্ট-ওয়াচ। মেসোর থেকে ও-ভাবে টাকা আনার দরুন, আর সেই বাস থেকে একের পর এক ব্যবসায়ের পয়সা অকারণে খোয়া যাবার দরুন মেজাজ বিগড়ে ছিল বলেই হয়তো খুব ভাল করে লক্ষ্য করা হয়নি এতক্ষণ। পয়সার ব্যাপারে শঙ্করের কড়াক্রান্তি হিসেব তার ওপর এ তো বলতে গেলে প্রাণের দায়ে চুরি করা বহু কষ্টের পয়সা।…কিন্তু এই প্রথম মনে হল শঙ্কর সারাভাইয়ের, দেখলে দেখার মতোই বটে মেয়েটি। মুখখানা যে ভারী ভারী মিষ্টি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

…অথচ একলা বেরিয়েছে। কিন্তু একলা বেরিয়ে যে অভ্যস্ত সে-রকম একটুও মনে হয় না।

ওদিকে একের পর এক নাজেহাল হয়ে যশোমতী সত্যিই রেগে গিয়েছিল। রাগে ক্ষোভে তার চোখে জল আসার উপক্রম হয়েছিল। আর কিছু বললে সেও চুপ করে থাকত না ঠিকই। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে যা মুখে আসে তাই বলে বসত হয়তো। কিন্তু লোকটার হাব-ভাব হঠাৎ এ-ভাবে বদলে যেতে আত্মস্থ হল। ফলে শুধু লজ্জা নয়, সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল। বক্রনেত্রে সেও বার-কতক লক্ষ্য করল তাকে।

দুই একবার চোখোচোখি হয়ে গেল। যশোমতীর মনে হল, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ির জন্যেই বেশি রুক্ষ লাগছে লোকটাকে···শেভ করলে বেশ ভব্য-সভ্যই দেখাবার কথা। স্বাস্থ্য রীতিমতো ভাল, গায়ের জোরের দেমাকেই লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়ায় বোধহয়। কিন্তু অন্য লোকের সঙ্গে ঝগড়ার বেশির ভাগ তার জন্যেই করেছে— এ সত্যটাও মনে মনে অস্বীকার করতে পারল না যশোমতী। ইচ্ছে করে লোকটার কাগজ ফেলে দেবার পরেও সেই কিনা উল্টে চোখ রাঙিয়ে বসল। আর তার ফলে ভদ্রলোক···ভদ্রলোকই তো মনে হচ্ছে···এ ভাবে চুপ করে যাবে আশা করে নি। করে নি বলেই যশোমতীর চিন্তা কিছুটা সঙ্গত পথে চলল। মানুষটার রুক্ষ হাব-ভাব আচরণের তলায় একটা যেন দরদী মনই আবিষ্কার করে ফেলল সে। ব্যাগ চুরি যাবার ফলে এখন তো বিপদের পাহাড় যশোমতীর মাথার ওপর। কেউ সামান্য সহায় হলেও সেটা সামান্য ভাবার কথা নয়। ভাবল না। এতবড় বিপদে এত লোকের মধ্যে এই নিতান্ত অপরিচিত একজন ছাড়া কে আর তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। আর তো কেউ ফিরেও তাকায় নি। টিকিট-চেকারের হাতে ধরা পড়ার ফলেই তো এতক্ষণে সব ফাঁস হয়ে যাবার কথা। তাকে টেনে নামিয়ে জেরা শুরু করলেই ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে বাবার কাছে খবর না পাঠিয়ে করত কি? আর তারপর···তারপর কেলেঙ্কারি হাসাহাসি, ঢি-ঢি।

এ-পর্যন্ত এই অপরিচিত মানুষটাই সর্বভাবে তার মান মর্যাদা

রক্ষা করেছে। নইলে কি-যে হত কে জানে।

বক্র কটাক্ষে তাকালো আবার। আবারও চোখোচোখি হয়েগেল। ধমক খাবার পর এই মুখ দেখে প্রায় হাসিই পাচ্ছে যশোমতীর। এত চিন্তা-ভাবনার ফাঁকে ফাঁকেও মনের তলায় কোথায় যেন একটু ভাল লাগার অনুভূতি উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। শুধু সামান্য পয়সা —যে পয়সাকে কোনদিন পয়সা বলে ভাবার দরকার হয়নি যশোমতীর তাই নিয়ে লোকটার ও-ভাবে মাথা গরম করাটা ভাল লাগে নি।···হতে পারে গরীব, তাই বলে এমন তুচ্ছ লোকসান নিয়ে এ-রকম হিসেব-নিকেশ করার মন কেন? তার একটু প্রীতির আশায় কত জনে কত টাকা বাতাসে উড়িয়ে কৃতার্থ হবার জন্য প্রস্তুত ঠিক নেই।

মেয়েটাকে এক-একবার দেখেছে আর ভাবছে শঙ্কর সারাভাইও। সেই গোড়া থেকে অর্থাৎ বাসের যোগাযোগের শুরু থেকে তলিয়ে ভাবছে। ···না, যত দেখছে আর যত ভাবছে, মাথায় ছিট আছে বলে মনে হচ্ছে না তার। আচরণে অসঙ্গতি কোথাও দেখে নি বাসে, বাসের থেকেও অনেক গুণ বেশি এই ট্রেনে—টিকিট না থাকার দরুন যে অসহায় মূর্তি লক্ষ্য করেছে, তাতে কোনরকম বিকৃতির লক্ষণ ছিল না। বিকৃতি নয় মনে হতেই ভিতরে ভিতরে আবার রাগ হতে লাগল শঙ্করের। স্টাইল করে একা বেরিয়েছে, তার ওপর কাগজ হারিয়ে উল্টে আবার চোখ রাঙিয়েছে তাকে। ···দেখতে সুন্দর, ভেবেছে সকলে শুধু মুখ দেখেই ভুলে যাবে। সুন্দর মুখ দেখেই সে একের পর এক এতগুলো লোকসান বরদাস্ত করেছে কিনা মনে হতে নিজের ওপরেই উষ্ণ হয়ে উঠল। কেন অত করতে গেল? বাসের টিকিট দিতে গেল কেন,কেনই বা বিনা টিকিটে ট্রেনে ওঠার খেসারত দিতে গেল?···আশ্চর্য।

ট্রেন থামল। দিনের আলোয় টান ধরেছে। সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। মৌলা। লোকাল ট্রেনের যাত্রা শেষ।

কামরায় যে সাত-আটজন লোক ছিল তারা আগে নেমে গেল।

শঙ্করের তাড়া নেই। ধীরে-সুস্থে মালপত্র গুছিয়ে সে নামার উদ্যোগ করল। এবারে আবার চোখ টান করে তাকে দেখছে যশোমতী। স্টেশনের দিকে এক নজর তাকিয়েই তার ভিতরটা দুমড়ে গেছে। দু'দণ্ড নিশ্চিন্ত হবার মতো কিছুই কি বরাতে জুটবে না আজ? খোলা স্টেশন, মাথার ওপর ছাদ নেই। ওদিকে খুপরির মতো ছনের ছোট ছোট অফিস-ঘর গোটা দুই-তিন, ওয়েটিংরুম আশা করা দুরাশা বোধহয়। স্টেশনের এদিক-ওদিক যতদূর চোখ যায় ধু-ধু মাঠ।

আগে মালগুলো সব নামিয়ে আর একবার উঠে বেঞ্চির তলায় উঁকি দিয়ে দেখে নিল শঙ্কর, টুকিটাকি জিনিস কিছু থলে থেকে গাড়িতে পড়েছে কিনা। তারপর নেমে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

যশোমতী বসে আছে। শুধু বসে আছে নয়, তার দিকেই চেয়ে আছে। মেয়েটার এই দৃষ্টি আবার যেন কেমন অসহায় মনে হল শঙ্করের।

তবু আর বোধহয় মাথা গলাতো না সে, সেই থেকে অনেক শিক্ষা হয়েছে—কিন্তু মেয়েটির টিকিটের রসিদও যে তারই কাছে। তাছাড়া, এভাবে বসে থাকতে দেখে অবাকও কম হয়নি। হাব-ভাব গোলমেলেই লাগছে।

দাঁড়িয়ে দেখল একটু। গম্ভীর মুখে জানান দিল, এটা মৌলা স্টেশন।

জবাব নেই।

—আপনি নামবেন কি এখানে? খানিক বাদে গাড়ি আবার ফিরে যাবে।

অগত্যা যশোমতী উঠল। তার পিছনে পিছনে নামল। স্টেশন না এলে, এই পথ এত শিগগীর না ফুরোলেই বাঁচত বুঝি। আবার এক সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে প্রস্তুত হতে চেষ্টা করেছে প্রাণপণে।

শঙ্কর সারাভাই মালপত্রগুলো দু-হাতের দখলে আনতে চেষ্টা

করল। আসার সময়ের মতো স্বাভাবিক সৌজন্যবশতই হোক বা একটু সাহায্য করার তাগিদেই হোক, সেই ঝোলাটা নেবার জন্য হাত বাড়ালো যশোমতী।

তার আগে শঙ্কর তাড়াতাড়ি ওটা দখলই করল যেন। বলল, থাক এটা খোয়া গেলে আবার আমাকে এই গাড়িতেই ফিরতে হবে।

টিকিট দিয়ে বাইরে এলো। যশোমতী কি করবে এখন জানে না। দিনের আলোয় যে সাহসে বুক বেঁধেছিল, আসন্ন রাতের ছায়া নামতে তা যেন উবে গেছে। এর থেকে গাড়িতে বসে থাকলে ভাল হত বোধহয়। গাড়ি আবার ফিরে যেত অবশ্য। গেলেও বড় স্টেশনে রাত কাটানো যেত। দিনের আলোয় আবার ভাবা যেত কি করা যায়।

বাইরে আসার পর লোকটা যেন আর চেনেই না তাকে। ও-ধারের আঙিনা ছাড়িয়ে রাস্তায় নেমেই রিকশায় মালপত্র তুলতে লাগল। যশোমতী কি করবে? কেমন লোক—ভাল কি মন্দ কিছুই জানে না। কিন্তু এ-রকম দিশাহারা অবস্থায় পড়ে তার মনে হল, এতক্ষণের এই চেনা লোক যেন নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরের মতো তাকে বিপদের মধ্যে ফেলে চলে যাচ্ছে।

যশোমতী সিঁড়ির ওপরেই দাঁড়িয়েছিল। রাস্তায় নামে নি। লোকটা তার দিকে আর ফিরে তাকাবে কিনা জানে না, আর একবারও তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে কিনা জানে না। তবু দাঁড়িয়ে আছে যশোমতী, তবু প্রতীক্ষা করছে। সাধারণ স্থলে এ-রকম বেখাপ্পা পরিস্থিতিতে এই বয়সের কোনো মেয়ের আলাপ-পরিচয় ঘটলে পুরুষের দিক থেকে অন্তত একটু ঘনিষ্ঠ হবার কথা। আর কিছু না হোক, তার একটু কৌতূহল হবার কথা। কিন্তু এ-রকম নীরস গদ্যাকারের পৃথিবী যশোমতী আর দেখে নি। চলে যেতে দেখে লোকটার ওপর এখন রীতিমতো রাগ হচ্ছে তার—পাঁচ টাকাও খরচ হয়নি ওর জন্যে, কিন্তু সেই লোকসানের শোকেই অস্থির।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেল না, ফিরে তাকালো। আর, তক্ষুনি প্রাণের

দায়ে যশোমতী কিছু বলবে এ-রকম কিছু আভাসই প্রকাশ করল হয়তো। বিস্ময়ের আঁচড় পড়তে লাগল লোকটার মুখে। সে যে এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তাও এতক্ষণ খেয়াল করে নি বোধহয়।

যশোমতীর রাগ হবারই কথা।

যাক্, ফিরে আসছে।

যশোমতী জিজ্ঞাসা করল, এখানে রাতে থাকার মতো কোনো হোটেল-টোটেল বা সে-রকম কিছু নেই?

জবাব না দিয়ে শঙ্কর সারাভাই অবাক চোখে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। মেয়েটিকে আবার নতুন করে দেখল একপ্রস্থ। শুধু দেখা নয়, বুঝতেও চেষ্টা করল।—আপনি যাবেন কোথায়?

যশোমতী নিরুত্তর।

—এখানে আপনার চেনা-জানা কেউ নেই?

সুবোধ মেয়ের মতো তক্ষুনি মাথা নাড়ল। নেই। শঙ্কর সারাভাই দেখছে। রাগ নয়, একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। মনের তলায় দুর্বোধ্য জটিলতার ছায়া পড়ছে।

—আপনি এখানে এসেছেন কেন?

এই প্রশ্নের একটাই জবাব হতে পারে। যশোমতী তাই বলল। —চাকরির খোঁজে···

—চাকরি! কি চাকরি?

—কোনো স্কুল-টুলে—

—স্কুলে চাকরি! মেয়েদের স্কুল বলতে তো এখানে একটা পাঠশালা আছে শুধু।

যশোমতী সাগ্রহে বলল, সেখানেই একটা কা-কাজ পাওয়া যেতে পারে শুনেছিলাম···

শঙ্কর সারাভাই হাঁ করে তবু মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। আবার একটা গণ্ডগোলে পড়ে যাচ্ছে ভেবেই চিরাচরিত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল কিনা কে জানে। বলে উঠল, চাকরি পাওয়া যেতে পারে শুনেছিলেন তো সকালের গাড়িতে এসে দেখাশোনা করে যান

নি কেন? এখানে কি হোটেল-রেস্তরাঁর ছড়াছড়ি যে মনে হল আর একা মেয়েছেলে ভর-সন্ধ্যায় ছুট করে চলে এলেন? দৃষ্টি ঘোরালো হল পরক্ষণেই।—সঙ্গে তো টাকাকড়ি কিছু নেই, হোটেল থাকলেই বা আপনার কি সুবিধে হত?

যশোমতী কি জবাব দেবে? তবু মরিয়া হয়েই বলল, ভদ্রলোকের হোটেল হলে কোনো মহিলা বিপদে পড়েছে শুনলে সাহায্য করতেন বোধহয়। আমি ফিরে গিয়েই আবার টাকা পাঠিয়ে দিতুম। গয়না বেচে দেনা শোধ করে যেত সেটা আর বলতে পারল না।

শঙ্কর সারাভাইয়ের নিজেরই যেন বুদ্ধিসুদ্ধি সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে কেমন। হাঁ করে আবার ও মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। অস্বস্তি বাড়ছেই। কেন যেন আর মাথা গলানো ঠিক নয় মনে হল তার। তিরিক্ষি মেজাজে পকেট থেকে ব্যাগ টেনে একটা টাকা বার করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, একটা রিকশা নিয়ে যেখানে যাবার কথা চলে যান, রাত করে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য তো পাঠশালা খুলে বসে আছে সব! মোটকথা, যা ভাল বোঝেন করুন। ভাল দিন পড়েছে আজ আমার—

যশোমতী চেয়ে রইল শুধু। হাত বাড়াল না, বা টাকা নিল না। বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিণীর এই দুরবস্থা সে যেন নিজেই এখনো কল্পনা করতে পারছে না।

—কই, নিন! এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?

—থাক, আপনি যান।

কি করে বলল, সত্যিই চলে গেলে কি হবে যশোমতী জানে না। তবু মুখ দিয়ে এই কথাই বেরুল তার।

ব্যাগের টাকা আবার ব্যাগে পুরে হনহন করে এগিয়ে গিয়ে রিকশায় উঠে বসল শঙ্কর সারাভাই। রিকশাওয়ালা এতক্ষণ হাঁ করে দেখছিল তাদের। এবারে রিকশা তুলে নিল। দু'চার গজ এগিয়েই শঙ্কর পিছন ফিরে তাকালো।

যশোমতী দাঁড়িয়ে আছে। স্থির, নির্বাক। এদিকেই চেয়ে আছে।

আরো পাঁচ-সাত গজ গেল। আবারও ফিরে তাকালো শঙ্কর সারাভাই।

যশোমতী তেমনি দাঁড়িয়ে।

অস্বস্তির একশেষ। শঙ্করের কেবলই মনে হল, মেয়েটি বিপদে পড়েছে। এই চেহারার···এই গয়না আর সাজ-পোশাকের মেয়ে পাঠশালার চাকরির খোঁজে এসেছে শুনে সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিয়েছে বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে আসন্ন সন্ধ্যার টান-ধরা আলোয় এই মুখের দিকে চেয়ে কেন যেন বিপদে পড়া ছাড়া আর কিছু ভাবা গেল না। যেমন অসহায়, তেমনি করুণ····আবার তেমনি সুন্দর।

রিকশা ফেরাতে বলল।

সিঁড়ির পাশে রিকশা থামতে লাফিয়ে নেমে পড়ল

যশোমতী নিশ্চল দাঁড়িয়ে। কিন্তু তার বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করছে আবার।

—চলুন।

যশোমতী চেয়ে আছে।

যশোমতী চেয়েই আছে।

বিরক্তি চাপতে গিয়েও সেটা প্রকাশ হয়েই পড়ল --আপনাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছুই নেই। বাসে ব্যাগ হারাবার পরেও ফিরে যাওয়ার কথাটা মনে হল না আপনার···দেখছেন কি, উঠুন রিকশায়!

পায়ে পায়ে নেমে এসে যশোমতী রিকশায় উঠল। আশ্রয় পাওয়ার পর দ্বিধা, ভাল করল কি মন্দ করল জানে না। যে সঙ্কটে পড়েছে, ভাল হোক মন্দ হোক কিছু একটা করতেই হবে। গাঁয়ের এই স্টেশনে রাত কাটাবার কথা ভাবতেও তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল।

সে বসার পর পাশে যেটুকু জায়গা থাকল, সেখানে কোনো অচেনা পরপুরুষের বসার প্রশ্ন ওঠে না। তবু সভয়ে তাকালো যশোমতী।

চল—। রিকশা চালাতে হুকুম করে শঙ্কর সারাভাই হনহন করে আগেই হেঁটে চলল। তারপর পিছন ফিরে বলল, মালগুলোর দিকে দয়া করে লক্ষ্য রাখবেন পড়ে-টড়ে না যায়, আর খেয়াল খুশি-মতো কোনটা ফেলে দেবেন না আবার।

রিকশাওয়ালা আবার রিকশা তুলে নিল। হঠাৎ খুব হাল্‌কা আর খুব নিশ্চিন্ত লাগছে যশোমতীর। বিপদের থেকে আরো বিপদের মধ্যে পা বাড়ায় নি, এ আশ্বাস যেন নিজের ভিতর থেকেই পাচ্ছে সে। লোকটার নাম পর্যন্ত জানে না এখনো, কিন্তু আবছা সন্ধ্যায় এ-রকম একটা সুযোগ পেয়েও যে রিকশায় উঠে বসল না, বা বসার কথা একবার ভাবলও না—তাতেই লোকটা যে ভদ্র তাতে আর সন্দেহ থাকল না। ভেবে ভাবনার কূল-কিনারা পাবে না যশোমতী জানে, তাই হঠাৎ সমস্ত ভাবনা-চিন্তা রসাতলে পাঠাতে ইচ্ছে করল।...ভদ্রই যদি হয় তাহলে জলে পড়বে না। ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হবার দাখিল, আর ভাবতে পারে না। দেখা যাক।

রিকশাওয়ালা তার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল। যশোমতী তাকালো একবার। আবছা অন্ধকার সত্ত্বেও পাশ কাটাবার মুখে স্পষ্টই দেখতে পেল। রাজ্যের বিরক্তি মুখে এঁটে মাথা গোঁজ করে চলেছে লোকটা। রিকশা এগিয়ে যেতে হঠাৎ হেসেই ফেলল সে। বাসের টিকিট নিয়ে বিভ্রাটের পর থেকে একজন সঙ্গী পেয়েছে বটে!

দু'ধারে মাঠ, মাঝে রাস্তা। নির্জন। যশোমতী আর একবার তাকালো পিছন ফিরে। তারপর কি ভেবে রিকশাওয়ালাকে বলল, আস্তে চলতে, পিছনের লোকের সঙ্গে আসতে।...হাসি পেয়েছিল বটে, কিন্তু হাসিটা যে ছেলেমানুষি, তার থেকে বেশি কে আর জানে। কোথায় কার বাড়ি যাচ্ছে, কি দেখবে সেখানে গিয়ে কে জানে। সেখানে যারা আছে তাদের মুখ দেখাবে কি করে? তাদের জেরার কি জবাব দেবে? কি ভাববে তারা? কিন্তু উদ্বেগের তাড়নায় কিনা বলা যায় না, একটু আগের স্বতঃস্ফূর্ত আশ্বাসটুকুই আঁকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা করল যশোমতী।...সেই বাস থেকে যেমন দেখে আসছে এই

অচেনা অজানা সহযাত্রীটিকে, তার মেজাজ যেমনই হোক, বা হিসেবের মুঠোটা যত শক্তই হোক, তার ভিতরের একটা চেহারা যেন সে দেখেছে। সেটা মানুষেরই চেহারা, মেয়েছেলের বিপদ দেখে হীন সুযোগ নেবার ম.তা নয়। আপাতত এই নির্ভরতাটুকুই সম্বল।

রিকশার গতি শিথিল হবার ফলে পিছনের মানুষ পাশে আসতে যশোমতী উৎসুক মুখে তাকালো। শঙ্করও ঘাড় ফেরাল। আর তক্ষুনি বোঝা গেল মেজাজ তখনো ঠাণ্ডা হয়নি। হয়নি বলেই যেন বেশি নিশ্চিন্ত বোধ করছে। এবারে বিব্রত মুখে যশোমতী চিরাচরিত সৌজন্যের কুণ্ঠাই প্রকাশ করল।

—আপনার হেঁটে যেতে কষ্ট হচ্ছে...

দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর আটকে নিয়ে শঙ্কর বলল, কষ্ট হলে কি আর করা যাবে, ওখানে উঠব ?

ওখানে অর্থাৎ রিকশায়। কি রকম মেয়ে বোঝার জন্যেই ফিরে বক্র প্রশ্ন ছুঁড়েছে শঙ্কর।

থতমত খেয়ে যশোমতী তাড়াতাড়ি জবাব দিল, না না, বলছিলাম আর একটা রিকশা করলে হত...

—তার ভাড়াটা কে দিত, আপনি না আমি ?

এই জবাবই বোধহয় সব থেকে ভাল লাগল যশোমতীর। এরই থেকে মন বুঝতে সুবিধে হয়, অন্তত মনের গতি সোজা পথে চলছে কিনা সেটা বোঝা যায়। ভাল মুখ করে বলল, এখন আপনিই দিতেন, পরে না হয় আমি দিয়ে দিতাম।

যে-রকম হিসেবী, আরো কিছু বললে মাথা একটু ঠাণ্ডা হবে মনে হল। রিকশার গতি আর একটু না কমলে কথা বলার সুবিধে হচ্ছে না। আগে রিকশাওয়ালাকে নির্দেশ দিল, এই, আরো আস্তে চলো। তারপর পাশের লোকের দিকে ফিরে সবিনয়ে বলল, আমার জন্যে আপনার অনেক খরচা হয়ে গেল, কিন্তু আপনার কিচ্ছু লোকসান হবে না, আমি সব মিটিয়ে দেব।

জবাবে শঙ্কর সারাভাই একটা তপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল শুধু।

পরমুহূর্তে আচমকা প্রশ্ন করল, আপনার নাম কি?

ঠিক এই মুহূর্তে এ-প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। হকচকিয়ে জবাব দিল, লি-লীলা।

লীলা কী?

প্রশ্নের সুরটা খট করে কানে লাগল কেমন যশোমতীর। চোখ-কান বুজে যে পদবী মনে এল তাই বলে দিল।

—লীলা নায়েক। কেন…?

জবাব পেল না। আবছা আলোয় আর একবার যেন তাকে ভাল করে দেখে নিল লোকটা।

কি ভেবে হঠাৎ রিকশাওয়ালাকে রিকশা থামাতে বলল যশোমতী। শঙ্কর দাঁড়িয়ে গেল। যশোমতী নামল। বলল, রিকশাওয়ালা চলুক, আমিও হেঁটেই যাই।

শঙ্কর সারাভাই আপত্তি করল না। তার মনে নানা সংশয় আনাগোনা করছে। বাস থেকে এ-পর্যন্ত অনেক কিছুই অস্বাভাবিক লাগছে তার। রিকশাওয়ালাকে চলতে ইঙ্গিত করে এগিয়ে চুপচাপ চলল। শুধু বলল, বাড়ি এখনো আধ মাইল পথ।

সঙ্গে সঙ্গে যশোমতী জিজ্ঞাসা করল, আপনার বাড়িতে কে আছেন?

বিরক্ত মুখে কিছু বলতে গিয়েও শঙ্করের খেয়াল হল, এই বয়সের মেয়ে অপরিচিত লোকের বাড়ি যাচ্ছে, খোঁজ নেওয়াই স্বাভাবিক।

—দিদি আছে, আর বাচ্চা ভাগ্নে আছে।

দিদি আছে শুনে খানিকটা নিশ্চিন্ত যশোমতী।—আর কেউ নেই?

আর বিহারী আছে—পুরনো চাকর।…আপনি স্কুলে কাজ পাবেন জেনে এসেছেন, না কাজের চেষ্টায় এসেছেন?

ঢোঁক গিলে যশোমতী জবাব দিল, চেষ্টায়…

স্কুলের যারা চাকরি দেবার মালিক তারা আপনাকে এসে দেখা করতে লিখেছিল?

—না···মানে, আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম এসে চেষ্টাচরিত্র করলে কাজ হতে পারে···এসে গেলাম। আপনার তাদের সঙ্গে চেনা-জানা আছে ?

জবাব পেল না। আবছা অন্ধকার সত্ত্বেও যশোমতীর মনে হল লোকটার চোখে কিছু সংশয় ঘন হয়ে উঠেছে।

দুই-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শঙ্কর হঠাৎ আবার জিজ্ঞাসা করল, কোথায় থাকবেন ঠিক না করেই অজানা অচেনা জায়গায় দেখা-সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়েছেন ? এখানে আসতেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে আপনি জানতেন না ?

রিকশা থেকে না নামলেই ঠিক হত বোধহয়। মিথ্যে বলা অভ্যেস নেই যশোমতীর। দরকারও হয়নি কখনো। মিথ্যে কেউ বললে সে তাকে ঘৃণাই করত। কিন্তু ইচ্ছে না থাকলেও মিথ্যে না বলে পারা যায় না এ কে জানত। প্রাণের দায়ে অম্লানবদনে মিছে কথা বলার জন্যেই প্রস্তুত হল সে।

প্রথমে মাথা নাড়ল, সন্ধ্যা হবে জানতাম না। তারপর অস্ফুট বিশ্বাসযোগ্য সুরেই বলল, এ-রকম অবস্থায় পড়ে যাব ঠিক ভাবিনি।

—স্কুলে দেখা করে কাল ফিরে যাবেন ?

—চাকরি না হলে তো ফিরতেই হবে, তবে ঠিক ফেরার ইচ্ছে ছিল না···এখানে না হলে আবার অন্য কোথাও চেষ্টা করতে চলে যাব ভেবেছিলাম। অত ভিড়ের মধ্যে বাসে ব্যাগটা চুরি হয়ে গিয়েই সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে শঙ্কর সারাভাই খপ্ করে আবার জিজ্ঞাসা করে বসল, ব্যাগে আপনার কত টাকা ছিল ?

পা-পাঁচ—পাঁচশো। পাঁচ হাজার বলতে গিয়েও কোন রকমে সামলে নিয়ে পাঁচশো বলল। এমনিতেই অবিশ্বাস উঁকিঝুঁকি দিয়েছে বুঝতে পারছে, পাঠশালার চাকরি পাবার আশায় পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল শুনলে সঙ্গে সঙ্গে আবার হয়তো স্টেশনের রাস্তাই ধরতে বলবে তাকে। পাঁচশো টাকা বলার ফলেই প্রায় সেই

গোছের মুখ।

—পাঁচশো টাকা সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে এখানে আপনি চাকরির চেষ্টায় এসেছিলেন?

—ব-বললাম তো আর ফেরার ইচ্ছে ছিল না—যা ছিল সব নিয়ে বেরিয়েছিলাম। চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত। পরের প্রশ্ন শুনে প্রায় আঁতকেই উঠল যশোমতী।

—বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন?

—পা-পালাব মানে! যশোমতী রেগেই গেল।—পালাতে যাব কেন, বনিবনা হচ্ছিল না, চলে এসেছি। বলে এসেছি, নিজের রাস্তা নিজে দেখে নেব, আর ফিরব না।

ইচ্ছে করেই এতটা বলল যশোমতী। এই বলার ফলে আখেরে সুবিধে হতে পারে।

আবার গভীর প্রশ্ন।—বাড়িতে কে আছে? কার সঙ্গে বনিবনা হয়নি।

ভিতরে ভিতরে নাজেহাল যশোমতী। তবু জিজ্ঞাসাবাদের ফয়সালা এখানেই যে হয়ে যাচ্ছে, সেটা এক পক্ষে ভাল। অজানা অচেনা বাড়িতে গিয়ে ওঠার পর সকলের জেরার সামনে পড়তে হলে আরো বিতকিচ্ছিরি ব্যাপার হবে।

—দা-দাদার আর দাদার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আর বউদির সঙ্গে।

অন্ধকার ঘন হয়েছে। অদূরের রিকশাটাকেও আবছা দেখাচ্ছে। তবু পার্শ্ববর্তিনীকে আর একবার ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল শঙ্কর সারাভাই।—আপনার দাদা অবস্থাপন্ন?

জেরার ফলেই মাথা খুলছে যশোমতীর। এক মুহূর্তেই মনে হল, তার যা বেশ-বাস, অবস্থাপন্ন না বললে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, খুব। বড় অবস্থা বলেই তো মান বাঁচাতে সরে দাঁড়াতে হল।

যাক। এবারে জেরা শেষ হয়েছে মনে হল। আর মাথা খাটিয়ে যেভাবে জবানবন্দী দিল সে, খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে বলেও

মনে হল তার।

—আপনার দাদা কি করেন?

ব্যবসা। এর পর আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে রাগই হবে যশোমতীর।

—কিসের ব্যবসা?

ফের জেরার আগেই তড়বড় করে অনেক কথা বলে ফেলল যশোমতী। পাঁচ রকমের ব্যবসা, আমি অত খবর রাখিনে। মোট কথা তাদের ব্যবহারে সেখানে থাকতে আমার অপমান লাগছিল, তাই যা হোক একটা চাকরিবাকরি নিয়ে থাকব ঠিক করে চলে এসেছি। সেটা কি অন্যায় কিছু করা হয়েছে?

জবাব পেল না। ক্রমাগত মিথ্যে বলে যেতে হচ্ছে বলে রাগ হলেও ফলাফল তার অনুকূলেই যাচ্ছে মনে হল। এভাবে একা বাড়ি ছেড়ে আসার পিছনে একটা মোটামুটি স্বাভাবিক কারণ উপস্থিত করা গেছে সন্দেহ নেই।

অনেকখানি নিশ্চিন্ত হবার পর যশোমতীর খারাপ লাগছে না। ভিতরে ভিতরে এখন বেশ মজাই লাগছে। বাড়ির দিদিটি কেমন কে জানে, বাড়িটা পছন্দ হলে আর নিরাপদ মনে হলে দু'-পাঁচ দিন থেকে গিয়ে সত্যিই হয়তো পাঠশালায় চাকরির চেষ্টাও করা যেতে পারে। যে ছাঁদে বাড়ি ছাড়ার গল্প ফাঁদা হয়েছে, ঠকবে না। আর চাকরি একটা পেয়ে গেলে কড়া-ক্রান্তিতে এই লোকের দেনা শোধ তো নিশ্চয় করবে।

···দেনা। দেনার অঙ্ক মনে হতে যশোমতীর হাসিই পেয়ে গেল। রিকশার ভাড়া ধরলেও এ-পর্যন্ত পাঁচ টাকা হবে না হয়তো। পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল, এখন দেখছে পাঁচ টাকার দামও কম নয়। দুনিয়া দেখতে না বেরুলে এ-রকম অভিজ্ঞতা তার হত না ঠিকই।

—আপনার নাম কি? এবারের প্রশ্ন যশোমতীর।

—শঙ্কর—শঙ্কর সারাভাই।

—আপনি এখানে চাকরি করেন বুঝি?

না, ব্যবসা।

যশোমতীর মনে পড়ল, তার মালপত্রর সঙ্গে একরাশ সুতোও দেখেছে। তাই কিসের ব্যবসা জানার কৌতূহলও হল। কিন্তু ভরসা করে জিজ্ঞাসা করতে পারল না, কারণ যেটুকু জবাব দিয়েছে তাতেই বিরক্তি লক্ষ্য করেছে। অথচ ওর বেলায় যেন পুলিসের জেরা শুরু করে দিয়েছিল।

॥ সাত ॥

পাশাপাশি দুটো টালির ঘরের বাড়ি। ঘরের মেঝে শুধু সিমেন্টের। মাটির দেয়াল। সামনে উঠোন। উঠোন পেরুলে ফ্যাক্টরি। ফ্যাক্টরি বলতে টিনের চালার বড় ঘর আর একটা। তাতে গোটা দুই পুরনো তাঁত, ঝরঝরে পাওয়ার মেশিন একটা, আর তেমনি কুড়িয়ে পাওয়া গোছের আনুষঙ্গিক কিছু সরঞ্জাম। অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে নবাগতা শুধু ঘর ক'টাই দেখল।

দু ঘরের একটা ঘরে যশোমতীকে ঢুকিয়ে দিয়ে দিদিকে নিয়ে এদিকের ঘরে এলো শঙ্কর। ভাইয়ের সঙ্গে হঠাৎ এ-রকম সুশ্রী একটা মেয়েকে দেখে দিদি অবাক। তার থেকে আরো বেশি অবাক বোধহয় পাঁচ বছরের ভাগ্নে দেবরাজ ওরফে রাজু। মামাকে সে-ই আগে দেখেছে। তার সঙ্গে রমণীমূর্তি দেখে সে-ই আগে হতভম্ব হয়েছে। কিন্তু চিন্তাশক্তি তার রীতিমত চটপটে। প্রথমে যা মনে এলো তাই অবধারিত সত্যি ধরে নিল। মায়ের কাছে যেমন শোনা ছিল, অর্থাৎ মামার ঘরে একজনেরই আসতে বাকি—সে মামী। সেটাই সে ভেবে নিয়েছে তৎক্ষণাৎ। চোখ বড় বড় করে আগে যশোমতীকে দেখেছে একটু, তারপরেই ঘুরে মায়ের উদ্দেশে চিৎকার।—মা! দেখো এসে—মামা মামী নিয়ে এসেছে!

মামার মেজাজ এমনিতেই সপ্তমে চড়া। ভাগ্নের এ-রকম উত্তেজিত এবং উল্লসিত অভ্যর্থনার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না সে। চিড়বিড়

করে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে।—দেব এক চড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে, যা বেরো এখান থেকে!

মামার উগ্র মূর্তি দেখে ছেলেটা সভয়ে দুপা সরে গেল। তারপর ফ্যালফ্যাল করে অপরিচিতার দিকে চেয়ে রইল। মামার এ-রকম ক্ষেপে ওঠার মতো অন্যায়টা কি করল, বোঝার চেষ্টা। যশোমতী হতচকিতের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। সমস্ত মুখ লাল। ফুটফুটে হতভম্ব ছেলেটাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিতেও ইচ্ছে করেছে। কিন্তু ভরসা করে পারেনি।

দিদি ছেলের ডাক শুনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ততক্ষণে। বিধবা। যশোমতীকে দেখে তারও বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই। শঙ্করের তাতেও বিরক্তি। জীবনে মেয়ে যেন এই প্রথম দেখল।

ভালো করে আর একবার দেখে নিয়ে বিস্ময় সামলে দিদি অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কে···?

—বলছি। যশোমতীর দিকে ফিরে শঙ্কর বলল, আপনি ওই ঘরে গিয়ে বসুন—

বসতে বলার এই সুরটাও আর যাই হোক খুব সদয় আপ্যায়নের মতো নয়। দ্বিধান্বিত পায়ে যশোমতী দরজার পাশে জুতো খুলে সামনের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। ঘরে ইলেট্রিক নেই। এক কোণে একটা ছোট লণ্ঠন জ্বলছে। রাতে সাদাটে আলো দেখা অভ্যস্ত চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। এই আলো ঘরের অন্ধকার দূর করলেও যশোমতীর অস্বস্তি বাড়িয়েছে।

দিদিকে নিয়ে শঙ্কর পাশের ঘরে এলো। দু ঘরের মাঝের দেয়াল আর ছাদের মধ্যে দু হাত প্রমাণ ফাঁক। অর্থাৎ, দেয়ালটা একটাই বড় ঘরের পার্টিশনের মতো। ও-ঘরের কথা এ-ঘরে স্পষ্টই শোনা গেল। যশোমতী শোনার জন্য কান পেতেছেও। আর ও-ঘরে কথা যে বলছে, সে আর কেউ শুনছে কি না-শুনছে সেই পরোয়াও করে না বোধহয়।

অল্প দু-চার কথায় দাদার বাড়ি ছেড়ে মেয়েটার চাকরির চেষ্টায়

আসার ইতিবৃত্তি শেষ করল শঙ্কর। বুদ্ধি থাকলে কেউ এভাবে আসে না সেই মন্তব্যও জুড়ল। একা পথে-ঘাটে বেরোয় নি, বাসে ব্যাগ হারানোটাই তার প্রমাণ—সেই মতও ব্যক্ত করল। তারপরেই নিজের লোকসানের খেদ। দেখা হওয়ার পর থেকে শুধু খরচাই যে হয়েছে, এমন কি খবরের কাগজটাও যে খোয়া গেছে, সেই বিরক্তিও গোপন থাকল না। বলল, বাসের টিকিট কেটে দিয়েছি, ট্রেনের টিকিট কেটেছি আর জরিমানা দিয়েছি, তারপর রিকশা ভাড়া দিয়ে সমস্ত পথ হেঁটে এসেছি—বুঝলে ?

দিদির বরং সন্ত্রস্ত চাপা গলা কানে এলো যশোমতীর, চুপ কর, শুনতে পাবে যে! ভদ্রলোকের মেয়ে বিপদে পড়েছে, খরচা হয়েছে—হয়েছে।

ফলে পুরুষকণ্ঠ আরো চড়ল, শুনতে পাবে তার কি, আমি কি মিছে কথা বলছি!

এ-ঘরে দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে আছে যশোমতী। সামনে একটা চৌকিতে বিছানা পাতা। ক্লান্ত লাগলেও বসেনি।

আরো কানে এলো। দিদি বলছে, আ-হা, মুখখানা বড় সুন্দর, বেশ বড় ঘরের মেয়েই মনে হয়, ভাইটা চণ্ডাল ছাড়া আর কি! যশোমতীর মুখ লাল, বাসের ব্যাগ চোরকেই আর এক দফা ভস্ম করতে ইচ্ছে করছে তার। দিদি বলে চলেছে, রাজুর হাঁক শুনে আর দেখে আমি তো আকাশ থেকে পড়েছিলাম। বড়লোক ভাই-ভাজের কি-রকম না জানি ব্যবহার নইলে এ-ভাবে বাড়ি থেকে বেরোয়!… তার ওপর কত রকমের লোক আছে সংসারে, তুই না সেদিন কার কথা বলছিলি, কে এক ব্যবসাদার নিজের ভাইঝিকেসুদ্ধ টেনে এনে কারবারের চটক বাড়াচ্ছে আর বড় বড় লোকদের হাত করছে— এও কি ব্যাপার কে জানে, মেয়েটি খুব ভাল না হলে এ-ভাবে বেরিয়ে আসবে কেন? কে ভাই, কি-রকম ভাই তুই খোঁজ-টোজ করেছিলি?

দিদির গলা এবং সমস্ত বক্তব্য খুব কান খাড়া করেই শুনতে এবং বুঝে নিতে হয়েছে যশোমতীকে। শুনে ভুরু কুঁচকেছে, মুখও

আর এক দফা লাল হয়েছে। কিন্তু তবু ওই দিদিটিকে বেশ সরলই মনে হয়েছে তার।

একটু বাদেই ছেলে-সহ দিদি এ-ঘরে এলো। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যস্ত হয়ে বলল, তুমি দাঁড়িয়েই আছ এখনো, বোসো বোন, বোসো—তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই, নিজের দিদির কাছেই এসে পড়ছে ভাবো। সাগ্রহে আবার আপাদ-মস্তক দেখে নিল, তারপর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলল, কিন্তু দিদি হলেও গরীব দিদি, তোমার কষ্ট হবে।

সমস্ত দিনের দুশ্চিন্তার পর এই কথাগুলো যশোমতীর ভালো যেমন লাগল, লজ্জাও তেমনি পেল। দারিদ্র্যটা যে যশোমতীর চোখে বেশ বড় হয়ে ধাক্কা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অল্প হেসে বলল, কষ্ট হবে না।

আর একবার তার ঝকমকে গয়নাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে দিদি বলল, হলেই বা আর কি করবে বলো? এক কাজ করো, কুয়োতলা থেকে একেবারে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে ঠাণ্ডা হয়ে বসো। খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়, রাত না করে আগে খেয়ে নাও তারপর কথা হবে। আমার সঙ্গে এস—

লণ্ঠন তুলে নিয়ে থমকালো। —ও, তোমার তো ব্যাগও চুরি হয়ে গেছে, পরবেই বা কি···আমার তো সবই থান!

যশোমতী তাড়াতাড়ি বলল, এইটেই পরব'খন, আপনি ব্যস্ত হবেন না!

দিদির মনঃপূত হল না, বলল, রাস্তার কাপড়, তাছাড়া এই ভাল শাড়িটা নষ্ট হবে—

যশোমতী বলতে পারল না এটা তার ভালো শাড়ির মধ্যে গণ্য নয়। তবু যা-হোক কিছু বলার আগেই মহিলা এক কাণ্ড করে বসল। এ-ঘরে দাঁড়িয়েই ডাক দিল, শঙ্কর! ওরে শঙ্কর, তুই যা তো, ও-বাড়ির বাচ্চুর মায়ের কাছ থেকে একটা ধোয়া শাড়ি চেয়ে আন চট্ করে—হাত-মুখ ধুয়ে এসে মেয়েটা

পরবে কি!

হুকুম শুনে যশোমতী তটস্থ। ফলাফল পরক্ষণেই দেখল। গম্ভীর মুখে শঙ্কর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। যশোমতী মুখ দেখেই বুঝল দিদির ওপর চটেছে।

—সমস্ত দিন বাদে এসে এই রাতে এখন আমি আধ মাইল রাস্তা শাড়ি আনতে ছুটব?

দিদি বলল, তোর সবেতে বেশি-বেশি, সবে তো সন্ধ্যে পার হল, আর এখান থেকে এখানে আধ মাইল হয়ে গেল! যাবি আর আসবি, একটা শাড়ি না পেলে ও পরবে কি?

শঙ্কর সারাভাই সাফ জবাব দিল তোমার যা আছে তাই দাও। আমি এখন যেতে পারব না।

যশোমতী ব্যস্ত হয়ে আবারও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অবকাশ পেল না। মুখের কথা মুখে থেকে গেল, তার আগেই দিদিটি ক্রুদ্ধ। —মেয়েটা বাড়িতে এলো, আর আমি তাকে থান পরতে দেব! কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে তোর? নিজে না যাস, বিহারীকে পাঠা, আমার নাম করে একটা ধোয়া শাড়ি চেয়ে আনে যেন।

যশোমতী সশঙ্কে তাকাল দরজার দিকে, অর্থাৎ দরজার ওধারে যে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে। এবারে তাকেই দু'কথা শোনাবে কিনা কে জানে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল, রাজ্যের বিরক্তি সত্ত্বেও সে আর দ্বিরুক্তি না করে পায়ে পায়ে প্রস্থানই করল।

একটু চুপ করে থেকে বিব্রত মুখে যশোমতী বলল, আমি সেই থেকে খুব অসুবিধে করছি—

দিদির সাধাসিধে কথাগুলো সত্যি মিষ্টি। বলল, অসুবিধে আবার কি! তুমিই কি কম অসুবিধেয় পড়েছ! মুখের দিকে চেয়ে থমকালো একটু, শঙ্কর কিছু বলেছে বুঝি? বকা-ঝকা করেনি তো? ওর কথায় তুমি কান দিও না, ওর ওই রকমই মেজাজ—তার ওপর নড়বড়ে ব্যবসা নিয়ে নাজেহাল হয়ে হয়ে মনটা বিগড়েই আছে। নইলে এমনিতে কারো কষ্ট দেখতে পারে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর যশোমতী ঠাণ্ডা হয়ে সুস্থ মাথায় একটু চিন্তা করবে ভেবেছিল। ব্যাগটা চুরি গিয়ে তার ভাবনা কত যে বাড়িয়ে দিয়েছে ঠিক নেই। ওটা সঙ্গে থাকলে আর কিছু না হোক, কথায় কথায় এ-রকম মর্মান্তিক লজ্জাকর পরিস্থিতিতে পড়তে হত না। শঙ্কর সারাভাইয়ের দিদি ওদিকে খাবার ব্যবস্থা করতে গেছে। যশোমতীর মনে হল দেরি হচ্ছে। মুখ হাত ধোয়া হয়েছে। শাড়িও একটা হয়েছে। এখন তার রীতিমত খিদে পেয়ে গেছে। ফলে আরো খারাপ লাগছে। কিন্তু ঘড়ির দিকে চেয়ে অবাক। রাত মাত্র সাড়ে সাতটা। মনে হচ্ছিল অনেক রাত হয়েছে।

দরজার দিকে চোখ পড়তে সচকিত হল। সেখানে দাঁড়িয়ে গভীর এবং গম্ভীর মনোযোগে তাকে লক্ষ্য করছে পাঁচ বছরের ক্ষুদ্রকায় মূর্তি। রাজু। ভিতরে ঢুকতে খুব ভরসা পাচ্ছে না, কারণ এই একজনকে উপলক্ষ করেই তার কিছু অপমানের কারণ ঘটেছে। নতুন মানুষ দেখেই মায়ের উদ্দেশে ও ভাবে হাঁক দেবার ফলে মামা হঠাৎ এ-রকম তেড়ে মারতে আসতে পারে—কল্পনাও করেনি। মামা যে রকম মেজাজেই থাকুক না কেন তার সঙ্গে অন্তত এত খারাপ ব্যবহার কখনো করে না। অতএব কৌতূহল সত্ত্বেও সে খুব ভরসা করে অপরিচিতার কাছে এগিয়ে যেতে পারছে না। যদিও ইচ্ছে বেশ করছে, কারণ তার বিবেচনায় কাছে আসার মতোই লোভনীয় মনে হচ্ছে।

এমন এক পরিবেশে এসে পড়ে যশোমতীরও মুখ খুলতে সঙ্কোচ। কিন্তু ছেলেটা ভারী সুন্দর। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। মুখ না খুলে হাতের ইশারায় তাকে কাছে ডাকল। কিন্তু মনস্থির করে ছেলেটা তবু কাছে এগোতে পারল না। মামা ধারে কাছেই আছে, টের পেলে এসে দু'ঘা বসিয়েই দেবে কিনা ঠিক কি।

যশোমতী উঠে এসে হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল। চৌকির ওপর বসালো। নিজেও বসল।

—কি দেখছিলে?

তোমাকে…

আমাকে কেন দেখছিলে ?

কথায় ছেলে চটপটে বেশ। জবাব দিল, মা মামাকে বলছিল, তুমি খুব সুন্দর দেখতে।

তক্ষুনি আলাপের প্রসঙ্গ ঘোরাল যশোমতী।—তোমার নাম কি।

রাজু। তোমার নাম ?

যশোমতী আবার মুশকিলে পড়ল। একটু ভেবে বলল, আমার নাম মাসি।

খুব মনঃপূত হল না যেন। ভয়ে ভয়ে যেন যাচাই-ই করে নিতে গেল।—মামী না ?

চকিতে দরজার দিকে একবার তাকিয়ে যশোমতী মাথা নাড়ল।—না।

আর একবার তাকে দেখে নিয়ে রাজু মন্তব্য করল, মা তো বলে মামা মামী আনবে। বিহারীকাকাও বলে—

ছেলেটার মাথায় 'মামী' ঢুকে আছে। যশোমতী সঙ্কোচ বোধ করছে আবার। কানে লাগছেও কেমন। সকালে সেই বাসের থেকে এ পর্যন্ত ভদ্রলোক উপকার কম করল না। তার মেজাজের দিকে না চেয়ে কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। যশোমতী অকৃতজ্ঞ নয়। বাড়িতে কেউ তাকে এ-ভাবে চোখ রাঙালে বা ও-রকম করে তার সঙ্গে কথা কইলে হাতে মাথাই কাটত। তার সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করার কথা কেউ কল্পনাই করতে পারে না। কিন্তু তবু যশোমতী তেমন রাগ করেনি লোকটার ওপর, রাগ হলেও তা চাপতে চেষ্টা করেছে, আর কৃতজ্ঞ বোধ করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু পাঁচ বছরের শিশুর মুখেও এ-রকম অসম্ভব সম্পর্কের কথা শুনে সে অস্বস্তি বোধ করছে।…কালচারের ছিটে-ফোঁটা নেই লোকটার, সামান্য চক্ষুলজ্জারও বালাই নেই, ব্যবসা বলতে দিন আনে দিন খায় গোছের কিছু করে হয়তো। অবস্থা অনেকেরই

খারাপ হতে পারে, কিন্তু ব্যবহার যা—ইস্কুল-কলেজের মুখ দেখেছে কিনা কোনদিন সন্দেহ।

পাঁচ বছরের শিশুও ওই গোছের একটা সম্পর্ক কল্পনা করলে অস্বস্তি।

আলাপ আর জমার অবকাশ পেল না। খাবার ডাক পড়ল। দিদি নিজেই এসে ডেকে নিয়ে গেল।

সামনের বারান্দার মেঝেতে তিনটে জায়গা করা হয়েছে—ছুটো হারিকেন। শঙ্কর পিঁড়িতে বসে আছে। হাব-ভাব নরম একটু। সদয় মুখে ভাগ্নেকে ডাকল, আয়—

এই আলোয় আর এ-রকম মেঝেতে বসে খেতে হবে যশোমতীর সেটা তেমন খেয়াল ছিল না। বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে নেমন্তন্ন উপলক্ষে মেঝেতে বসে হয়তো দু-চারদিন খেয়েছে, কিন্তু এ-রকম আলোয় খেতে বসার অভিজ্ঞতা নেই। বারান্দার চারদিকে যতদূর চোখ যায় অন্ধকার বলেই ছুটো হারিকেনের আলোও একেবারে নিষ্প্রভ ঠেকছে।

তার মুহূর্তের দ্বিধা লক্ষ্য করেই দিদি জিজ্ঞাসা করল, শঙ্করের সামনে বসে খেতে তোমার লজ্জা করবে নাকি? আর তো জায়গা নেই আমাদের, একসঙ্গে না বসলে তো দেরি হয়ে যাবে—সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছ।

যশোমতী তাড়াতাড়ি বসে পড়ে বাঁচল। দিদি নিশ্চিন্ত মনে খাবার আনতে গেল। যশোমতী লক্ষ্য করল, ওদিকে মামা-ভাগ্নের মধ্যে নিঃশব্দে খোঁচাখুঁচি লেগে গেছে। ভাগ্নের মান ভাঙাবার চেষ্টায় মামা এক-একবার তার গায়ে হাত রাখতে চেষ্টা করছে, নয়তো পিঠে একবার আঙুলের খোঁচা দিয়ে অন্য দিকে তাকাচ্ছে। আর ভাগ্নে ছোট্ট শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে বা কুঁকড়ে মামার সঙ্গে অসহযোগ ঘোষণা করছে, নয়তো হাত দিয়ে মামার হাত ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত দিন বাদে বাড়িতে ঢুকেই মামা তাকে রীতিমত অপমান করেছে, এখন সাধাসাধি করলেও সে এত সহজে ভাব করতে রাজি নয়।

যশোমতীর ভালো লাগছে। ভালো লাগছে কারণ, লোকটার রুক্ষ মুখে হাসির আভাস এই বোধহয় প্রথম দেখল।

দিদি খাবার নিয়ে এলো। মোটা মোটা চালের লালছে ভাত। আর তরকারীর চেহারা দেখেও ভিতরে ভিতরে আবার অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে যশোমতী। ভব্যতা জ্ঞান তার যথেষ্ঠই আছে, কিন্তু হাতে তুলে এই সব গলাধঃকরণ করবে কি করে ভেবে পাচ্ছে না।

কিন্তু খাওয়া শুরু করতেই অন্যরকম। খিদের মাথায় মনে হল অমৃত খাচ্ছে। এই চেহারার ভাত-ডাল-তরকারী এ-রকম উপাদেয় কি করে হয় সে ভেবেই পেল না। তবু তার খাওয়ার ধরন-ধারণ দেখে দিদিটির বোধহয় খটকা লাগার কারণ ঘটল কিছু। খানিক লক্ষ্য করে শেষে বলেই ফেলল, তোমার বোধহয় অসুবিধে হচ্ছে খুব, আমাদের এইরকমই খাওয়া-দাওয়া।

যশোমতী তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। ওদিক থেকে তার ভাইটিও মাঝে মাঝে আড়চোখে তার খাওয়া লক্ষ্য করছে। পুরুষের সঙ্গে বসে খেতে বা খাওয়া নিয়ে হৈ-চৈ করতে কোনদিন এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করেনি যশোমতী। সঙ্কোচের অনুভূতিটা এই প্রথম।

খানিক বাদেই ভাই-বোনের কথাবার্তার মোড় একেবারে অন্যদিকে ঘুরে গেল। আর তাই শুনে যশোমতী অবাক মনে মনে। বাইরের একজনের সামনে যে প্রসঙ্গ তোলাটাও অস্বাভাবিক, সেই প্রসঙ্গ নিয়েই ভাই-বোনে বলতে গেলে কথা-কাটাকাটিই হয়ে গেল একপ্রস্থ। যশোমতীর মনে হল, দিদিটিরও মেজাজপত্র কোনো কোনো ব্যাপারে তার ভাইয়ের ওপর দিয়ে যায়। এই এক বিষয়ে অন্তত ভাই-বোনের প্রগাঢ় মিল। কে আছে কাছে বা কে শুনছে এ নিয়ে চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। মেজাজ চড়লে ভব্যতার এই দিকটার প্রতি তারা সচেতন নয় একজনও।

কি মনে পড়তে আহাররত ভাইয়ের দিকে চেয়ে দিদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ রে, একরাশ মালপত্র নিয়ে এলি, তার ওপর

দেরাজে আবার অতগুলো টাকা রাখলি দেখলাম, রান্নার তাড়ায় জিজ্ঞেস করতে মনে ছিল না। —অনেকগুলো টাকাই তো মনে হল—এত টাকা হঠাৎ পেলি কোথায়?

যশোমতী লক্ষ্য করল, ভাইয়ের মুখে হঠাৎ বিরক্তির ঘন ছায়া পড়েছে। প্রসঙ্গটা অবাঞ্ছিত বোঝা গেল। মুখ তুলে একবার তার দিকে তাকালো সে। তারপর খেতে খেতে ক্ষুদ্র জবাবে প্রশ্নের ইতি টানতে চাইল।—যোগাড় করেছি।

দিদি শঙ্কিত। —যোগাড় করেছিস! গলা-কাটা সুদে আবার ধার-ধোর করিসনি তো কোথাও থেকে? সেবারের কথা মনে হলে আমার এখনো গা কাঁপে।

—না। বিরক্তি চাপতে না পেরে প্রচ্ছন্ন ঝাঁঝে ক্ষুদ্র জবাব দিল শঙ্কর সারাভাই।

কিন্তু দিদিটির শঙ্কা যায় না তবু। ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে আছে। খটকা লেগেইছে, সেই সঙ্গে কিছু বোধহয় মনেও পড়ল তার। মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, মেসোমশাইয়ের কাছ থেকে আবার টাকা আনিসনি তো?

এদিকের ধৈর্য গেল। তিক্ত বিরক্ত হয়ে শঙ্কর সারাভাই বলে উঠল, এনেছি তো, না আনলে টাকা পাব কোথায়, আমাকে ধার দেবার জন্যে কে হাত বাড়িয়ে বসে আছে?

যশোমতী খাওয়া ছেড়ে উঠে পালাতে পারলে বাঁচে। বাইরের কারো সামনে এই আলাপও যে কেউ করতে পারে তার ধারণা ছিল না। কিন্তু এরপর যা শুনল, তার চক্ষুস্থির।

দিদির মুখেও বিরক্তির ছায়া ঘন হতে লাগল। ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।—ফের তুই মিথ্যে কথা বলে টাকা এনেছিস?

সঙ্গে সঙ্গে ভাই চিড়বিড় করে উঠল।—সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হলে মেসো টাকা দেবে? না কি টাকা ছাড়া চলবে? ওদিকে তো কাজ একরকম বন্ধ, সুতো নেই, মেশিন ভাঙা, ছাদ দিয়ে মাথার ওপর জল

পড়ছে—কাপড় বানানো ছেড়ে ওই তাঁতে গামছা পর্যন্ত তৈরি করা যাচ্ছে না।

দিদিটির মুখের দিকে চেয়ে ঘাবড়েই যাচ্ছে যশোমতী। হারিকেনের অল্প আলোয়ও বোঝা যায় মুখখানা তেতে উঠেছে। বলে উঠল, তা বলে তুই ভাঁওতা দিয়ে টাকা আনবি, একবার ওই করে শিক্ষা হয় নি? কালই আমি মাসিমার কাছে চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি সব!

শঙ্কর বলল, তুমি না লিখলেও দু'দিন গেলেই তারা বুঝতে পারবে।

—পারুক, তবু লিখব। ছি ছি ছি ছি, লজ্জায় মাথা কাটা গেল। না হয়, ক্ষেতের শাক-ভাত খেয়ে থাকব আমরা, টাকা মাথায় চাপলে তোর হয় কি শুনি?

ভাই হুমকি দিয়ে উঠল, খেতে দেবে, না সব ফেলে উঠে চলে যাব?

সুর নরম হওয়া দূরে যাক, সঙ্গে সঙ্গে দিদিটিরও সমান উগ্রমূর্তি। —যা দেখি কেমন আস্পর্ধা তোর। আর-একবারের সেই হাতে-পায়ে ধরার কথা ভুলে গেছিস, কেমন?

যশোমতীর দুই চক্ষু বিস্ফারিত। সে যেন চোখের সামনে নাটক দেখছে কিছু। ওদিকে ক্ষুদ্র শিশুটির কোনরকম ভাববিকার নেই। সে যেন মা আর মামার এ-ধরনের বিবাদ শুনে অভ্যস্ত। নিবিষ্ট মনে খাচ্ছে এবং এক খাওয়া ছাড়া আর কিছু তার মাথায় নেই। একটু নীরবতার ফাঁক পেয়ে বলল, মা, আর একটা ভাজি দেবে?

মায়ের এইবার খেয়াল হল বোধহয়। বাইরের মেয়ে এই ঘরের কথাবার্তা শুনে কাঠ হয়ে বসে আছে। ছেলের পাতে ভাজা দিয়ে যশোমতীর দিকে ফিরল।—কি হল, তুমি হাত গুটিয়ে বসে আছ দেখি। তুমি এ-সব শুনে কিছু মনে কোরো না বাছা—গরীবের ঘরের সতেরো জ্বালা, তার ওপর ওই অবুঝ ছেলে এমন এক-একটা কাণ্ড করে বসে যে মাথার ঠিক থাকে না।

যশোমতী আড় চোখে দেখল অবুঝ ছেলে ঘাড় গোঁজ করে

খাচ্ছে। দিদি জিজ্ঞাসা করল, আর কি দেব বলো—

যশোমতী তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, আর কিছু চাইনে

রাতের শয্যা নেবার পর আর চিন্তা করা গেল না কিছু। সমস্ত দিনের ক্লান্তি আর চিন্তার ধকলে স্নায়ুগুলো সব নিস্তেজ। কোন্ পর্যায়ের দারিদ্র্যের সঙ্গে যে এরা যুদ্ধ করছে সেটা ভাবতে ভাবতেই চোখ বুজে এলো যশোমতীর। তার আগে মনে মনে একটা ব্যাপার অনুভব করে কেমন একটু স্বস্তিও বোধ করেছে সে। ভাইটির মেজাজ যত তিরিক্ষিই হোক, বোনের কাছে টিট সে। এটা তার যেমন মন্দ লাগে নি, ছল-চাতুরী করে কোন এক আত্মীয়ের কাছ থেকে টাকা আনা হয়েছে শুনে তেমনিই আবার খারাপ লেগেছে।

শেষ রাতের দিকে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের কোণে স্তিমিত হারিকেন জ্বলছে তখনো। বাইরে কোথায় শেয়াল ডাকছে। ছোট একটা জানলা খোলা, বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাতে গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল। চোখ বুজেই বিছানায় পড়ে রইল যশোমতী। সকাল হলে কি করবে সে, মেয়ে-পাঠশালায় চাকরির চেষ্টায় যাবে? তারপর? কালই চাকরি হবে সে-রকম আশা করার কোনো কারণ নেই। চাকরি না হলে কি করবে? আবার এই দারিদ্র্যের সংসারে ফিরে আসবে? এখান থেকে যেতে হলেও টাকা লাগবে, এক-আধখানা গয়না এখানে বিক্রি করার সুবিধে হবে কিনা কে জানে। আর এত বিড়ম্বনার পর ভাগ্য যদি তার একটু ভালই হয় অর্থাৎ, মেয়ে পাঠশালায় চাকরি যদি পেয়েই যায় তাহলেই চাকরি হলেই বা কি করবে? থাকবে কোথায়? পরক্ষণে নিজেকেই আবার চোখ রাঙাতে চেষ্টা করল যশোমতী, সমস্যা তো সর্বত্রই আছে। অত ভাবলে বাড়ি থেকে বেরোতে গেছল কেন?

ভাবতে ভাবতে আবার কখন চোখ বুজে এসেছিল। চোখ খুলে দেখে সকাল। প্রথম মনে হল বাড়ির শয্যায় শুয়েই কিছু একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে উঠল সে। চোখ মেলে তাকানোর পরেও সে স্বপ্নের

রেশ কমে নি যেন। তারপরেই টের পেল স্বপ্ন নয়। কঠিন বাস্তবের মধ্যেই পড়ে আছে। বিচিত্র বাস্তব। তবু জানলার ভিতর দিয়ে দূরের আকাশ আর প্রথম ভোরের দিকে চেয়ে অদ্ভুত লাগল। প্রকৃতি যেন শুচি-স্নান করে উঠল এইমাত্র।

বিছানা ছেড়ে উঠল যশোমতী। ঘরের কোণের হারিকেনটা নিভিয়ে দিল। পরা শাড়িটা একটু গোছগাছ করে নিয়ে দরজার খিল খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

প্রথমেই যে বস্তুটা তার চোখে পড়ল, সেই বস্তুরই আর-একটার অর্থাৎ দ্বিতীয়টার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকালো সে। তারপর বিড়ম্বনার ছায়া পড়ল মুখে।

স্যাণ্ডাল। তার শৌখিন স্যাণ্ডালজোড়ার দ্বিতীয় পাটি অদৃশ্য। রাত্রিতে শোবার সময়ে ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে দরজা টেনে দিয়েছে, হারিকেনের স্বল্প আলোয় স্যাণ্ডালজোড়া চোখে পড়ে নি। অলক্ষ্যে সে দুটো বাইরেই থেকে গেছে। এখন তার একটা পড়ে আছে, আর একটা নেই। এদিক-ওদিক খুঁজল একটু। কুকুর বা শেয়ালের কাণ্ড ছাড়া আর কি!

এত সমস্যার ওপর সকালে উঠেই এই সমস্যা কার ভালো লাগে? আশায় আশায় তবু উঠোনে নেমেও নিঃশব্দে এদিক-ওদিক খানিক খোঁজাখুঁজি করল যশোমতী। উঠোনের বাইরেটাও একটু দেখল। তারপর হতাশ হয়ে ওই একপাটি স্যাণ্ডাল চৌকির আড়ালে এক কোণে পা মোছার ছালা দিয়ে নিরাপদে চাপা দিয়ে রাখল। যদি আর এক পাটির হদিস মেলে ভালো, নইলে যা গেছে তো গেছেই, আবার সেটা নিয়ে অপ্রস্তুত না হতে হয় সেই শঙ্কা।

পায়ে পায়ে বাইরে এলো। উঠোনের ওধারটায় বাগান। যশোমতী বাগানের দিকে এগুলো। সুন্দর তাজা আনাজের বাগান। বাগানে অনেক রকমের আনাজ হয়ে আছে। যা খায়, তা গাছে ফলে জানত, কিন্তু গাছের জিনিস দেখতে যে এত ভালো লাগে জানত না। বাগানের কেনা জিনিসের এক চেহারা, এগুলোর আর

এক। ওধারে বাঁধানো পুকুর একটা। আরো ভালো লাগত পায়ে স্যাণ্ডাল নেই ভুলে যশোমতী তাড়াতাড়ি সেদিকে এগুলো।

কিন্তু একটু গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল। এত সকালে পুকুরে কাউকে চান করতে দেখবে ভাবে নি। দাঁড়িয়ে চান নয়, মনের আনন্দে সাঁতার কাটছে আর জলে ভাসছে শঙ্কর সারাভাই। ঋজু, পরিপুষ্ট দেহ জলের ওপর যেন কখনো চঞ্চল কখনো বা শিথিল অবকাশ-বিনোদনে রত। যশোমতী যে ভব্যতার আবহাওয়ায় মানুষ, তার চলে আসা উচিত, ফিরে আসা উচিত। তাদের ঘরের পুরুষেরাও স্নানের পর গায়ে জামা না চড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরোয় না। কিন্তু স্থান-কাল ভুলে সে দাঁড়িয়েই রইল, আর চেয়েই রইল।

সাঁতারের পর ঘাটের কাছে এসে নিটোল পুষ্ট দুই হাতে গাত্র-মার্জনা শুরু হল। শক্ত হাতের তাড়নায় পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। প্রথম সূর্যের আলো পড়েছে লোকটার মুখে। যশোমতী আরো অবাক, গালে মুখে কালকের সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর নেই, চানের আগে এরই মধ্যে কখন দাড়ি কামানোও হয়ে গেছে। রীতিমত সুশ্রী দেখাচ্ছে ঝাঁকড়া চুলে ঢাকা মুখখানা।

পুরুষের মূর্তি…

পুরুষের এই মূর্তি কি যশোমতী আর দেখেছে?

রীতিমত সাড়া জাগিয়ে ক্ষুদ্রকায় রাজুর আবির্ভাব। হারানো প্রিয়জনের সন্ধান মিলেছে যেন।—মাসি, তুমি এখানে! আমি আর মা সেই থেকে তোমাকে খুঁজছি!

যশোমতীর সমস্ত মুখ পলকে রাঙা। আরো নাজেহাল অবস্থা ভাগ্নের কলকণ্ঠ শুনে অদূরে স্নান যে করছে সে ফিরে তাকাতে। যশোমতী পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু বিপদের ওপরে বিপদ, লোকটা হাতের ইশারায় কাছে ডাকছে। পালাবার মুখেও বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে গেল। দু'জনের কাকে যে ডাকছে ভাগ্নেকে না তাকেই—হঠাৎ ঠাওর করতে পারল না যশোমতী।

যে ডাকছে তার মুখে কোনরকম সঙ্কোচের চিহ্নমাত্র দেখতে পেল

না। এদিকে খুশির দূত ক্ষুদ্র সঙ্গীটি ততক্ষণে তার হাত ধরে ঘাটের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে—রাজুর যেন এই মুহূর্তে ওখানে না গেলেই নয়। বলছে, মামা এক ডুবে পুকুরটা এপার-ওপার করতে পারে, বুঝলে? দেখবে এসো—

না, ডাকছে ভাগ্নেকেই। যশোমতী সামনে এসে দাঁড়ানো সত্ত্বেও কোনরকম সঙ্কোচের লক্ষণ দেখল না, প্রশস্ত বুকের ওপর ভিজে গামছাটা পর্যন্ত ফেলল না। তার দিকে একবার তাকিয়ে ভাগ্নেকে বলল, চান করবি তো নাম—

মামাকে হঠাৎ এ-রকম উদার হতে দেখে ভাগ্নে অবাক একটু। পরক্ষণে আত্মহারা আনন্দে টেনে-হিঁচড়ে গায়ের জামাটা খুলে যশোমতীর হাতে দিয়ে তরতর করে জলে নেমে গেল। না মাথায় তেল, না গায়ে। জামা হাতে যশোমতী দাঁড়িয়ে রইল, ওদিকে ভাগ্নেকে উল্টে-পাল্টে চান করাতে লাগল শঙ্কর সারাভাই। তাদের দুজনেরই মুখে হাসি ধরে না।

একটু বাদে দিদিও হাজির।—দেখেছ কাণ্ড! এই সাত সকালে ছেলেটাকে ধরে চান করাতে লেগেছে!

তার মুখে কিন্তু অখুশির ছায়া দেখল না যশোমতী। রাতের বিরূপতা সকালে মুছে গেছে।

রাজুর ডাকে যশোমতী সচকিত।···মাসি তুমিও নেমে পড়ো না! সাঁতার জান না বুঝি? কিচ্ছু ভয় নেই, মামা জানে, ধরবে-'খন।

মামার ধমক শোনা গেল, ধ্যেৎ!

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দিদির প্রস্থান। যশোমতীও দ্রুত অনুসরণ করে বাঁচল।

চানের পর অবশ্য সেই দুপুরের আগে আর শঙ্কর সারাভাইয়ের দেখা পেল না যশোমতী। স্কুলে দেখা করার ব্যাপারটা আজ যদি কোনরকমে কাটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কি একটা উপলক্ষে পর পর তিন দিন ছুটি। আজও দেখা করতে যেতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু জুতোর সমস্যা। গয়না না বেচা পর্যন্ত এক জোড়া

সামাল কেনারও উপায় নেই। তাছাড়া, বলা নেই কওয়া নেই, মুখ ফুটে এই একটা নগণ্য চাকরি চাইতে যাওয়ার যে মানসিক প্রস্তুতির দরকার, তাও নেই। মোট কথা, লোকটার ও-রকম জেরায় পড়ার আগে প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করার কথা সে কখনো ভাবেও নি। স্কুলের চাকরি যদি কোথাও করতেই হয় তাহলে এখান থেকে চলে গিয়ে কোনো হাইস্কুলে চেষ্টা করাই সঙ্গত।

কিন্তু এখানে থাকার ব্যাপারেও তো চক্ষুলজ্জা কম নয়।

সেই লজ্জার অবসান দিদিটিই করে দিল। সকালে মুড়ি দিয়ে জলযোগ সারার পর সঙ্কোচ-বিনম্র মুখে সমস্যাটা দিদির কাছে যশোমতীই ব্যক্ত করল। বলল, এ-রকম শূন্য হাতে স্কুলে এখন সে দেখা করবে না, তার থেকে আপাতত বরং তার ফিরে যাওয়াই ভালো। কারণ, কাজের সুবিধে হলে তখন স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে সময় চাওয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু নানা কারণে ফেরার ইচ্ছে তার একটুও নেই, অনেক রকম ঝামেলায় পড়ার সম্ভাবনা। এখন দিদি যদি তার এক-আধখানা গয়না বিক্রি করার ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়—তারপর সে ভেবে-চিন্তে যাহোক ঠিক করতে পারে। এ-সব গয়না তার দাদার দেওয়া নয়, বাবার দেওয়া আর হাতের টাকা চুরি গেছে যখন দুই-একখানা গয়না বিক্রি তো করতেই হবে, ইত্যাদি।

দিদি তার মুখের দিকে চেয়ে চুপচাপ শুনল। গায়ের গয়না লক্ষ্য করল। হাত দিয়ে হীরে-বসানো বালা দুটো নেড়েচেড়ে দেখল একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবা খুব বড় অবস্থার লোক ছিল বুঝি?

ছিল শুনে যশোমতীর ভিতরটা খচ করে উঠল, ঢোঁক গিলে মাথা নাড়ল।

দিদি আবার বলল, এ-সব গয়না একখানাও কেনার লোক নেই এখানে। বিক্রি করতে হলে ট্রেনে চেপে ফিরে আবার শহরেই যেতে হবে। কিন্তু বাবার দেওয়া জিনিস তুমি বিক্রিই বা করতে চাও

কেন? যে ক'দিন দরকার এখানেই থেকে চাকরির চেষ্টা করো, অবশ্য আমাদের এই গরীবের ঘরে তোমার খুব কষ্ট হবে।

যশোমতী তাড়াতাড়ি বাধা দিল, ও-কথা বার বার বললে আমাকে চলেই যেতে হবে দিদি, আমি যে অবস্থায় পড়েছি তার তুলনায় এ তো স্বর্গ।

দিদিটি মনে মনে খুশি হল। এরই মধ্যে একটা অভিলাষ তার মনে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে সেটা আর কেউ জানে না। ধীরে সুস্থে তার আগে অনেক কিছু জানার আছে, খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করার আছে।...হয় যদি ছোঁড়ার ভাগ্য। বলল, তাহলে আর কি, তুমি নিশ্চিন্ত মনে চাকরির চেষ্টা দেখো, তারপর শঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ করে যা-হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে, আর তোমার কি লাগবে তুমি আমাকে বোলো, বিহারীকে দিয়ে আনিয়ে দেব—তোমার হাতে টাকা এলে তখন শোধ করে দিও।

যশোমতী মাথা নাড়ল বটে, কিন্তু ব্যবস্থাটা মনঃপূত হল না খুব। টাকা কিছু হাতে এলে খরচ-বাবদ জোর করে দিদির হাতে কিছু গুঁজে দিতে পারত। তাহলে ওই একটা লোকের কাছে অন্তত সম্মান বাঁচে। আত্মীয়ের কাছ থেকে যে-ভাবে ধাপ্পা দিয়ে টাকা সংগ্রহ করেছে শুনলো গত রাত্রিতে, তাতে ভাগ বসাবার রুচিও নেই ইচ্ছেও নেই। যার কাছে টাকার এত দাম, কোনো একসময় তাকে দিয়েই গয়না বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারবে ভেবে তখনকার মতো এ নিয়ে আর কথা বাড়ালো না যশোমতী।

মুখ কাঁচুমাচু করে পরের সমস্যার সম্মুখীন হল সে। বলল, কিন্তু আজই স্কুলে দেখা করতে যাব? ...শরীরটা তেমন ভালো লাগছে না।

—তাহলে যেও না, আজই ছুটতে হবে তোমাকে কে বলেছে? স্কুলের লোকের সঙ্গে শঙ্করের আলাপও আছে, সে-ই না হয় তোমাকে নিয়ে যাবে'খন।

কিন্তু না গেলে শঙ্করবাবু যদি রাগ করেন?

ওর রাগের কথা ছেড়ে দাও, ওর রাগ আর রাজুর রাগ একরকমই।

বসে দিদিটির সঙ্গে গল্পে গল্পে আরো কিছু খবর জানা গেল এরপর। ফলে যশোমতীর আশা বাড়ল, কিছু সঙ্কোচও দূর হল। যেমন, মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলটাকে হাইস্কুল করার চেষ্টা হচ্ছে। হয়ে যাবে হয়তো শিগগীরই। অনেকে এ-জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। আর ছোটখাট গানের স্কুলও আছে এখানে একটা—সেটাকে বড় করে তোলার খুব তোড়জোড় চলছে, কারণ, এই দেশে তো গানের ভক্ত বলতে গেলে সবাই। কে একজন নাকি মোটা টাকা দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। দিদির অবশ্য ও-সব গান খুব ভালো লাগে না, দুই-একটা ঠাকুর-দেবতার গান শুনলে বরং কান জুড়োয়।

যশোমতী ভালো করে বুঝে নিয়েছে, এই দিদিটিকে হাত করতে পারলে তার অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। অতএব সেই চেষ্টাই সর্বাগ্রগণ্য মনে হল তার। তক্ষুনি সবিনয়ে প্রস্তাব করল, আমি কিছু কিছু জানি দিদি, ঠাকুরের নাম করব একটু?

দিদি তাকালো আর সানন্দে মাথা নাড়ল। গলা না ছেড়েই একখানা ভজন গাইল যশোমতী। দরদ দিয়েই গাইল। গান শেষ হতে দিদি হাঁ, ক্ষুদ্র রাজু হাঁ—আর অদূরে দাঁড়িয়ে বিহারী চাকরও মুগ্ধ। দিদি তো পারলে জড়িয়েই ধরে তাকে, বলল, আ-হা, এমন গুণের মেয়েকে কিনা চাকরির জন্যে ঘর ছেড়ে বেরুতে হয়েছে—তোমার দাদা মানুষ না কি!

গোবেচারী মুখ করে বসে রইল যশোমতী। দিদিটির মন দখলের ব্যাপারে আর একটা বড় ধাপ উত্তীর্ণ হওয়া গেল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতঃপর দিদির গল্প শোনায় মন দিল সে। এই জমি-জমা আর ঘরের মালিক দিদি নিজে। তার জমিতে ওই ফ্যাক্টরির ঘরটা শুধু শঙ্করের তোলা। এই সবই দিদির স্বামীর ছিল। জমি যা আছে তাই থেকে বছরের ধান এসে যায়, আর বাগানের তরি-তরকারী তো আছেই। কাজেই খাওয়ার ভাবনা তাদের খুব নেই।

শুনে মস্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল যশোমতী। এক অপ্রিয় প্রসঙ্গও মনে পড়েছে তক্ষুনি। মনে হয়েছে আত্মীয়ের কাছ থেকে লোকটার ধাপ্পা দিয়ে টাকা আনার কারণ তাহলে নিছক অনটনের দরুন নয়। আসলে স্বভাব আর টাকার লোভ। সকালে চানের ঘাটে যে দৃশ্য মিষ্টি অনুভূতির মতো মনে লেগে ছিল, তার ওপর বিরূপ ছায়া পড়-পড় হল একটা।

নিজের গল্প থেকে ক্রমে ভাইয়ের অর্থাৎ শঙ্কর সারাভাইয়ের প্রসঙ্গের দিকে ঘুরল দিদি। আর সেই বিরূপ ছায়াটা নিজের অগোচরেই সরে যেতে লাগল যশোমতীর মন থেকে। দিদির কথার সারমর্ম, ওই ভাইকে নিয়েই হয়েছে তার জ্বালা। এক দিদি ভিন্ন তাকে সামলাতে পারে এমন কেউ নেই। বি. এসসি. ভালো পাস করেছে, ভালো মাথা—ইচ্ছে করলেই একটা ভালো চাকরি করে সুখে থাকতে পারত, মেসো তো কতবার চাকরি নিয়ে সাধাসাধি করেছে—কোন্ এক মস্ত কাপড়ের কলে বড় চাকরি করে মেসো—তা ছেলে গোলামী করবে না কারো। আর যে মেজাজ, চাকরি করবে কি করে! নিজের নড়বড়ে ব্যবসা নিয়ে মেতে আছে, তিনদিন চলে তো চারদিন সব বন্ধ থাকে। একটু ভালো অর্ডার হাতে এলেই কি করে টাকা যোগাড় করবে সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে। মূলধন না থাকলে অর্ডার পেলেই তো আর সাপ্লাই করা যায় না। তখন আর ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকে না। ব্যবসা করে বড় হবে দিন-রাত খালি এই স্বপ্ন দেখে। বাবার আমলে উড়নচণ্ডী ছেলে ছিল, কিন্তু ব্যবসা শুরু করার পর থেকে একটা পয়সাকে সোনার চোখে দেখে।

দিদি যে মুখ করেই বলুক, ভাইয়ের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর এই চেষ্টাটাকে খুব ছোট করে দেখে বলে মনে হল না। বলা বাহুল্য, যশোমতীর ভালো লেগেছে, সবটুকুই কান পেতে শুনেছে। গত রাত্রিতেও লোকটার শিক্ষা-দীক্ষা আছে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল তার।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে দুপুরে রাজুর হাত ধরে ফ্যাক্টরি দেখতে চলল সে। দুপুরে মানুষটা খেতেও আসে নি, বিহারী তার খাবার নিয়ে গেছে ওখানে। শুনেছে, কাজে মন দিলে এই রকমই নাকি হয়।

ফ্যাক্টরি বলতে টিনের শেড দেওয়া ওই জায়গাটুকুই। কাপড় বানানোর ব্যবসা শুনেই যশোমতীর আরো বেশি কৌতূহল হয়েছিল। কিন্তু ভিতরের দশা দেখে তার চক্ষুস্থির। বাবার যে বিশাল মিল দেখে সে অভ্যস্ত সেই চোখে এটা দেখে তার হেসে সারা হওয়ার কথা। যশোমতী হেসেই ফেলেছিল প্রায়। কিন্তু তারপরেই তার দুঃখই হল একটু। এমন করেও কেউ অনর্থক উদ্যম নষ্ট করে!

শঙ্কর সারাভাই একবার দেখল তাকে। কিন্তু ভালো করে তাকানোর ফুরসত নেই। সে তখন কাজে ব্যস্ত। সর্বাঙ্গ দর-দর করে ঘামছে। গায়ে হাত-কাটা গেঞ্জি, পরনে আধময়লা পা-জামা। সে একাই মালিক আর একাই প্রধান শ্রমিক। সাহায্যের জন্য আছে পুরানো সাগরেদ বিহারী।

যশোমতী দেখছে চেয়ে চেয়ে। তার বাবার কলে শ'য়ে শ'য়ে লোক খাটতে দেখেছে। কিন্তু মেহনতী মানুষের এই মূর্তি সে যেন আর দেখে নি। পাওয়ার মেশিন চলছে, ভারী ভারী সরঞ্জাম নিজেই টেনে টেনে তুলছে, পরিপুষ্ট দুই বাহুর পেশীগুলো লোহার মত উঁচিয়ে উঠছে এক-একবার।

আর নিষ্পলক চোখে পুরুষের রূপ দেখছে যশোমতী। কাজের সময় ক্ষুদ্রকায় চঞ্চল ভাগ্নেটি পর্যন্ত চুপ! এ সময় বিরক্ত করা চলবে না, মামা তাহলে রেগে যায়—সে-সম্বন্ধে যশোমতীকে সে আগেই সতর্ক করে রেখেছিল। কলের মূর্তির মতো মুখ বুজে এটাসেটা এগিয়ে দিচ্ছে বিহারী।

অনেকক্ষণ বাদে হয়তো একটু বিশ্রাম নেবার জন্যই গামছায় ঘাম মুছতে মুছতে শঙ্কর সারাভাই নিস্পৃহ মুখে যশোমতীর সামনে এসে দাঁড়াল। হাতল-ভাঙা একটা কাঠের চেয়ার দেখিয়ে বলল, বসুন।

বসার মত ঘরে আর দ্বিতীয় কিছু নেই।

যশোমতী বসল না, হাসিমুখে চেয়ারটার গায়ে একটু ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ফ্যাক্টরি প্রসঙ্গে দুটো প্রশংসার কথা বললে হয়তো খুশি হবে, কিন্তু বলার মতো কিছু মাথায় এলো না। সে-চেষ্টার আগেই ভাগ্নেটি একটা সুসমাচার জ্ঞাপন করল মামাকে। সোৎসাহে বলে উঠল, মামা, মাসি বলেছে আমাকে একটা সত্যিকারের কলের মোটরগাড়ি কিনে দেবে আর একটা সত্যিকারের তিন চাকার সাইকেল কিনে দেবে!

গেল বছর মায়ের সঙ্গে সাবরমতীর দেব-উঠি-আগিয়ারস্-এর মেলায় গিয়ে সেই বড় শহরের দোকানে এই দুটি দুর্লভ জিনিস দেখার পর দুনিয়ায় এর থেকে বেশি কাম্য জিনিস আর কিছু নেই মনে হয়েছে রাজুর। অন্তরঙ্গ আলাপের ফাঁকে সেটা বোঝামাত্র অবস্থা ভুলে যশোমতী তাকে কথা দিয়ে বসেছিল ওই দুটো জিনিসই কিনে দেবে।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সমাচারটা বেখাপ্পা শোনালো। আরো বেখাপ্পা শোনালো এই জন্যে যে, ভাগ্নের আনন্দ দেখে মামাটি যে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকালো যশোমতীর দিকে, তার অর্থ, সে যেন এই হাস্যকর ব্যবসাকে বড় মিলে দাঁড় করানোর থেকেও অসম্ভব কিছু আশ্বাস দিয়েছে ওই শিশুকে। এখানে এসব কথা নিয়ে উৎসাহ বোধ করার সময় কম তার। তবু টিপ্পনীর সুরেই জিজ্ঞাসা করল, সকালে স্কুলে দেখা করতে না গিয়ে বেশ গান-টান করলেন শুনলাম।

একে ভাগ্নের আনন্দ-সমাচারের জবাবে ওই চাউনি, তারপর এই উক্তি। শোনামাত্র যশোমতীর ভিতরটা চিড়বিড় করে উঠল। আবার হাসিও পেয়ে গেল পরমুহূর্তে। ভদ্রলোকের অন্য রকম ভাবা অন্যায় কিছু নয়। তবু হালকা জবাব দেবার লোভ ছাড়া গেল না। গম্ভীর সে-ও। বলল, দিদি আমার গানের খুব প্রশংসা করছিলেন, আর ওই বিহারীরও খুব ভালো লেগেছে। আপনি তো শুনলেন না—

শঙ্করের ভালো লাগার কথা নয়, ভালো লাগলও না। মন আপাতত নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন। মেসোর কাছ থেকে যে টাকা এনেছে তার অনেকটাই অবশিষ্ট আছে এখনো। কাজের মধ্যেও তাই সকাল থেকে নতুন চেষ্টার ছক কাটছিল মনে মনে। যা ভাবছে তা করতে হলেও এ-টাকার কম করে বিশগুণ দরকার। তার ভগ্নাংশও পাওয়ার আশা দুরাশা। তবু মাথা খাটিয়ে এই টাকা দিয়েই আরো টাকা আনা যায় কিনা সেই অসম্ভব চিন্তাই তার মাথায় ঘুর-ঘুর করছে কেবল। তাই যশোমতীর কথায় কান গেল বটে, মন গেল না।

হালকা উক্তির কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে যশোমতী আর এক ধাপ এগলো। —স্কুলেই বা দেখা করতে যাই কি করে, কোথায় কি, আমি কিছু চিনি না জানি? সমস্ত দিনের মধ্যে আপনার তো দেখাই পাওয়া গেল না।

—তা আমি কি করব?

—দিদি বলছিলেন, আপনার চেনা-জানা আছে, যখন হয় আপনি নিয়ে যাবেন।

—আমি? আমি এখন আপনাকে নিয়ে নিয়ে চাকরির জন্যে ঘুরব? আমার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই!

—কি কাজ?

শঙ্কর সারাভাই নিজের মধ্যে ফিরে এলো এতক্ষণে। অর্থাৎ পিত্তি জ্বলার উপক্রম হল তার। গম্ভীর মুখে জবাব দিল, দাদার মাথা খারাপ হয়েছে। যা পারেন নিজে করুন গে, আমার দ্বারা আর কিছু হবে না; বুঝলেন? যথেষ্ট হয়েছে—

তার প্রতি পুরুষের এ-রকম নিস্পৃহতা এই বোধ করি প্রথম দেখছে যশোমতী। দিদির সঙ্গে সমস্ত সকাল গল্প করে মেজাজ কেন যেন অতিরিক্ত প্রসন্ন তার। এখনো কৌতুকই বোধ করল। ভালো মুখ করে বলল, কি যথেষ্ট হয়েছে? হবার মধ্যে তো আপনার দশ পয়সা বাস-ভাড়া খরচা হয়েছে আর ছ'আনা না আট আনা ট্রেনের

টিকিট ভাড়া—

তিনটাকা ছ আনাকে ইচ্ছে করেই ছ' আনা আট আনায় দাঁড় করালো যশোমতী। আর হাতে-নাতে প্রত্যাশিত ফলও পেল। রুক্ষ জবাব শুনল, কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে ওইটুকুর জন্যেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আপনি মস্ত বড়লোক বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার কাছে ওই ছ'আনা আট আনারই অনেক দাম, বুঝলেন?

দুই ঠোঁটে হাসি চেপে মুখখানা যতখানি নিরীহ করে তোলা যায় সেই চেষ্টাই করছে যশোমতী। গতকাল বাস থেকে এ পর্যন্ত তিরিশ ঘণ্টাও পার হয় নি, তবু এ-রকম বিচিত্র যোগাযোগের ফলেই হয়তো অনেক স্বাভাবিক সঙ্কোচ অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে সে। পরিবেশ গুণে আর লোকটার মেজাজের গুণেও হয়তো সহজ হওয়া আরো সহজ হয়েছে। অম্লানবদনে বলে বসল, কিন্তু সেও তো আপনার নিজের নয়, কোন্ আত্মীয়ের কাছ থেকে ভাঁওতা দিয়ে টাকা এনেছেন শুনলাম।

ব্যস্, মামার এই মূর্তি দেখে ক্ষুদ্র ভাগ্নেটি পর্যন্ত মনে মনে শঙ্কিত। শঙ্কর সারাভাইয়ের গম্ভীর দৃষ্টি অদূরবর্তিনীর মুখের ওপর কেটে বসল যেন।—এ-রকম বলার মতো পরিচয় আপনার সঙ্গে আমার এখনো হয় নি বোধহয়।

যশোমতী ভয় পেয়েই মাথা নাড়ল যেন। বলল, না এখনো হয় নি। 'এখনো' কথাটার ওপর সামান্য একটু জোরও পড়ল।

শঙ্কর সারাভাইয়ের মেজাজ ঠিক রাখা শক্তই হয়ে উঠছে। খুব স্পষ্ট করে যশোমতীর কর্তব্য বুঝিয়ে দিল সে।—তাহলে আপনি দয়া করে এ-সব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, নিজের ব্যবস্থাটা যত তাড়াতাড়ি হয় সেই চিন্তা করুন গে।

যশোমতী এবারও মাথা নাড়ল, অর্থাৎ তাই করবে। রুষ্ট গাম্ভীর্যে তাকে লক্ষ্য করে ভদ্রলোক কাজের দিকে পা বাড়াবার উদ্যোগ করতেই যশোমতী আবার বাধা দিল, কিন্তু একজন বিপন্ন মহিলার সঙ্গে আপনিও তো ভালো ব্যবহার করছেন না। শঙ্কর

সারাভাইর সপ্রশ্ন চোখে চোখ রেখে গম্ভীর মুখে বলল, দিদির কাছে শুনলাম এখানে নাকি গানের স্কুলও হবে একটা আর প্রাইমারি স্কুল হাইস্কুল হয়ে যাবে—এ-সব খবর আপনি বলেন নি তো।

—হাইস্কুল হবে তাতে কি?

—হলে প্রাইমারিতে ঢুকব কেন?

জবাবে শঙ্কর সারাভাই ঠেস দিয়ে বলল, হাইস্কুলে চাকরি করতে হলে কোয়ালিফিকেশনও একটু হাই হওয়া দরকার, বুঝলেন? প্রাইমারির কোয়ালিফিকেশনে হয় না—

—কি রকম হাই হওয়া দরকার, ডক্টরেট-টক্টরেট?

বিরক্তি সত্ত্বেও কথার ধরনে কেমন খটকা লাগল শঙ্করের। এ যেন ঠিক সামান্য পড়াশুনা করা মেয়ের উক্তি নয়। ফিরে আবার দেখল একটু।—আপনি কি পাস?

—আপনার থেকে একটু বেশিই হবে—ফিলসফি অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেছিলাম, এবারে এম. এ. দেবার কথা ছিল। এতে হাই-স্কুলের চাকরি হবে না?

বিশ্বাস করবে কি করবে না শঙ্কর সারাভাই ভেবে পেল না কয়েক মুহূর্ত। খোঁচা খেয়েও মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। সেই অবকাশে দিদির আবির্ভাব। যশোমতী সচকিত। ওদিকে মাকে দেখামাত্র রাজু মামার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল, মা মাসির সঙ্গে মামা ঝগড়া করছিল!

ঠোঁটের ফাঁকে হাসি এসেই গেল এবারে যশোমতীর। আর রাগতে গিয়ে শঙ্করও হেসে ফেলল। ওদিকে দিদি দুজনকেই নিরীক্ষণ করল একবার। তার কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল, ভাই আগে থেকেই হয়তো বা চেনে এই মেয়েকে, তাই বিপদে পড়েছে শুনে একেবারে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। ঝগড়ার কথা শুনে সন্দেহটা আরো পাকা হল।

হেসে বলল, তোরই তো মামা, ঝগড়া করবে না? কি হয়েছে?

প্রশ্নটা যশোমতীর দিকে চেয়ে। যশোমতী হাসিমুখেই মাথা নাড়ল, কিছু হয় নি। শঙ্কর ভাগ্নের উদ্দেশে চোখ পাকালো, এই পাজী, কি ঝগড়া করেছি?

দিদি মন্তব্য করল, বলেছিস কিছু নিশ্চয়, নয়তো ও বলবে কেন? ভালো কথা, যা বলতে এলাম—তোর কাজ শেষ হয়েছে না হয় নি?

—কেন? শঙ্কর সন্দিগ্ধ।

—একবার বাজারে বেরুতে হবে না? লীলার জন্যে একজোড়া শাড়ি কিনে নিয়ে আয়, ওই একখানা শাড়িতেই চলবে নাকি, তাও ভালো শাড়ি—লোকের সঙ্গে দেখাশুনা করার জন্যেও ওটা তুলে রাখা দরকার। বাড়িতে পরার জন্য তুই একজোড়া কিনে নিয়ে আয়, তারপর তোর সময়মতো নিজে হাতে আর একজোড়া ভালো শাড়ি বানিয়ে দিস। বক্তব্য শেষ করে দিদি যশোমতীর দিকে ফিরল। ভাইয়ের প্রশংসা করতেও কার্পণ্য করল না। বলল, ইচ্ছে করলে ও নিজেই খুব ভালো শাড়ি বানাতে পারে, দেখবে'খন—

সে-ই যে লীলা নিজেরই খেয়াল ছিল না। খেয়াল হতে সঙ্কোচে আড়ষ্ট। আর দিদির কথা শোনার পর যে মুখ হল ভদ্রলোকের, তাও দেখার মতই।

শঙ্কর সারাভাই আকাশ থেকেই পড়ল বুঝি। চিরাচরিত অনুভূতিটা সামলে নিতে সময় লাগল একটু। গম্ভীর মুখে একবার যশোমতীর দিকে তাকিয়ে দিদির মুখোমুখি হল সে। —দু' জোড়া মানে চারটে শাড়ি লাগবে? তা কত দিনের ব্যবস্থা?

ভাইয়ের মেজাজ তেতেছে বুঝেছে, কিন্তু বক্তব্যটা কি দিদির ঠিক বোধগম্য হল না। জিজ্ঞাসা করল, কি বলছিস?

—বলছি, উনি কতদিন থাকবেন এখানে?

এ ধরনের উক্তির সঙ্গে দিদি পরিচিত। কিন্তু ইচ্ছে করেই অর্থাৎ সব জেনে-শুনেও মেয়েটাকে লজ্জা দিচ্ছে ভেবে বিরক্তও। বলল, তোর যেমন কথার ছিরি, কাজের চেষ্টায় নিয়ে এলি আর ভালো রকম

চেষ্টা-চরিত্র না করেই ওই দাদার বাড়িতে ফিরে যাবে আবার! নাকি গেলে ওই দাদা এরপর আর একটুও ভালো ব্যবহার করবে ওর সঙ্গে? ব্যবস্থার কথা তোকে কিছু ভাবতে হবে না, লীলার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে—তোকে যা বললাম্ কর, টাকা আমিই দেব'খন, খরচের কথা শুনলেই তোর ভদ্রতাজ্ঞান পর্যন্ত থাকে না।

দিদি চলে গেল। শঙ্কর সারাভাই তখনো ভেবে পেল না, মাত্র একদিনের পরিচয়ের এক বিপদগ্রস্ত অজানা মেয়ে দিদির এরকম আপন হয়ে গেল কি করে। দু-চার মুহূর্ত আবার তাকে নিরীক্ষণ করে কাজের দিকে এগিয়ে গেল সে।

যশোমতী বিব্রত বোধ করছে বটে, আবার পরিস্থিতিগুণে মজাও পাচ্ছে। রাজুর হাত ধরে পায়ে পায়ে সে-ও সেদিকে এগলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে কাজের বহর দেখল একটু সে-যে আবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করেও করছে না। অতএব যশোমতী তাকে ডেকেই বলল, শুনুন, এভাবে আপনাদের ঘাড়ের ওপর বসে থাকার ইচ্ছে সত্যিই আমার নেই—যদি সরাতে চান তো আগে আমার একটা কাজের যোগাড় করে দিন। যে-ভাবে চলে এসেছি, বাড়ি ফেরা সত্যিই আর এখন সম্ভব নয়। আর, আপনাকে একটা কথা বলছি, ঋণ রাখার আমার অভ্যেস নেই, আপনারা যা করেছেন সেটা অবশ্য শোধ করা যাবে না—কিন্তু টাকার ঋণ থাকবে না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

টাকার প্রসঙ্গ উঠতে শঙ্কর উষ্ণ হয়ে উঠল, কারণ, এটা সে ঠেস বলেই ধরে নিল। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। তার আগেই রাজুর হাত ধরে মন্থর পায়ে প্রস্থান করল যশোমতী। কাজ ফেলে শঙ্কর সারাভাই সেদিকে চেয়েই রইল। মেয়েটির কথাবার্তা হাব-ভাব, আচরণ সবই অদ্ভুত লাগছে তার। ইচ্ছে থাকলেও খুব যেন অবজ্ঞা করা যায় না। এম. এ. পরীক্ষা দেবার কথা ছিল শোনার পর আরো ধাঁধায় পড়ে গেছে সে। অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করার পর শহর ছেড়ে চাকরির খোঁজে এ-রকম একটা জায়গায় আসবে

কেন! হতে পারে দাদার কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়, তাহলেও মেয়েদের হাইস্কুল তো অনেক জায়গাতেই আছে, তার বদলে এলো প্রাইমারি স্কুলের চাকরির চেষ্টায়।

শঙ্করের সবই দুর্বোধ্য লাগছে।

কাজে আর মন বসল না। জোরালো আলোর অভাবে ভালো করে বিকেল না হতে এখানকার আলোয় টান ধরে। বিহারীকে সব গুছিয়ে রাখতে বলে সাবান হাতে পুকুর ধারে চলে এলো। মুখ-হাত ভালো করে ধুয়ে ঘরে ফিরল। রাজুর বা তার ভুইফোঁড় মাসির কাউকে এদিকে দেখল না। জামা-কাপড় বদলে বেরিয়ে পড়ল সে। দুই একজনের সঙ্গে দেখা করে, লাভের অংশ দিয়েও যদি কিছু টাকা আনতে পারে।

সুরাহা হল না। টাকা দেবার নামেই মাথায় আকাশ ভাঙে সকলের। তবু সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরল যখন, একজোড়া শাড়ি হাতে করেই ফিরল। কিন্তু দাওয়ায় ঢোকার আগেই গান কানে এসেছে। ভক্তিমূলক গান। শঙ্কর দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল। ব্যবসা নিয়ে নাকানি-চোবানি খাবার পর থেকে মন দিয়ে একটা আস্ত গানও কখনো শুনেছে কিনা সন্দেহ। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এই গান যেন স্নায়ু-জুড়ানো স্পর্শের মতো। এই অনুভূতিটা নতুন। দিদির অনুরোধেই আর একখানা গানও হল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শঙ্কর সেটাও শুনল।

তারপর ভিতরে এসে দাঁড়াল। ঘরের বাইরের দাওয়ায় বসে গান হচ্ছিল। শুধু দিদি আর রাজু নয়, সমঝদার শ্রোতার মতো অদূরে বিহারীও বসে গেছে।

তাকে দেখে দিদি বলল, তুই তো একবারও শুনলি না, আহা, বোনের আমার খাসা মিষ্টি গলা, আর কি দরদ! ওকে একখানা শোনাও না।

যশোমতী হাসিমুখেই অনুরোধ নাকচ করে দিল, বলল, গান সকলের ভালো লাগে না দিদি, আজ থাক্।

ওদিক থেকে বিহারী উঠে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করল, দাদাভাই ছেলে-বেলায় খুব গলা ছেড়ে গান করত, আধমাইল দূর থেকে শোনা যেত। বড় হয়ে গান ভুলেছে।

দিদি হেসে উঠল।—সত্যি, কি গানই করত, কান ঝালাপালা। কাপড় আনলি?

পুঁটলিটা দিদির হাতে দিয়ে শঙ্কর চুপচাপ ঘরে ঢুকে গেল। দিদি সেটা খুলে হারিকেনের স্বল্প আলোয় শাড়ি-জোড়া আগে পরখ করে নিল, রাগের মাথায় কি এনে হাজির করেছে সেই সংশয়। দেখে অপচ্ছন্দ হল না। শাড়ি জোড়া যশোমতীর দিকে এগিয়ে দিল।—নাও।

রাজ্যের সঙ্কোচ আবার। তবু হাত বাড়িয়ে নিতে হল শাড়ি-জোড়া। না নিয়েই বা করবে কি। কিন্তু নেবার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত রোমাঞ্চকর অনুভূতি কি একটা। জীবনে পাওয়ার দিকটা তার এত প্রশস্ত যে সামান্য দু'খানা আট-পৌরে শাড়ি হাতে নেবার এই প্রতি-ক্রিয়া নিজের কাছেই বিস্ময়কর।

ঘরে বসে ভাবছে যশোমতী। কপাল-গুণে একটা ভালো জায়গাতেই সে এসে পড়েছে। কিন্তু বাড়ি-ঘর ছেড়ে এসে মাঝখান থেকে এই জায়গায় সে আঁকড়ে পড়ে থাকবে? কি করবে? চাকরি পেলেই বা থাকবে কোথায়?

—লীলা, খেতে এসো। ওদিক থেকে দিদির গলা কানে এলো।

যশোমতী আবারও খেয়াল করল না যে এখানে সে লীলা হয়ে বসেছে।...ভাবছে দুপুরের দিকে ওদিকের কোন্ বাড়ির বউ এসেছিল—যার কাছ থেকে শাড়ি ধার করা হয়েছিল। শাড়ি চেয়ে পাঠানোর ফলেই আসার কৌতূহল হয়েছিল কিনা কে জানে। যশোমতীকে দেখে অবাকই হয়েছিল বউটি, জিজ্ঞাসাও করেছিল, কে। দিদি তার সামনেই চট করে পরিচয় দিয়েছিল, তাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। স্কুলে চাকরির চেষ্টায় এসেছে—

কিন্তু আত্মীয় হলেও বা চাকরির চেষ্টায় এলেও এক, শাড়ি নিয়ে

কেউ এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় আসে কেমন করে তাই বউটির কাছে খুব স্পষ্ট হয় নি।

—লীলা, খাবে এসো।

দিদির দ্বিতীয়বারের ডাকও কানে গেছে। কিন্তু সেই-ই যে লীলা, এই ভাবনার মধ্যে পড়ে এবারেও সচেতন হল না। নিজের এলোমেলো চিন্তায় তন্ময় সে।…গত রাত্রিতে এই ঘরে একা থাকতে তার কেমন ভয়-ভয় করছিল। আজ ভাবছে দিদিকে বলে রাজুকে এ ঘরে নিয়ে আসবে কি না। তাছাড়া আর একটা কথা ভেবেও তার সঙ্কোচ হচ্ছে। ওই ভদ্রলোকের ঘর এটা, সে ঘর দখল করার ফলে ঘরের মালিককে তার ফ্যাক্টরির ঘরে বিহারীর সঙ্গে জায়গা করে নিতে হয়েছে। কিন্তু দিদির ঘরে গিয়ে ভাগাভাগি করে থাকতেও মন সায় দেয় না। কি করবে যশোমতী?

—লীলা, খাবে না? দোরগোড়ায় দিদি এসে দাঁড়িয়েছে।

ধড়মড় করে চৌকি ছেড়ে নেমে দাঁড়াল যশোমতী। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমাকে বলছেন?

দিদি বিস্মিত। আর যশোমতী মনে মনে অপ্রস্তুতের একশেষ। নিজের নতুন নাম নিয়ে তৃতীয়বার গণ্ডগোল। দিদি সস্নেহে বলল, কি অত আকাশ-পাতাল ভাবছ? এসে যখন পড়েছ—সব ঠিক হয়ে যাবে, খাবে এসো।

বাইরে এসে দেখল, ভদ্রলোকটিও খাওয়ার আসনে বসে নিঃশব্দে তাকে লক্ষ্য করছে। অর্থাৎ, সে যে বিলক্ষণ ভাবনা-চিন্তার মধ্যে পড়েছে ধরে নিয়েছে। নাম নিয়ে গণ্ডগোলটা মাথায় আসার কথা নয় বলেই রক্ষা।

আগের দিনের মতই খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল যশোমতীর। পাশে রাজু শুয়ে, তাকে ঠেলে তুলল। তারপর মুখ হাত ধুয়ে দু'জনে চলল, বাগান পেরিয়ে পুকুরঘাটের দিকে। রাত্রিতেই রাজুর কাছে শুনেছিল, মামা রোজ ওই সময়ে পুকুরে চান করে।

শুধু এটুকু দেখার জন্যেই যে আসা, সেটা স্বীকার করতে যশোমতীর নিজের কাছেই লজ্জা।

আজকের দেখাটা আরো একটু সহজ হল। চান যে করছে তার যখন ভ্রূক্ষেপ নেই, সে মাঝখান থেকে লজ্জা পেতে যায় কেন। আজও মামা-ভাগ্নের ঘটা করে চান হল। যশোমতী দেখছে, হাসছে —তার ভালো লাগছে।

কিন্তু সেদিন আর সে ফ্যাক্টরিতে গেল না ইচ্ছে করেই। মিছিমিছি ভদ্রলোকের কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে লাভ কি। ফলে আবার দেখা সেই সন্ধ্যার পরে। হাব-ভাব দেখে যশোমতীর মনে হল গান শোনার ইচ্ছে। দিদি ইতিমধ্যে দুই-একবার গান গাইতে বলেছে, বিহারীও আশায় আশায় কাছেই ঘুরঘুর করছে। গান করার জন্য প্রস্তুতও ছিল বলতে গেলে। কিন্তু কি খেয়াল চাপল মাথায়, যশোমতী দিদিকে বলে বসল, আজ থাক, শরীরটা ভালো লাগছে না।

দিদি ব্যস্ত হয়ে উঠল, থাক তাহলে। কি খারাপ লাগছে, নতুন জায়গায় জ্বর-জ্বালা এলো না তো? বলে কপালে হাত ঠেকালো।— না গা তো ঠাণ্ডাই।

আর একটু পরেই দেখা গেল গম্ভীর মুখে শঙ্কর সারাভাই বেরিয়ে গেল। যশোমতীর তখনই অনুশোচনা হল একটু, গাইলে হত। কিন্তু মনে মনে কেন যেন খুশিও আবার।

পরদিন শঙ্কর সারাভাইকে চানের ঘাটে দেখা গেল বটে, কিন্তু চানের পর কারখানায় তার সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বিহারীকেও দেখা গেল কারখানা ছেড়ে এদিকেই ঘোরাঘুরি করছে। দিদির কাছে যশোমতী শুনল, কাজ এ-রকম অনেক দিনই বন্ধ থাকে। কখনো সড়কের ছোটখাট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতে হয় বলে, কখনো বা কাঁচা মালে টান পড়ে বলে। তাছাড়া, ভাঙা কল বিগড়ানো তো আছেই। আজ কি জন্যে ফ্যাক্টরি বন্ধ দিদি সঠিক করে বলতে পারল না।

যতবার 'ফ্যাক্টরি' শব্দটা শোনে ততোবারই হাসি পায় যশোমতীর।

আবার দুঃখও হয়।

শঙ্কর বাইরে থেকে ফিরল সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ। রাজুকে নিয়ে যশোমতী দিদির কাছে বসে ছিল। দিদি চাল বাছছে, আর যশোমতী বই-স্লেট নিয়ে রাজুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অক্ষর পরিচয়ের চেষ্টায় লেগেছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে অন্যমনস্কও হয়ে পড়ছে আবার।

কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়, শঙ্কর সারাভাই যেন বাতাসেই খবর ছুঁড়ল, সে জেনে এসেছে প্রাইমারি স্কুল বন্ধ থাকলেও সেখানকার কর্তাব্যক্তিটি আজ আপিসে আসছেন, অতএব এক্ষুনি তার সঙ্গে বেরুলে দেখা হতে পারে এবং চাকরির সম্বন্ধে কথাবার্তা হতে পারে।

খানিক আগেই দিদি আশ্বাস দিচ্ছিল, ঠাকুরের দয়ায় কিছু একটা ব্যবস্থা শিগগীরই হয়ে যাবে। তাই শোনামাত্র তাড়া দিল, যাও যাও, তৈরি হয়ে নাও তাহলে। ভাইয়ের দিকে ফিরল, তুই নিয়ে যাবি তো?

শঙ্কর জবাব দিল না। এই নীরবতার অর্থ অনুকূলই মনে হল যশোমতীর। নতুন উৎসাহে রাজুর বই-স্লেট রেখে তাড়াতাড়ি সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। নিজের সেই একমাত্র শাড়ি-ব্লাউজ বদলে নিতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। আর তারপরেই কি মনে পড়তে ধুপ করে চৌকিতে বসে পড়ল, এবং বসেই থাকল।

জুতো মাত্র এক পাটি।

তার দেরি দেখে দিদি ঘরে এলো, শঙ্করও দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দিদি অবাক, কি হল, বসে আছ যে, যাবে না?

বিব্রত মুখে যশোমতী দরজার দিকে তাকালো একবার, তারপর বলল, স্যাণ্ডেলের আর-এক পাটি পাচ্ছি না।

সমস্যাটা যে এই মুহূর্তের নয় সেটা ফাঁস করার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দিদি নিজেই তাড়াতাড়ি স্যাণ্ডেল খোঁজার উপক্রম করতে যশোমতীকে দ্বিধান্বিত মুখে আবার বলতে হল, পাওয়া যাবে না, প্রথম দিন স্যাণ্ডালজোড়া বাইরে ছিল, কুকুর-টুকুরে নিয়ে গেছে বোধহয় একটা—

সঙ্গে সঙ্গে বাইরের লোকটার মুখের যে পরিবর্তন দেখল, অন্যসময়

হলে যশোমতী হয়তো তা উপভোগই করত। কিন্তু স্বার্থটা এখন তারই। তাই মনে হল, বিপদ যেন ষড়যন্ত্র করে একের পর এক এসে তার ওপর চড়াও হচ্ছে। এ-সময়ে এই গণ্ডগোলে পড়ার কোনো মানে হয়! ওদিকে দিদিও বিপন্ন মুখে ভাইয়ের দিকে চেয়ে আছে। অর্থাৎ কি করা যেতে পারে তাই জানতে চাইছে।

দিদির এই চাউনিটাই যেন রাগের কারণ শঙ্কর সারাভাইয়ের। সরোষে বলে উঠল, এক পা বুঝে চলার মুরোদ নেই, এ-সব মেয়ে বাড়ি থেকে বেরোয় কেন! চাকরির চেষ্টায় বেরিয়ে আরো বিভ্রাট বাড়ানোর দরকার কি—ঘরে বসে থাকলেই তো পারে!

দিদি ঘরে না থাকলে যশোমতীরও পাল্টা রাগ হতে পারত, কিন্তু এখন অসহায় মুখটি করে দিদির দিকেই তাকালো সে। ফলে দিদি ব্যাপারটাকে সহজ করে নিতেই চেষ্টা করল, তোর যেমন কথা, রাগ করতে পারলেই হল—ওকি জানে, না গাঁয়ে আর এসেছে কখনো—ও কি করবে?

দ্বিগুণ তেতে উঠল শঙ্কর সারাভাই। গাঁয়ে কেন, শহরেও চমৎকার, পাশ থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে গেলেও হুঁশ থাকে না। তা আমিই বা কি করব, মাথায় করে জুতো নিয়ে আসতে ছুটব এখন?

—তোকে কিছু করতে হবে না। দিদি বেরিয়ে গেল, আর একটু পরেই নিজের বিবর্ণ স্যাণ্ডালজোড়া এনে হাজির করে বলল, এটা পরেই কাজ চালিয়ে এসো কোনরকমে। পায়ে হবে তো আবার··· হবে বোধহয়। ভাইকে হুকুম করল, আসার সময় ওর জন্য দেখেশুনে একজোড়া স্যাণ্ডাল কিনে নিয়ে আসিস।

গরম চোখে ভাই দিদির দিকে তাকালো একবার, তারপরে যশোমতীর দিকে। অর্থাৎ সহ্যেরও সীমা আছে একটা। কিন্তু দৃষ্টি বিশ্লেষণের জন্য অপেক্ষা না করে যশোমতী ততক্ষণে দিদির আধ-ছেঁড়া স্যাণ্ডাল পায়ে গলিয়ে দাওয়ায় নেমে এসেছে।

পাশাপাশি যাচ্ছে দু'জনে। কম করে মিনিট সাত-আট সমনোযোগে রাস্তার দু'দিক দেখতে দেখতে চলল যশোমতী। মুখে

একটিও কথা নেই। আড়চোখে তারপর পাশের গম্ভীর মূর্তিটি দেখল বার কয়েক, তারপর হঠাৎ যেন রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে বলল, এমন দেশ কে জানত, মানুষ ছেড়ে কুকুরগুলোর পর্যন্ত ভদ্রতা-জ্ঞান নেই একটু, মেয়েছেলের জুতো নিয়ে পালাল!

জবাবে শঙ্কর শুধু রুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একটা।

কিন্তু তর্কের ফাঁক খুঁজছে যশোমতী। দম ফেটে এখন হাসিই পাচ্ছে তার। কিন্তু হেসে ফেললে পাশের লোকের ফিরে বাড়ির দিকে হাঁটার আশঙ্কা। গম্ভীর। একটু বাদে আবার বলল, কোনো মহিলা বিপদে পড়লে এমন চেঁচামেচি করে কেউ তাও জানতুম না। সবই বরাত, অমন একশো জোড়া জুতো খোয়া গেলেও বাড়িতে কেউ একটা কথা বলতে সাহস করত না।

শেষেরটুকু বলে ফেলে নিজেই সচকিত। বিপদ ঘটেই গেল বুঝি। সারাভাই মুখ খুলল এবার, বলল, এত কদরের বাড়ি ছেড়ে আপনি এলেন কেন তাহলে? তাছাড়া আপনার জুতো কুকুরে নিয়েছে আগেই জানতেন যখন, আগে বলেন নি কেন?

প্রথম বিপজ্জনক প্রশ্নটার জবাব এড়ানোর তাগিদে কথায় ঝাঁঝ মেশাবার ফাঁকটুকু আঁকড়ে ধরল যশোমতী।—আগে বললে কি হত, খুশিতে আটখানা হয়ে আপনি জুতো আনতে ছুটতেন?

রাগের মাথায় শঙ্কর দাঁড়িয়ে গেল। ফলে যশোমতীও। নিঃশব্দ দৃষ্টি-বিনিময়। অর্থাৎ সে কিছু বললে যশোমতীও পাল্টা জবাব দেবেই। দেবার জন্য প্রস্তুত। ঘটা করে চোখ পাকিয়ে তাই বুঝিয়ে দিল। হাল ছেড়ে শঙ্কর সারাভাই হেসে ফেলল।

যশোমতীও।

স্কুলের আপিস-ঘর। দরোয়ান বসতে দিল তাদের। জানালো. কর্তাবাবু এখনো আসেন নি, এক্ষুনি এসে পড়বেন।

দুজনে দুটো চেয়ারে বসল। শঙ্কর টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজ তুলে নিল। তার অনুকরণে যশোমতীও আর একটা কাগজ তুলে নিল। চাকরির তদবিরে এসেছে, এবং না পেলে সমূহ বিপদ

সেটা যেন এতক্ষণ ভুলেই ছিল। কিন্তু হাতের কাগজ খুলতেই সর্বাঙ্গে যেন তড়িত-প্রবাহের ঝাঁকুনি খেল একটা।

কাগজে যশোমতীর ছবি, আর বড় বড় হরফে তাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা! দ্বিতীয় দিনেই বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কারের জাল ফেলেছে। কাগজটা পুরনো তারিখের।

তার এই মূর্তি দেখে ফেললে শঙ্কর সারাভাই হয়তো ঘাবড়েই যেত। কিন্তু যশোমতীর মুখ তখন হাতের কাগজের আড়ালে। এমন আড়ালে যে চেষ্টা করেও দেখার উপায় নেই।

যশোমতী কি যে করবে ভেবে পেল না। ভদ্রলোকের হাতের ওই কাগজেও আছে কিনা কিছু কে জানে। দিশেহারাই হয়ে পড়ল সে। যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, এ-ছবি হয়তো তার চোখে আগেই পড়েছে। মনে হওয়া মাত্র স্কুলের ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়ে যাওয়াটাই যেন সব থেকে বড় বিভীষিকা।

কাগজ ছেড়ে যশোমতী দাঁড়িয়ে উঠল হঠাৎ। বলল, চলুন, বাড়ি যাব—

কাগজ সরিয়ে শঙ্কর সারাভাই আকাশ থেকে পড়ল। কি বলছে তাও যেন বোধগম্য হল না। এই মুখ দেখেও অবাক। ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল সে।

যশোমতী তাড়া দিল, কথা কানে যাচ্ছে? উঠুন, আমি এক্ষুনি বাড়ি যাব—আমার শরীর ভয়ানক খারাপ লাগছে।

হকচকিয়ে গেল শঙ্কর সারাভাই। মুখ হঠাৎ এত লাল দেখে আর এই উগ্র কণ্ঠস্বর শুনে ঘাবড়েই গেল। বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু খবর পাঠানো হয়েছে, ভদ্রলোকের সঙ্গে—

আঃ! আমি চাকরি করব না এখানে, চলুন শিগগীর!

এক ঝলক আগুনের ঝাপটা লাগল শঙ্কর সারাভাইয়ের চোখে-মুখে। কিছু বোঝার আগেই যশোমতী হন্‌হন্‌ করে দরজা পেরিয়ে এগিয়ে গেছে অনেকটা।

বিমূঢ় বিস্ময়ে শঙ্কর অনুসরণ করল।

খানিকটা পা চালিয়ে আসার পর ধরা গেল তাকে। মুখ স্বাভাবিক নয় তখনো। শঙ্কর ভয়ই পেয়েছে। গতকালও দিদিকে শরীর ভালো না বলেছিল মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল, কি হল হঠাৎ বলুন তো, কি খারাপ লাগছে?

ক্ষোভের মাথায় যশোমতী বলে উঠল, সব খারাপ, সমস্ত দুনিয়াটা খারাপ লাগছে, বুঝলেন?

শঙ্কর রাগ করবে কি, দুর্ভাবনা ছেড়ে তার বিস্ময়েরও শেষ নেই। মুখ এখনো সেই রকমই লাল প্রায়। চুপচাপ একটু লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, হেঁটে যেতে পারবেন না রিকশা ডাকব?

যশোমতীর কেন যে রাগ কাকে বলবে? জবাব দিল, থাক, রিকশা ডাকলেই তো আপনার বাজে খরচ! পরে খোঁটা দিতে ছাড়বেন? আবারও এগিয়ে গেল সে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে হঠাৎ একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিল শঙ্করের মনে। সন্দেহটা মনে আসার পর এই মুখ দেখে আর চলা দেখে এখন আর খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে না তার। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এসে চুপচাপ তার পাশে পাশে চলল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। একটু বাদে আচমকা জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার ডিগ্রীর সার্টিফিকেট-টার্টিফিকেটগুলো কোথায়?

এই মানসিক অবস্থায় এ-রকম একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না যশোমতী। থতমত খেল। মুখ ঘুরিয়ে তাকালো তার দিকে। —সার্টিফিকেট? আনিনি তো···

চট করে এও মাথায় এলো না যে বলবে, সার্টিফিকেটও ব্যাগের সঙ্গেই চুরি গেছে। এ-রকম প্রশ্ন কেন তাও ভাবার অবকাশ পেল না। নিছক সত্যি কথাটাই বলে ফেলেছে।

দৃষ্টি ঘোরালো শঙ্কর সারাভাইয়ের।—চাকরি কি আপনার মুখ দেখে হয়ে যাবে ভেবেছিলেন? স্কুলে চাকরির চেষ্টায় এসেছেন আর ডিগ্রীর সার্টিফিকেট সঙ্গে আনেন নি?

আবার কিছু একটা বিড়ম্বনার মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে তাকে।

যশোমতী মাথা নাড়ল শুধু। আনেনি।

একটু থেমে শঙ্কর প্রায় নির্লিপ্ত মুখেই জিজ্ঞাসা করল, আপনি সত্যিই বি. এ. পাস করেছেন?

কি! সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে উঠল। রাগে আবার সেই রকমই মুখ লাল যশোমতীর।

শঙ্কর জবাবের প্রতীক্ষা করছে, সন্দেহ যখন হয়েছে রাগ-বিরাগের ধার ধারে না।

আবার ভেবে-চিন্তে জবাব দেবার ব্যাপারে ভুল হয়ে গেল যশোমতীর। সন্দেহটা স্পষ্ট হওয়া মাত্র মাথা আরো বিগড়েছে। বলে উঠল, আপনি ওখানকার মেয়ে-কলেজে চিঠি লিখে দেখুন সত্যি কি মিথ্যে, এম. এ-ও পড়েছি কিনা য়ুনিভার্সিটিতে লিখে জেনে নিতে পারেন—

পর মুহূর্তে খেয়াল হল, সত্যিই লেখে যদি, মিথ্যেই প্রমাণ হবে। কারণ, য়ুনিভার্সিটিতে অন্তত লীলা নায়েক বলে কেউ নেই, আর সত্যিকারের লীলা নায়েক আই. এ. পাশ করার আগেই বিয়ে করে পড়াশুনার পাট চুকিয়েছে। ফলে রাগের চোটে মাথা আবার খারাপ হবার দাখিল তার।

শঙ্কর সারাভাইয়ের দৃষ্টি পার্শ্ববর্তিনীর মুখের উপর থেকে নড়ছে না।—আপনি এ-ভাবে চলে এলেন কেন?

যোগ্য জবাব হাতড়ে না পাওয়ার ফলেও ক্রুদ্ধ যশোমতী।— বি. এ. অনার্স পাশ করে প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করব কেন?

—তাহলে আপনি দেখা করতে এলেন কেন?

—এমনি। প্রথমে ভেবেছিলাম করব, পরে মনে হল করব না। জটিলতা নিজেই পাকিয়ে তুলেছে। তাই কথার সুর আপনা থেকেই নরম একটু, বলল, আপনি বরং গানের স্কুল যেটা হবে সেখানে আগে থাকতে চেষ্টা করে দেখুন।

এবারে শঙ্করের ধৈর্য শেষ।—আমার দায় পড়েছে আপনার চাকরির চেষ্টায় ঘুরতে।

হঠাৎ যশোমতীর মনে হল, লোকটাকে আরো তাতিয়ে দিতে পারলেই এ-যাত্রা বাঁচোয়া। নইলে সন্দেহ আরো কোন্ পর্যায়ে গড়াবে ঠিক নেই।

দুর্বলতার জায়গা বেছে নিয়েই ঘা দিতে চেষ্টা করল।—দায় তো পড়েইছে, নইলে আপনার টাকা শোধ হবে কি করে?

শঙ্করও ঠাস করে জবাব দিল, আর শোধ হয়েছে! পুরুষের ওপর বসে খাওয়া আর পরা ছাড়া আপনাদের আর কোনো ক্ষমতা নেই, বুঝলেন?

বুঝলাম। কিন্তু পুরুষের ক্ষমতাও তো দেখছি, খাওয়া-পরা যোগাতেই বা ক'জন পারে!

রাগে মুখ সাদা শঙ্কর সারাভাইয়ের। সে ভেবে পায় না, এ-রকম অবস্থায় পরেও একটা মেয়ে এ-ভাবে কথা বলতে পারে কি করে।

আড়চোখে এক-একবার তাকে লক্ষ্য করছে যশোমতী, আর নিশ্চিন্ত বোধ করছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে জিজ্ঞাসা করল, দিদিকে কি বলবেন?

ঝাঁঝালো জবাব এলো, কি বলতে হবে সেটাও আপনি অনুগ্রহ করে বলে দিন।

একটু ভেবে অনুগ্রহ করেই যেন বলে দিল যশোমতী।—বলবেন চাকরি হল না।

আর যদি জিজ্ঞাসা করে, কেন হল না?

বলবেন, প্রাইমারি স্কুলের পক্ষে ওভার-কোয়ালিফায়েড—এত বিদ্যে থাকলে অত ছোট স্কুলের চাকরি হয় না।

নিজেই বিস্মিত যশোমতী, কি যে আছে অদৃষ্টে কে জানে, রাগ-দুর্ভাবনা ভুলে হাসতেও পারল।

কিন্তু শঙ্করের হাসির মেজাজ নয় আপাতত। বলল, আপনার কোন্ কথাটা সত্যি আর কোন্টা সত্যি নয়, সেটা আমার কাছে একটুও স্পষ্ট নয়।

সঙ্গে সঙ্গে আবার অসহিষ্ণু মূর্তি যশোমতীর।—কে আপনাকে

অত মাথা ঘামাতে বলেছে? দিদিকে আপনার যা খুশি বলুন গে যান, আমাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে এই পর্যন্ত—সেটা যে আপনি সব সময়ে চাইছেন তা আমার বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। ব্যাগটা চুরি না গেলে আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারতুম টাকার পরোয়া আমি করি কি না।

শঙ্কর সারাভাই চুপ। তার কেবলই মনে হতে লাগল এ-রকম মেয়ে সে জীবনে দেখেনি।

॥ আট ॥

বাড়ি ফিরে যশোমতী সত্যিই ভয়ে ভয়েই ছিল। কিন্তু লোকটা তাকে বাঁচিয়েই দিল মনে হয়। দিদি শুধু জানল, তার চাকরি হল না। আর সেটুকু শুনেই স্কুলের অজানা অচেনা কর্তাদের উদ্দেশে দিদি বিরূপ মন্তব্য করল দুই একটা। উল্টে যশোমতীকে সান্ত্বনা দিল, তুমি কিছু ভেব না, যা হোক কিছু হবেই। সম্ভাব্য গানের স্কুলের লোকেরা একবার তার গলা শুনলেই হয়তো তাড়াতাড়ি স্কুল শুরু করে দেবে। এই সঙ্গে স্যাণ্ডাল না কেনার জন্যেও ভাইকে কথা শুনতে হল।

একটা একটা করে দিন যায়। যশোমতীর মনে হয় এ-ভাবে থাকা উচিত নয়। বিবেকে লাগে। আবার এখান থেকে যাবার কথা ভাবতেও ভালো লাগে না। সকাল হলেই রাজুর হাত ধরে পুকুর-ঘাটে আসা চাই তার। এমনি রাত্রিতে বিছানায় শুয়েই সকালের ওই দেখার প্রতীক্ষায় থাকে।

তারপর যশোমতী বাগান পরিচর্যা করে খানিকক্ষণ। এও ভালো লাগে। এক-একদিন দিদি আসে, আর কাজের চাপ না থাকলে শঙ্কর সারাভাইও আসে। দুজনের খটাখটি লাগে অবশ্য, লাগে কারণ, ইচ্ছে করেই যশোমতী জ্বালাতন করে তাকে। তবু মনে হয়, রাগ হলেও লোকটা আগের মতো অত রূঢ় হতে পারে না।

বিশেষ করে দুপুরে কারখানা-ঘরে যেন তার প্রতীক্ষাতেই থাকে। কারখানা···যশোমতীর হাসিই পায়। বাবার কারখানা যদি একবার দেখত।

দুপুরে সেখানে হাজিরা দেওয়া নৈমিত্তিক কাজে দাঁড়িয়েছে যশোমতীর। ইদানীং আবার দুপুরের খাবারটা সে-ই নিয়ে যাচ্ছে। ঢেকে রাখতে বললে রীতিমত তাড়না শুরু করে দেয়, মুখ-হাত ধুয়ে শঙ্করকে খেতে বসতে হয়। বিকেলের চা নিয়েও সে-ই আসছে। এই চা নিয়েও সেদিন একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে।

যশোমতী বলে ফেলেছিল, কি যে জায়গা, একটু ভালো চা-ও মেলে না—এই চা গলা দিয়ে নামতে চায় না।

এ-বাড়িতে নিয়মিত চায়ের পাট ছিলই না। চা-বিহনে যশোমতীর দুই-একদিন মাথা ধরতে দিদি জানতে পেরে চায়ের ব্যবস্থা করেছে। শঙ্কর পেলে খায়, না পেলে খায় না। কিন্তু যশোমতী ভাবখানা এমন করল যেন এই লোকের জন্যেই চায়ের ব্যবস্থা।

দিদি অনেকবার ভাইকে বলেছে, মেয়েটার চাল-চলনে কথায়-বার্তায় আচার-আচরণে সর্বদাই মনে হয় বড়ঘরের মেয়ে। এমন কি বিহারীও বলেছে, নতুন দিদিমণি নিশ্চয় খুব বড় ঘরের মেয়ে ছিল। তাকেও কিছু দেবে-টেবে—এই রকম প্রতিশ্রুতি পেয়েছে হয়তো।

চায়ের প্রসঙ্গে শঙ্কর বলে বসল, ভালো চা কি করে পাওয়া যাবে, আপনার মতো ভালো অবস্থার লোক তো এখানে বেশি নেই।

যশোমতীও ঝপ করে বলে বসেছে, নেই সে-কথা সত্যি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে মনোভাব গোপন করতে চেষ্টা করেছে। —আমার কি অবস্থা আমি খুব ভালো জানি, সে-জন্যে অত খোঁটা দেবার দরকার কি!

কিন্তু দুপুর এলেই কে যেন টানে যশোমতীকে এখানে। কর্মরত মূর্তি দেখে পুরুষের। সংগ্রাম দেখে। কি অসম্ভব চেষ্টা, আর কতখানি আশা। এই কারখানা নাকি বড় হবে একদিন, মাথা উঁচিয়ে উঠবে। দিদির কাছে ভদ্রলোকের এই একমাত্র স্বপ্নের কথা

শুনেছে, বিহারীর মুখেও শুনেছে। আর শুনেছে শঙ্কর সারাভাইয়ের নিজের মুখ থেকেও। বলেছে, একদিন এর এই চেহারা থাকবে না, দেখে নেবেন।

যশোমতীর বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু সে বিশ্বাস করতে চেয়েছে।

ইতিমধ্যে সত্যিই নিজের হাতে তাকে দুখানা শাড়ি বানিয়ে দিয়েছে শঙ্কর সারাভাই। কাপড় পাওয়ামাত্র মুখ লাল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এক অদম্য খুশির আবেগ অনুভব করেছে সে। শাড়ি অবশ্য দিদিই এনে দিয়েছিল তার হাতে।

কিন্তু শাড়ি হাতে নিয়েই যশোমতীর মনে হয়েছিল, যত্নের শাড়ি, অবজ্ঞার বা হেলা-ফেলার নয়। দুপুরে যখন ওই শাড়ির একখানা পরে এসেছে তখনো থেকে-থেকে মুখ লাল হয়েছে। বলল, চমৎকার শাড়ি, আপনি এত ভালো তৈরি করতে পারেন?

হাসল শঙ্করও। বলল, সরঞ্জাম থাকলে এর থেকে অনেক ভালো তৈরি করতে পারি, নেই তার কি করা যাবে।

না থাকার খেদ যেন বুকের ভেতর থেকে উঠে এলো। সেই দিনই যশোমতী দিদির কাছে শুনেছিল, বিশ হাজার টাকা দেবে এমন একজন অংশীদার যোগাড় করার জন্য তার ভাই কত চেষ্টাই না করেছে —কিন্তু কে দেবে তাকে টাকা? ওই টাকা পেলেই নাকি কারখানার ভোল বদলে যেত।

কথায় কথায় যশোমতী সেই প্রসঙ্গই তুলল। অবাক হবার মতো করে জিজ্ঞাসা করল, মাত্র বিশ হাজার টাকা পেলেই আপনার সমস্ত সমস্যা মিটে যায়?

শঙ্কর সারাভাই জবাব দিতে যাচ্ছিল, বিশ হাজার টাকা একসঙ্গে দেখেছেন? তা না বলে হাসল। অতটা অভদ্র না হয়েও জব্দ করা যেতে পারে। হাল্‌কা শ্লেষে জবাব দিল, মাত্র। আপনি দেবেন?

হঠাৎ কি মনে পড়ল যশোমতীর। তার চোখে-মুখে উদ্দীপনার আভাস। সমস্যার সমাধান তো তার হাতের মুঠোয়। সাগ্রহে বলল, দিতে পারি না মনে করেন?

এ আলোচনা ভালো লাগছিল না শঙ্করের। হয়তো বড়ঘরের মেয়েই ছিল, তা বলে সদ্য বর্তমানের অবস্থা ভোলে কি করে? হেসেই টিপ্পনি কাটল, আপনি রাজুকে কি সব দেবেন বলেছেন, বিহারীও হয়তো কিছু পাবার আশ্বাস পেয়েছে, নইলে চোখ-কান বুজে ও এত প্রশংসা কারো করে না।...আমাকেও ওদের দলে ফেলাটা কি তার থেকেও একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

—না, যাচ্ছে না। যশোমতীর নিশ্বাস ঘন হয়ে উঠল। আরো জোর দিয়ে বলল, দিতে পারি, আপনি যদি দিদিকে বা কাউকে কিছু না বলে দেন। নিজের দুটো হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিল। —এই দেখুন, আমার এই বালা দুটোর হীরেগুলোর দামই সাত-আট হাজার ছিল, আর হারের লকেটের এই একটা হীরের দামই তার থেকে অনেক বেশি। তাছাড়া সোনা আছে, আংটি আছে, বিশ হাজার কেন, তার থেকে বেশিই হবে, আপনি চেষ্টা-চরিত্র করে দেখুন না কি পান, এগুলো দিয়ে আমি আর কি করব? আপনার কাজে লাগলে সার্থক হবে—

শঙ্কর সারাভাই বিস্ময়ে নির্বাক। গায়ের গয়নাগুলো এই প্রথম যেন লক্ষ্য করে দেখল সে। চোখ ঠিকরোবার মতই ঝকঝক করছে তার পরেও মুখে কথা নেই। যশোমতীকে দেখছে, গয়না দেখছে,—দুই-ই দেখছে। গয়নাগুলোর দাম এত হতে পারে, আর তা কেউ অনায়াসে খুলে দিতে চাইতে পারে, সে ভাবতেও পারে না।

যশোমতী আবার বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এসব আমার দাদার নয়, বাবার দেওয়া। এগুলো আমারই। এর জন্যে আপনাকে কারো কাছে কোনদিন জবাবদিহি করতে হবে না। কাজ আরম্ভ হোক তো, তারপর বাকি টাকাও যোগাড় হয়ে যাবে। নেবেন তো?

শঙ্কর সারাভাই এই একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও লোভ দমন করেছে বটে, কিন্তু জীবনে সে যেন এক পরম বিস্ময়ের মুখোমুখি হয়েছে। সমস্ত রাত ঘুমুতে পারেনি। সে ভেবে পাচ্ছে না, সত্যিই কে তার ঘরে এসে উঠেছে। ওই একটা মাত্র প্রস্তাব যে তাকে কোন্ অনুভূতির

রাজ্যে নিয়ে গেছে তা শুধু সে-ই জানে। কারখানা দাঁড়াবে, কারখানা অনেক বড় হবে জীবনে এর থেকে বেশি কাম্য আর কিছু নেই। যে এতখানি দেবার জন্য এগিয়ে এলো, সে নিজে কখনো সরে যাবে না এ-রকম প্রতিশ্রুতি নিয়ে সত্যি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় কিনা, সেই প্রলোভনও মনে অনেকবার আনাগোনা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন থেকে সায় মেলে নি। শুধু প্রতিশ্রুতিটুকু আদায় করার লোভ বার বার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে।

কিন্তু এ চিন্তার খবর যশোমতী রাখে না। প্রস্তাব নাকচ করা হয়েছে এইটুকুই সে বুঝেছে, আর এই জন্যই সে ক্ষুণ্ণ মনে মনে।

জিজ্ঞাসা করেছে, নিতে আপনার আপত্তি কেন?

শঙ্কর সারাভাই হাসিমুখে পাল্টা প্রশ্ন করেছে, আপনার গায়ের গয়না আমি নেব কেন?

তর্ক করতে গিয়েও যশোমতী হেসে ফেলেছিল, তবে কার গায়ের গয়না নেবেন?

শঙ্কর জবাব দিতে পারেনি। লোভ সামলে মুখ টিপে হেসেছে।

ছাড়বার পাত্রী নয় যশোমতী, গলায় ঝগড়ার সুর।—নেবেন না-ই বা কেন, আমি আপনার বাড়িতে চড়াও হয়ে বসেছি কি করে?

ঠাট্টার সুরেই শঙ্কর সারাভাই জবাব দিয়েছে, বসেছেন সে-কি আমার হাত? এই জবাবে পাছে অহিত হয় সেই জন্যেই আবার বলেছে, আমি গরীব বটে, কিন্তু মনটাকে গায়ের গয়না খুলে নেবার মতো গরীব ভাবা গেল না।

ক্ষুণ্ণ হলেও জবাবটা ভালো লেগেছিল যশোমতীর।

পরদিনই আবার আর এক প্রস্তাব নিয়ে সোৎসাহে হাজির সে। বলল, আচ্ছা, কট্‌ন্ চেম্বারের এগজিবিশনে শাড়ি পাঠান না কেন? তাদের বিচারে প্রথম হতে পারলেও তো পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়ে যাবেন?

শঙ্কর সারাভাই অবাক।—কট্‌ন্ চেম্বারের খবর আপনি রাখেন কি করে?

ছদ্মবিস্ময়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ টান করে ফেলে যশোমতী।—ও মা, কাগজে বেরোয়, কত ঘটা হয়, খবর রাখব না কেন? আমার এক বন্ধুর দাদাই তো একবার পেয়েছে।

মিথ্যে বলেনি। তবে বন্ধুর দাদার পুরস্কার পাওয়ার মধ্যে তারও যে পরোক্ষ হাত ছিল, সেটাই শুধু গোপন। পুরস্কার পাওয়ানোর জন্য বিচারকদের আগের থেকে বশ করতে হয়েছিল।

শঙ্কর সারাভাই জবাব দিল, আপনার বন্ধুর দাদার তাহলে মুরুব্বির জোর আছে। সাধারণ বেড়ালের বেলায় ওই ভাগ্যের শিকে ছেঁড়ে না।

—খুব ছেঁড়ে। এভাবে হাল্ ছাড়তে দিতে রাজি নয় যশোমতী।—আপনি চেষ্টা না করে বলছেন কেন? কখনো পাঠিয়েছেন? পাঠান নি? আচ্ছা, ও-সব ভাবনা ছেড়ে এবারে তাহলে খুব ভাল দেখে একখানা শাড়ি পাঠান, কার কপালে কখন কি লেগে যায় কে বলতে পারে! আমার মন বলছে আপনিই পেয়ে যাবেন।

এ প্রস্তাবটা আগেরটির থেকেও অর্থাৎ গায়ের গয়না খুলে নিয়ে ব্যবসা বাড়ানোর চেষ্টার থেকেও অবাস্তব মনে হয়েছিল শঙ্কর সারাভাইয়ের। কিন্তু তবু ভাল লাগল। তার জন্যে এতখানি মন দিয়ে কেউ ভাবছে, এ-ই যেন এক দুর্লভ ব্যাপার। তবু, এ প্রস্তাবও হেসেই উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল সে। বলল, মনে মনে আপনি নিজেই বিচারক হয়ে বসেছেন কিনা, তাই মন বলছে।

কিন্তু এই এক ব্যাপার নিয়ে যশোমতী রোজ উৎসাহ দিতে লাগল, রোজ তর্ক করা শুরু করল। আর এই প্রেরণাটুকুই হয়তো শঙ্কর সারাভাইয়ের নিজের অগোচরে মনের তলায় কাজ করতে লাগল। খুব অগোচরেও নয়। পুরস্কার পাক না পাক, তার শুকনো হতাশ মনটাকে যে চাঙা করে তুলতে পেরেছে এই প্রাপ্তি-টুকুরও দুর্লভ স্বাদ। যশোমতীর উৎসাহ দেখে আর তার অবুঝ ঝোঁক দেখে শেষ পর্যন্ত তাকে খুশি করার জন্যেই যেন রাজি হল,

এগজিবিশনের বিচারে শাড়ি পাঠাবে। পাঠানোটা খুব কঠিন ব্যাপার তো কিছু নয়, খুব ভেবে-চিন্তে খেটেখুটে করা।

এই নিয়েই তারপর দুজনের আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। আর, এই আলোচনার ফল সত্যিকারের কাজের দিকে গড়াতে লাগল। শঙ্কর সারাভাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, পাড়, আঁচল ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যের দিক নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও এই মেয়ের মাথায় বেশ আসে। অন্তত অজ্ঞ বলা চলে না। এই বিস্ময়ই ক্রমশ তাকে আশার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কিনা কে জানে।

সেদিন শঙ্কর সারাভাই যশোমতীর নৈমিত্তিক তাগিদের ফলেই জানালো, সামনের পনেরো দিনের মধ্যেই দেব-উঠি-আগিয়ারস্-এর উৎসব, এই উৎসবের দিন সাবরমতীতে চান করে এবং পুজো দিয়ে রাত্রিতে কারখানার প্রথম কাজ শুরু করেছিল। অবশ্য তার ফল যে আশাপ্রদ হয়েছে তা নয়। তবু, সেই দিনটা এলেই নতুন করে আবার আনন্দ করতে ইচ্ছে করে···এগজিবিশনের শাড়ির ব্যাপারেও তাই করবে। খুব ভোরের ট্রেনে চলে যাবে, দুপুরের মধ্যে চান আর পুজো সেরে চলে আসবে, বিকেলে দুজনে একসঙ্গে পুরস্কারের শাড়ির কাজ শুরু করবে। প্রতি বছরেই ওই দিনটিতে সে নাকি সাবরমতীতে গিয়ে থাকে।

শুনে যশোমতী ভারী খুশি। পুরস্কারটা যে এবারে এখানেই আসবে তাতে তার কোনো সন্দেহ নেই। ও কোথায় আছে না জানিয়ে বাবাকে যদি সে এই শাড়ির দিকে চোখ রাখার জন্যে একটা চিঠি শুধু লিখে দেয়, তাতেই কাজ হবে।···চিঠি লিখলে আবার ডাকের ছাপ দেখে হদিস পেয়ে ফেলতে পারে। দূরের কোনো জায়গা থেকে পোস্ট করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যাক, চিঠি লিখবে কি অন্য কিছু ব্যবস্থা করবে সেটা পরের ভাবনা, এখন দুর্গা বলে আরম্ভ তো করা যাক্।

কিন্তু ওপরঅলার ইচ্ছে অন্যরকম।

বিকেলের দিকে রাজুর হাত ধরে যশোমতী এদিক-সেদিক বেড়াত

একটু। সেদিন দেখল, দূর থেকে একজন লোক যেন তাকে বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করছে। লোকটার বয়েস বেশি নয়, চাউনিটাও যেন কি রকম।

বিরক্ত হয়ে সেদিন যশোমতী ঘরে চলে এলো। শহরে পুরুষের এই রোগ কম দেখে নি, গাঁয়ে ইতিমধ্যে আর এই উৎপাত ছিল না। পরদিন সকালে তরকারীর বাগানে ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই লোকটাকে দেখা গেল। বিকেলেও। যশোমতী রেগেই গেল, ভাবল শঙ্কর সারাভাইকে বলে দেবে। লোকটার নির্লজ্জতা স্পষ্ট। কিন্তু বলতে লজ্জা করল। দরকার হলে এ-রকম তু-একটা লোককে নিজেই টিঁট করতে পারে। বলল না। তবে বললে প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখার লোভ হয়েছিল।

বিরক্তির একশেষ। এর পরদিন অত সকালে মামা-ভাগ্নের চান দেখতে ঘাটে এসেও দেখে, অদূরে সেই লোক। তার দিকেই নিষ্পলক চেয়ে আছে।

এবারে হঠাৎ এক অজ্ঞাত সন্দেহ দেখা দিল যশোমতীর মনে। তাড়াতাড়ি সে বাড়িতে ঢুকে গেল।

কিন্তু তু'ঘণ্টার মধ্যে যশোমতী শঙ্কর সারাভাইয়ের দেখা পেল না। পেলেও তাকে কিছু বলত কিনা জানে না। রাজু বলল, একজন লোকের সঙ্গে মামা কি কাজে গেছে।

এমন প্রায়ই যায়। সন্দেহের কোনো কারণ ঘটল না তখনো. কিন্তু শঙ্কর সারাভাই ফিরল যখন, তার কথা শুনে যত না, তার মুখের দিকে চেয়ে অবাক সকলে। এমন কি পাঁচ বছরের রাজুও। মামার এত ব্যস্ততা আর বুঝি দেখে নি। শুধু ব্যস্ততা নয়, চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা।

এসেই খবর দিল যশোমতীর জন্য খুব একটা ভালো চাকরি যোগাড় হয়েছে, এখান থেকে মাইল পনেরো দূরে, ট্রেনে যেতে হবে এক্ষুনি, মেয়েদের হাইস্কুলের হেডমিস্ট্রেসের চাকরি। কথা-বার্তা এক-রকম পাকা হয়ে গেছে। ভালো মাইনে, থাকার বাসা পাওয়া যাবে, আধঘণ্টার

মধ্যে রওনা না হলেই নয়।

শোনামাত্র দিদি আনন্দে আটখানা। কিন্তু তক্ষুনি মনে হল রান্না যে কিছুই হয় নি, মেয়ে খেয়ে যাবে কি? আর তারপরেই ভাইয়ের বুদ্ধি দেখে অবাক। হাতের ঠোঙা আর কাগজের বাক্স আগে লক্ষ্যই করে নি।

ঠোঙায় ভাল ভাল মিষ্টি। আর কাগজের বাক্সয় দামী স্যাণ্ডাল একজোড়া। যশোমতী পাথরের মতো স্তব্ধ হঠাৎ। শঙ্কর সারাভাইকে দেখছে। দেখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু যে ভাবে দেখতে চাইছে, দেখতে পারছে না। কারণ সে ব্যস্ত-সমস্ত। সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে না।

দিদি যশোমতীকে সাজগোজ করালো, জোর করে খাওয়ালো। তার এই নীরবতা বিচ্ছেদের দরুন বলেই ধরে নিল। নানাভাবে সান্ত্বনা দিল তাকে। রিকশা অপেক্ষা করছে। একটা নয়, দুটো। শঙ্কর সারাভাইয়ের আজ দরাজ হাত।

নির্বাক মূর্তির মতো যশোমতী রিকশায় এসে উঠল।

রিকশা চলল। বাড়ির দোরে দিদি দাঁড়িয়ে, রাজু দাঁড়িয়ে, বিহারী দাঁড়িয়ে। যশোমতী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তাদের একবার। কিন্তু একটি কথাও বলতে পারল না, বা বলল না।

পাশের রিকশাটা ঠিক পাশে পাশে চলছে না। দু'চার হাত পিছিয়ে আছে। যশোমতী ফিরে তাকালো। কিন্তু তার সঙ্গী এদিকে ফিরছে না, অন্যদিকে চেয়ে আছে। তা সত্ত্বেও লোকটার মুখখানা যেন লালচে দেখাচ্ছে।

স্টেশন। যশোমতী দেখছে লোকটা হন্ত-দন্ত হয়ে টিকিট কেটে আনল। গাড়ির অপেক্ষায় যে পাঁচ-সাত মিনিট দাঁড়াতে হল, তখনো শঙ্কর সারাভাই সামনা-সামনি এলো না। দূরে দূরে ঘুরপাক খাচ্ছে। তখনো যেন অকারণেই ব্যস্ত সে। যশোমতীর আবারও মনে হল, কি এক চাপা উত্তেজনায় লোকটার সমস্ত মুখ জ্বলজ্বল করছে।

গাড়ি এলো। তারপরই যশোমতী আরো ঠাণ্ডা, আরো নির্বাক। সাদরে তাকে নিয়ে একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরায় উঠে বসল শঙ্কর

সারাভাই। সে কামরায় দ্বিতীয় লোক নেই।

গদির ওপরেই একটা কিছু পেতে দিতে পারলে ভালো হত যেন, আর কিছু না পেয়ে নিজের রুমালে করেই গদীটা ঝেড়ে মুছে দিল শঙ্কর সারাভাই।

বসুন—

যশোমতী বসল। বসে এবার সোজাসুজি দুটো চোখ তার মুখের ওপর আটকে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারা গেল না। লোকটা এখনো যেন ব্যস্ত। এদিক-ওদিক মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

যশোমতী দেখছে। দেখছে দেখছে দেখছে। যতখানি দেখা যায় দেখছে। চলন্ত গাড়ির ঝাঁকুনিতে দেহ দুলছে বটে, কিন্তু সে মূর্তির মতোই বসে আছে, আর নিষ্পলক চোখে দেখছে।

একটা স্টেশন এলো। একটা কথারও বিনিময় হয় নি। শঙ্কর সারাভাই তাড়াতাড়ি ঝুঁকে কাগজ কিনল একটা। তারপর গভীর মনোযোগে দৃষ্টিটা কাগজের দিকে ধরে রাখল।

যশোমতী দেখছে। গাড়ি চলছে।

—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

এত ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ প্রশ্ন যে চমকে উঠল শঙ্কর সারাভাই। হঠাৎ যেন জবাব খুঁজে পেল না।

গোটা মুখখানা দু'চোখের আওতায় আটকে রাখতে চেষ্টা করে ধীর অনুচ্চ স্বরে যশোমতী আবার জিজ্ঞাসা করল, ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে আমরা কোথায় যাচ্ছি?

হাসল শঙ্কর সারাভাই। এ-রকম কৃত্রিম বিনীত হাসি আর দেখে নি যশোমতী। এ-রকম চাপা অস্বস্তি আর চাপা উদ্দীপনাও আর দেখে নি।

—চলুন না, কাছেই।

চেয়ে আছে যশোমতী।—পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে অনেক টাকা…কেমন?

কাগজের ওপর মুখ নেমে এসেছে শঙ্কর সারাভাইয়ের। তার

উদ্দেশ্য গোপন নেই বোঝার ফলে প্রাণান্তকর অস্বস্তি।

একটু অপেক্ষা করে যশোমতী আবার বলল, আমি যদি পরের স্টেশনে নেমে যাই, আপনি কি করবেন?

চমকে তাকালো শঙ্কর সারাভাই। উত্তেজনা সামলে হাসল। বলল, আপনি সে চেষ্টা করবেন না জানি। তাহলে আমাকেও নামতে হবে, স্টেশনের লোককে বলতে হবে। মনে যা আছে খোলাখুলি ব্যক্ত করল এবার, বলল, আপনার বাবার কাছে লোক চলে গেছে, টেলিগ্রাম চলে গেছে, আর তারপরে ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথাও হয়ে গেছে। এতক্ষণে তাঁরা সকলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন—তাঁরা জানেন এই গাড়িতে আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

যশোমতীর দেখার শেষ নেই। এতদিন যা দেখে এসেছে তা যেন সব ভুল।

—আপনার জীবনের তাহলে একটা হিল্লে হয়ে গেল, আর কোনো সমস্যা নেই?

শঙ্কর সারাভাই সানুনয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল তাকে, সে কিছু অন্যায় করছে না, দুদিন আগে হোক পরে হোক বাবার কাছে ফিরে যেতে তো হবেই তাকে। কাগজে ছবি দেখেই পাড়ার লোকের সন্দেহ হয়েছে, ক'দিন আর এভাবে থাকা যেত। রাগের মাথায় সে চলে এসেছে, ফিরে গেলে তার বাবা নিশ্চয় অনুতপ্ত হবেন, টেলিফোনে তো প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলেন ভদ্রলোক, তাছাড়া এভাবে বেরিয়ে এসে যে বিপদের ঝুঁকি যশোমতী নিয়েছিল সেটাও কম নয়, কত রকমের লোক আছে সংসারে।

কত রকমের লোক আছে সংসারে তাই যেন নিষ্পলক চেয়ে চেয়ে দেখছে যশোমতী। দেখছে, একটা স্টেশন এলেই অস্বস্তিতে ছটফট করছে লোকটা। আর তারপর আবার ট্রেন চলার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকার আলো দেখছে ওই মুখে।

সমস্তক্ষণ আর একটিও কথা বলল না যশোমতী। শুধু দেখল। একই ভাবে একই চোখে দেখে গেল।

গন্তব্য স্থানে ট্রেন এসে দাঁড়াল। আর তারপর শঙ্কর সারাভাই যেন হকচকিয়ে গেল কেমন। ছোট স্টেশনে বহুলোক এসেছে যশোমতীকে নিতে। মিল-মালিক আর কট্‌ন্‌ চেম্বারের প্রেসিডেণ্ট চন্দ্রশেখর পাঠক এসেছে, আর তার স্ত্রী এসেছে, ছেলে ছেলের বউ এসেছে। রমেশ চতুর্বেদী, বীরেন্দ্র যোশী, বিশ্বনাথ যাজ্ঞিক, শিবাজী দেশাই, ত্রিবিক্রমও এসেছে। যশোমতীর অনেক বান্ধবীও এসেছে।

এই ব্যবস্থা যশোমতীর বাবা-মায়ের। স্টেশনে এসে মেয়ের কি মূর্তি দেখবে ভেবে ভরসা করে শুধু নিজেরা আসতে পারেনি। অনেক লোক দেখলে মেয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করবে। স্ত্রীর ব্যবস্থায় এবারে আর বাদ সাধে নি তার কর্তাটি।

তাই হল। গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে যশোমতীর এতক্ষণের মুখভাব বদলে গেল। হাসি-ভরা মুখেই নামল সে। আর তাই দেখে আত্মীয় পরিজনেরাও কলহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠল। বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, এমন কথা কেউ উচ্চারণও করল না। যেন অতি আদরের কেউ অনেকদিন বাদে অনেক দূর থেকে ফিরে এলো—সেই আনন্দ আর সেই অভ্যর্থনা।

হাসিমুখেই যশোমতী বাবা-মাকে প্রণাম করল, আর যারা এগিয়ে এলো তাদের কুশল সংবাদ নিল।

একপাশে দাঁড়িয়ে শঙ্কর সারাভাই চুপচাপ দেখছে। তার দিকে তাকানোর ফুসরত কারো নেই। এই মেয়ে তাদের গরীবের বাড়িতে এতদিন কাটিয়ে গেল এ-যেন আর ভাবা যাচ্ছে না।

ফিরে চলল সকলে। পায়ে পায়ে শঙ্করও এগোচ্ছে। তার মুখে সংশয়ের ছায়া। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ ফিরে তাকালো যশোমতী। তারপর বাবাকে কি বলতেই ভদ্রলোক শশব্যস্তে এবার শঙ্করের দিকে এগলো। সানন্দে তার দুই হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়েই থমকালো একটু।—তোমাকে···আপনাকে কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে?

শঙ্কর সারাভাই মাথা নাড়ল। অর্থাৎ দেখেছে ঠিকই। দ্বিধা

কাটিয়ে মেসোর পরিচয় দিল। এই বাড়তি পরিচয়টুকু পেয়ে চন্দ্রশেখর পাঠক কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস বর্ষণ করতে করতে তাকে একটা গাড়িতে তুলে দিল। নিজে সকন্যা আর সস্ত্রীক অন্য গাড়িতে উঠল। এখন আর বাড়ি ধাওয়া করা ঠিক হবে না ভেবে এক ছেলে-বউ ছাড়া অন্য সকলে স্টেশন থেকে বিদায় নিল।

আঙিনায় গাড়ি ঢুকতে শঙ্কর সারাভাইয়ের তুই চক্ষু বিস্ফারিত। বাড়িতে ঢুকল কি কোনো রাজপ্রাসাদে, হঠাৎ ঠাওর করে উঠতে পারল না।

গাড়ি থেকে নামতে যে প্রকাণ্ড হলঘরে তাকে নিয়ে যাওয়া হল, তার ব্যবস্থা আর সাজ-সরঞ্জাম দেখেও শঙ্কর সারাভাইয়ের চোখে পলক পড়ে না। কোন্ বাড়ির মেয়ে এতগুলো দিন তাদের ভাঙা ঘরে কাটিয়ে এলো, এখানে এসে বসামাত্র সেটা এখন ঘন ঘন মনে পড়তে লাগল।

ঘরে ঢুকেই যশোমতী ধুপ্ করে একটা সোফায় বসল। বাবা-মা দাদা-বউদি তখনো দাঁড়িয়ে। বসেই শঙ্করের দিকে তাকালো একবার। শঙ্কর সারাভাইয়ের মনে হল, চকচকে দৃষ্টিটা যেন মুখের ওপর কেটে বসল হঠাৎ।

—আমার চেক-বই আনতে বলো।

কার উদ্দেশ্যে এই আদেশ যশোমতীর শঙ্কর বুঝে উঠল না। হুকুম শুনে বাবা বুঝল চেক বইয়ের দরকার কেন। বলল, তুই ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, আমি দেখছি—

দ্বিগুণ অসহিষ্ণুতায় ঝাঁঝিয়ে উঠল যশোমতী।—আমার চেক-বই আনতে বলো এক্ষুনি! যেটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম সেটা চুরি হয়ে গেছে, অন্য যা আছে আনতে বলো শিগ্গীর!

হন্তদন্ত হয়ে দাদাই ছুটল। শঙ্কর সারাভাইয়ের বুকের ভিতরটা তুর্তুর্ করছে।

তু'মিনিটের মধ্যে তুটো চেক-বই হাতে নিয়ে দাদা ফিরল। যশোমতী সেই ট্রেনের মতোই স্তব্ধ এখন। একটা চেক-বই টেনে

নিতেই বাবা তাড়াতাড়ি কলম খুলে ধরল তার সামনে।

খস্ খস্ করে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক লিখে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে যশোমতী ছুঁড়ে দিল সারাভাইয়ের দিকে।—এই নিন। ভালো করে দেখে নিন। তারপর চলে যান!

জ্বলন্ত চোখে এক পশলা আগুন ছড়িয়ে নিজেই সে দ্রুত ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল। চেকটা ছুঁড়ে দেওয়ায় সেটা মাটিতে গিয়ে পড়েছিল। গণেশ পাঠক সেটা তুলে নিয়ে বোবামূর্তি শঙ্কর সারাভাইয়ের হাতে দিল। বিমূঢ় মুখে চেকটা নিল সে। যশোমতীর মা তাড়াতাড়ি মেয়ের পিছনে পিছনে চলে গেল। বউদিও।

চন্দ্রশেখর পাঠক মেয়ের ব্যবহারে অপ্রস্তুত একটু। কাছে এসে বলল, কিছু মনে কোরো না, মেয়েটার এই রকমই মেজাজ। ঢোঁক গিলে জিজ্ঞাসা করল, আসার সময় গণ্ডগোল করে নি তো?

শঙ্কর সারাভাই মাথা নাড়ল।

চন্দ্রশেখর তার পিঠে হাত রাখল, তারপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল, তারপর অফিসে তার সঙ্গে দেখা করতে বলল, আর তারপর মেয়ের উদ্দেশে প্রস্থান করল।

শঙ্কর সারাভাই রাস্তায় এসে দাঁড়াল। আয়নায় এই বোকামুখ দেখলে নিজেই অবাক হত। পরক্ষণে সর্বদেহে এক অননুভূত রোমাঞ্চ। বুক-পকেটে চেকটা খস্‌খস্ করছে। বার করে দেখল। হাত কাঁপছে। পড়ল। চোখে ধাঁধাঁ লাগছে।

যা হয়ে গেল, সব সত্যি কিনা নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। এক মেয়ে কলম নিয়ে খস্‌খস্ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা লিখে দিল বলেই এই কাগজটার দাম সত্যি পঞ্চাশ হাজার কিনা, সেই অস্বস্তিও মনের মধ্যে উকিঝুঁকি দিচ্ছে।...পঞ্চাশ হাজার...পঞ্চাশ হাজার টাকা...কপর্দকশূন্য শঙ্কর সারাভাই পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক আজ এই মুহূর্তে, সে-কি সত্যিই বিশ্বাস করবে? তার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা, একি সে স্বপ্ন দেখছে?

ব্যাঙ্কের সময় পার হয়ে গেছে আজ। একবার মেসোর বাড়ি যাবে

কিনা ভাবল। কিন্তু সোজা স্টেশনের দিকেই চলল শেষ পর্যন্ত।

উড়েই চলল। চিন্তা একটু স্থির হতেই মনে হল, পকেটের কাগজটা টাকাই—পঞ্চাশ হাজার টাকা। যে লোকটা কাগজে ছবি দেখে সন্দেহ করেছিল, আর তাকে সকালে ডেকে নিয়ে কাগজ দেখিয়েছিল, তাকে অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা দেওয়া উচিত।… দিতে ভালো লাগছে না বটে, কিন্তু তাই দেবে। তাহলেও পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা থাকল।

গলা ছেড়ে হাসতে ইচ্ছে করছে শঙ্কর সারাভাইয়ের।

॥ নয় ॥

দিদি শুনে একেবারে আকাশ থেকেই পড়ল বুঝি। বিহারীও তাজ্জব।

আর এদের উত্তেজনা এবং উদ্দীপনা দেখে ক্ষুদ্রকায় রাজুরও মনে হল তাজ্জব হবার মতো ব্যাপারই কিছু ঘটে গেছে।

বড়ঘরের মেয়ে এ-অবশ্য দিদির বরাবরই মনে হয়েছিল। কিন্তু সে-যে সাক্ষাৎ কুবেরনন্দিনী—এ ভাববে কি করে? প্রাথমিক উত্তেজনা কমার পর দিদির কেবলই মনে হতে লাগল, মেয়েটার কত রকমের অসুবিধা হয়েছে। অথচ হাসিমুখেই সে তার মধ্যে কাটিয়ে গেছে। অসুবিধের কথা বলে ফেলে বা অসুবিধেটা ধরা পড়ে গেলে নিজেই লজ্জা পেয়েছে। ভাইকে অনুযোগও করেছে দিদি, বলেছে, তুই তো এর ওপর আবার ঠাস ঠাস কথা শুনিয়েছিস মেয়েটাকে, যা নয় তাই বলেছিস।

সে-কথা শঙ্কর সারাভাইয়ের এক-এক বার যে মনে হয় নি তা নয়। নিজের আর যশোমতীরও অনেক কথাই মনে পড়ছে তার। আর কেমন যেন অজ্ঞাত অস্বস্তি একটু। তাই তার ফলে যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর মাথা না ঘামাতেই চেষ্টা করেছে সে।

ভাঙা কারখানা-ঘরে এসে বসেছে। সেই ভাঙা ঘর চোখের সামনে চকচকে ঝকঝকে নতুন হয়ে উঠছে যেন। পুরনো মেশিনের জায়গায়

নতুন মেশিন দেখছে সে। একটার জায়গায় তিনটে দেখছে। চোখের সামনে একটা ভর ভরতি ফ্যাক্টরি দেখছে।

রাতে ভালো ঘুম হল না। পরদিন সকালে পুকুরে চান করতে করতে বুকের তলায় কেমন যেন খচ করে উঠল একটু।…ভাগ্নের হাত ধরে হাসিমুখে একজন এসে দাঁড়াত। কালও দাঁড়িয়েছিল। ঘুম ভাঙলেই মুখ-হাত ধুয়ে চলে আসত। মুখখানা ভেজা-ভেজা লাগত। দু'দিন যেতে শঙ্কর বলতে গেলে অপেক্ষাই করত তার জন্যে।

আর কেউ এসে দাঁড়াবে না।

না, ভাবতে গেলেই কেমন অস্বস্তি। বড়লোকের মেয়ের ভাবনায় কাজ নেই।

তাড়াতাড়ি চান সেরে কারখানা-ঘরে গিয়ে ঢুকল। সকাল আটটা বাজতে বিহারী খাবার নিয়ে এলো। শঙ্করের আর একবার মনে হল যশোমতীর কথা। সে-ই খাবার নিয়ে আসত। এই স্মৃতিটাও শঙ্কর বাতিল করে দিল তক্ষুনি। ফ্যাক্টরিটা এবারে কোন্ প্ল্যানে দাঁড় করাবে সোৎসাহে বিহারীর সঙ্গেই সেই আলোচনা শুরু করে দিল। দেরি হয়ে যাচ্ছে খেয়াল ছিল না, খেয়াল হতেই ছুটল স্টেশনের দিকে।

ট্রেন থেকে নেমে বাসে চেপে ব্যাঙ্কে যখন এলো, তখন বারোটা বেজে গেছে। বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করতে লেগেছে আবার। ব্যাঙ্কে চেক পেশ করতে একজন বলল, আজ তো হবে না…শনিবার, সময় পার হয়ে গেছে।

শঙ্কর সারাভাই যেন বড়সড় ধাক্কা খেল একটা। বার-টার সব ভুল হয়ে গেছে তার। টাকাটা সোমবার পাবে তাহলে। পেয়ে এইখানেই আবার নিজের নামে জমা করে যাবে।…কিন্তু পাবে তো?

দ্বিধা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চেকটা দেখুন তো, সোমবার এলে টাকাটা পাওয়া যাবে তো?

ভদ্রলোক চেকটার দিকে ভালো করে তাকালো একবার। টাকার অঙ্ক দেখে তার চক্ষুস্থির হল একটু। বেয়ারার চেকে এত টাকার চেক

কাটা হয়েছে, এ যেন কেমন লাগল তার। শঙ্কর সারাভাইকে এক নজর দেখে নিল ভালো করে। পঞ্চাশ হাজার টাকা নেবার মতো মর্যাদাসম্পন্ন লাগল না তাকেও। কৌতূহলবশতই খাতা খুলে চেক-দাত্রীর সইটা মেলাল সে। মিলল বটে, কিন্তু দ্রুত স্বাক্ষর গোছের লাগল।

তাকে অপেক্ষা করতে বলে চেক হাতে নিয়ে লোকটি এক কোণে চলে গেল। শঙ্কর সারাভাই দেখল সে ফোন কানে তুলে নিয়েছে।

হ্যাঁ, চেক যে কেটেছে, অর্থাৎ চন্দ্রশেখর-কন্যা যশোমতীকেই ফোন করল সে।...এ রকম একটা চেক এসেছে, পেমেণ্ট হবে কিনা।

—হবে। দিয়ে দিন। ঝপ্ করে টেলিফোনের রিসিভার প্রায় ছুঁড়েই ফেলেছে যশোমতী।

লোকটি ফিরে এসে বলেছে, সোমবার পেমেণ্ট হবে, বেলা একটার মধ্যে আসবেন।

সেদিনও শঙ্কর মেশোর বাড়িতে গেল না। বাড়িই ফিরল। টাকাটা যে পাওয়া যাবে তা বোঝা গেল। নিশ্চিত বোধ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু বিপুল আনন্দের বদলে কি রকম যে লাগছে সে ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারছে না।

পরদিন চানের সময় আবারও একটা মিষ্টি স্মৃতি চোখে ভেসে উঠল। ওদিকে রাজু দিন-রাতই মাসির কথা বলছে। সকালের খাবার সময় তাকে মনে পড়ে। দুপুরেও। কি কথা হত, কিভাবে কথা কাটাকাটি হত। শঙ্কর কাজ ভুলে গেল। গোড়ার দিনে বাসের যোগাযোগ থেকে শুরু করে এ-পর্যন্ত খুঁটিনাটি কত কি যে মনে পড়তে লাগল ঠিক নেই। শঙ্কর সারাভাই আপন মনে মিটিমিটি হাসে এক একসময়। চাকরির জন্যে দেখা করতে গিয়ে ওভাবে স্কুল থেকে চলে আসার কথা মনে পড়তে বেশ জোরেই হেসে উঠেছিল। কেন যে কাগজ হাতে নিয়েই অমন উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিল, সেটা এখন আর বুঝতে বাকি নেই।

দুপুর না গড়াতে প্রায় লাফাতে লাফাতে মেসো এসে হাজির।

সঙ্গে মাসি। তার হাজার টাকার সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না কেউ। আনন্দে আটখানা দুজনেই। একটা কাজের মতো কাজ করেছে শঙ্কর। তার আত্মীয় বলে বড়কর্তার কাছে মেসোরই নাকি কদর বেড়ে গেছে। মেসো বার বার অফিসে গিয়ে তাকে বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বলে গেল। আর দিদিকে বলে গেল, তার ভাই ইচ্ছে করলেই বড়সাহেবের মিলের একজন পদস্থ অফিসার হয়ে বসতে পারে এখন। চন্দ্রশেখর পাঠক নিজেই নাকি শঙ্করের মেসোকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছে।

আশ্চর্য, সোমবারেও চেক ভাঙাতে যাওয়া হল না শঙ্কর সারাভাইয়ের। হল না বলে নিজেই নিজের ওপর বিরক্ত। না যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। হঠাৎ কেমন মনে হল, আজ না ভাঙিয়ে কাল ভাঙালেই বা ক্ষতি কি।

কিন্তু ওই একদিনে মনের কোণের সেই অজ্ঞাত অস্বস্তিটা যেন চারগুণ স্পষ্ট হয়ে ছেঁকে ধরতে লাগল তাকে। যশোমতীকে নিয়ে ফেরার সময়ে ট্রেনের দৃশ্যটা মনে পড়ল। হ্যাঁ, শঙ্কর জানে যশোমতীর সেই দৃষ্টিতে শুধু ঘৃণা ছাড়া আর কিছু ছিল না।...আর তারপর সেই চেক লিখে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার দৃশ্যটা চোখে ভাসতেই বুকের ভিতরে মোচড় পাড়তে লাগল। যেভাবে দিয়েছে—কোনো ভিখিরিকেও কেউ ও-ভাবে কিছু দেয় না।

সমস্ত রাত জেগে ছটফট করল শঙ্কর সারাভাই। নিজের সঙ্গেই ক্রমাগত যুঝছে সে। ভাবীকালের ফ্যাক্টরির চিত্রটা বিরাট করে দেখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু তারপরেই যা আছে বর্তমানে, সেটাই যেন হাঁ করে গিলতে আসছে তাকে। না, শঙ্কর এই দারিদ্র্য আর সহ্য করতে পারবে না।

পরদিন সময়মতোই ট্রেন ধরল। সময় মতোই ব্যাঙ্কে পৌঁছুল। কিন্তু কি যে হল একমুহূর্তে কে জানে। কি এক দুর্ভর যাতনা আর যেন সে সহ্য করে উঠতে পারছে না।

চেক পকেটে নিয়েই সে সোজা চলে এলো চন্দ্রশেখরের বাড়িতে।

কর্তা বাড়ি নেই। মেয়েকে ডেকে পাঠালো।

কিন্তু মেয়ে নিজেই তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। যশোমতী আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল প্রায়। পরক্ষণে নিদারুণ আক্রোশ। এই লোক তার যেমন ক্ষতি করেছে তেমন যেন আর কেউ কখনো করে নি। চাকর এসে কিছু বলার ফুরসত পেল না। যশোমতী ঝাঁঝিয়ে উঠল, যেতে বলে দাও, দেখা হবে না।

চাকর হুকুম পালন করল। এসে জানালো দেখা হবে না।

শঙ্কর সারাভাই স্থির দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে চলল।

জানলায় দাঁড়িয়ে যশোমতী দেখছে। তার চোখ-মুখ জ্বলছে।

রাতে বাড়ি ফিরে শঙ্কর দিদিকে শুধু বলল, চেকটা চন্দ্রশেখর-বাবুকে ফেরত দিয়ে এলাম। মেয়েকেই দিতে গেছলাম, সে দেখা করল না, তাই অফিসে গিয়ে তার বাবার হাতেই দিয়ে এলাম।

দিদি হতভম্ব। কিন্তু একটি কথাও আর জিজ্ঞাসা করতে পারল না। ভাইয়ের পরিবর্তনটা এ ক'দিন সে খুব ভালো করেই লক্ষ্য করেছে।

জ্বালা জ্বালা—যশোমতীর বুকে রাজ্যের জ্বালা। তাকে দ্বিগুণ হাসতে হচ্ছে, দ্বিগুণ হৈ-চৈ করে বেড়াতে হচ্ছে। বাড়ির লোকেরা মাসের কতকগুলো দিন মুছে দিতে পেরেছে, ও পারছে না কেন? বাবা আবার ভাবা শুরু করেছে, বিশ্বনাথ যাজ্ঞিকের সঙ্গে এবারে বিয়ের আলোচনায় এগোলে হয়। মা রমেশ চতুর্বেদীকে বিয়ে করার জন্যে আগের মতোই তাকে তাতিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। দাদা আবার তার শালা বীরেন্দ্র যোশীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছে। শিবজী দেশাই আর ত্রিবিক্রম ঘন ঘন দেখা করার ফাঁক খুঁজছে।

সকলেই ডাকছে তাকে। সকলেই সাদরে নেমন্তন্ন করছে। নিজের বন্ধুরা, মায়ের বন্ধুরা। বাড়ি থেকে পালিয়ে যশোমতী যেন মস্ত একটা কাজ করে ফেলেছে। এদিকে বাবা-মা রীতিমতো তোয়াজ করে চলেছে তাকে।

কিন্তু ভালো লাগে না। যশোমতীর কিচ্ছু ভালো লাগে না। সকালে ঘুম ভাঙলেই পুকুরঘাটে স্নানরত এক পুরুষের শুচি মূর্তি চোখে ভাসে বলেই যত যাতনা। এক কচি শিশুর 'মাসি' ডাক কানে লেগেই আছে। আর সেই ভাঙা কারখানায় কর্মরত পুরুষের মূর্তি আর তার রাগ আর তার অসহিষ্ণুতার স্মৃতি কতবার যে মন থেকে উপড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করেছে আর করছে, ঠিক নেই। লোকটা টাকা ছাড়া আর কিছু চেনে না, টাকা ছাড়া আর কিছু দেখতে শেখে নি—টাকার লোভে সে যেন তাকে জীবনের সব থেকে চরম অপমান করেছে। তাকে সে জীবনে ক্ষমা করবে না। কিন্তু তবু, তবু পুরুষের সেই সবল সংগ্রামের স্মৃতি কিছুতে ভুলতে পারে না। গাঁয়ের সেই ক'টা দিন যেন এক অক্ষয় সম্পদ। সেই সম্পদের ওপর এমন লোভের কালি মাখিয়েছে যে, তাকে সে ক্ষমা করবে কি করে?

অথচ এদিকে জলো লাগে সব। এই সম্পদ, এই আভিজাত্যে মোড়া দিন—এ-যে এত নিষ্প্রাণ এ-কি আগে জানত? ব্যাঙ্ক থেকে যেদিন তাকে ফোনে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল টাকা দেওয়া হবে কিনা, সেইদিন লোকটার ওপর যেমন দুর্বার আক্রোশে ঝলসে উঠেছিল তেমনি রাগও হয়েছিল নির্লজ্জের মতন আবার যেদিন সে দেখা করতে এসেছিল। তাকে দেখামাত্র মুহূর্তের জন্য যে আনন্দের অনুভূতি মনে জেগেছিল সেই জন্যে নিজেকেই যেন ক্ষমা করতে পারেনি যশোমতী।

টাকা-সর্বস্ব লোভ-সর্বস্ব অপদার্থ কোথাকার! ওই ভাবে অপমান করে তাকে বিদায় করতে পেরে একটু যেন জ্বালা জুড়িয়েছিল যশোমতীর।

কিন্তু তার এই মানসিক পরিবর্তনের ওপর কেউ যে তীক্ষ্ণ চোখ রেখেছে, যশোমতী তা জানেও না।

তার বাবা-মা।

চন্দ্রশেখর পাঠক চিন্তিত হয়েছে। আরো অবাক হয়েছে ছেলেটা অমন বেয়াড়া মুখে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেকটা ফেরত দিয়ে যেতে। বুদ্ধিমান মানুষ, মেয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এই টাকা ফেরত দেওয়াটা

খুব বিচ্ছিন্ন করে দেখল না সে। একটা নিগূঢ় চিন্তা তার মনে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল। যত টাকা আর যত প্রতিপত্তিই থাকুক, সে ব্রাহ্মণ মানুষ, অব্রাহ্মণ কোনো ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়ার কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। আর এই ব্যাপারে তার স্ত্রী তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

তাই টাকা ফেরত দেওয়া প্রসঙ্গে মেয়েকে কিছুই বলল না ভদ্রলোক। তার মেসোর কাছে ছেলেটার সম্পর্কে খোঁজখবর নিল একটু। এবং প্রত্যেক দিনই তার চিন্তা বাড়তে লাগল। মেয়ে যেন তার সেই মেয়েই নয়। ভেবেচিন্তে দিন কয়েক বাদে মেসোর মারফত শঙ্কর সারাভাইকে ডেকে পাঠালো চন্দ্রশেখর পাঠক। প্রকারান্তরে ছেলেটিকে একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। পঞ্চাশ হাজার টাকা তাকে আবার দিয়ে সেই সঙ্গে আরো বড় কিছু বিত্তের লোভ দেখিয়ে তাকে বশ করে এ বাধা দূর করা যায় কিনা, সেই চেষ্টাটাই তার মাথায় এলো।

ওদিকে স্ত্রীও সহায়তা করল একটু। মেয়ের উদ্দেশে বার দুই বলল, গরীবের ছেলে, তোকে আদর-যত্ন করে রেখেছিল—খুব ভালো মনে হল।...কিন্তু অব্রাহ্মণের বাড়িতে এতদিন ভাত-টাত খেলি ভাবলেই কেমন খারাপ লাগে।

দ্বিতীয়বার এই কথা শুনে মেয়ে চটেই গেল।—প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না কি করতে হবে বলো?

মা আর ঘাঁটাতে সাহস করল না। সন্ধ্যার পর বাবা এসে বলল, ওই শঙ্কর ছেলেটিকে কাল একবার দেখা করতে বললাম, দেখি যদি কিছু করতে পারি।

যশোমতী চাপা রাগে ফুঁসে উঠল তৎক্ষণাৎ।—কেন, টাকা তো পেয়েছে, আবার কি করতে হবে?

চন্দ্রশেখরের আশা, ছেলেটা যদি আরো বড় টোপ গেলে। তাই টাকাটা ফেরত দেবার কথাটা বলি-বলি করেও বলল না। কিছু গ্রহণ না করার বৈশিষ্ট্যটা মেয়ের কাছে নিষ্প্রভ করে দিতেই চায় সে।

পরদিন বাবা অফিসে চলে যাবার পরেও যশোমতী গুম হয়ে বসে

রইল খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ কি মনে পড়তে উঠে পড়ল। বেরুবে। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাণ্ড ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েই পড়ল। বড় একটা স্টেশনারি দোকান থেকে অনেক দাম দিয়ে ছোট ছেলেদের একটা মোটর আর সাইকেল কিনল। সঙ্গে আরো টাকা আছে, বিহারীকে দেবে। বিহারীর দেশের বাড়ি-ঘরের সমস্যার কথা শুনে তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেছিল। তারপর টানা মোটরেই সেই পরিচিত গ্রামে চলে এলো।

বাড়ির দোরের আঙিনায় হঠাৎ অমন একটা গাড়ি এসে থামতে দেখে দিদি অবাক হয়েছিল। ছেলে চেঁচামেচি করে উঠল, মাসি এসেছে!

গাড়ি থেকে নামল যশোমতী। চোখে জল আসতে চাইছে কেন জানে না। ভিতরে ভিতরে জ্বলেও যাচ্ছে আবার। তাকে দেখে দিদির মুখে কথা সরল না হঠাৎ। ওদিকে ড্রাইভার রাজুর মোটর আর সাইকেল নামাতে সে আনন্দে লাফালাফি নাচা-নাচি শুরু করে দিল।

দিদি কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ঘরে এনে বসালো তাকে। ভাইকে অপমান করেছে, দেখা করে নি, অথচ নিজেই বাড়ি বয়ে চলে এলো!

বলল, শঙ্কর মেসোমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছে, তিনি বিশেষ করে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

যশোমতী হাসিমুখেই বলে বসল, তিনি আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, বিশেষ করে বাবাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

দিদি জানে। তবু মেশোমশাই ও-ভাবে অনুরোধ না করলে ভাই যে যেত না, সেটা আর বলল না। যশোমতী রাজুর সঙ্গে খেলা শুরু করে দিল। তাকে তার মোটর চালাতে শেখাল, সাইকেল চড়তে সাহায্য করল। তারপর ফাঁক মতো বিহারীকে ধরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কারখানার চেহারা কতখানি বদলানো হয়েছে সেই কৌতূহলও কম নয়।

কিন্তু দিদিও এলো সঙ্গে সঙ্গে।

ফ্যাক্টরির ভিতরে ঢুকে যশোমতী অবাক একটু। আরো যেন ছন্নছাড়া চেহারা হয়েছে ভিতরটার, ক'দিনের মধ্যে কিছু কাজ হয়েছে কিনা সন্দেহ।

বলেই ফেলল, সেই রকমই দেখি আছে, নতুন কিছুই তো হয় নি এখন পর্যন্ত—

দিদি ঠাণ্ডা জবাব দিল, কোত্থেকে আর হবে বলো, ক'দিন তো বন্ধই আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে যশোমতী বলে উঠল, কেন? টাকা হাতে পেয়ে আর খরচ করতে ইচ্ছে করছে না?

দিদি বিমূঢ় প্রথম। তারপর বলল, তোমার দেওয়া চেক তো তোমার বাবার হাতে শঙ্কর ফেরত দিয়ে এসেছে, তোমার বাবা বলেন নি?

সেই মুহূর্তে কার সঙ্গে কথা বলছে তাও যেন ভুলে গেল যশোমতী। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, কক্ষনো না! ব্যাঙ্কের লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল টাকা দেবে কিনা, আমি নিজে দিতে বলে দিয়েছি!

দিদি যেন হকচকিয়ে চেয়ে রইল কয়েক নিমেষ। তারপর আত্মস্থ হল। সংযত হবার চেষ্টায় মুখ ঈষৎ লাল। বলল, তোমরা বড়লোক, তোমাদের টাকার কোন লেখাজোখা নেই শুনেছি। এই জন্যেই বোধহয় টাকার জন্যে গরীবেরা অনায়াসে মিথ্যে কথা বলতে পারে বলে ভাব তোমরা।

এবারে যশোমতীর বিস্ময়ের অন্ত নেই। ঘাবড়েই গেল সে। দিদি ডাকল, বিহারী, এদিকে আয়—

সোজা বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল সে। পিছনে বিহারী আর সেই সঙ্গে যশোমতীও।

—ওই মোটর আর সাইকেল গাড়িতে তুলে দে। যশোমতীর দিকে ফিরল, শঙ্কর এসে দেখলে রাগ করবে, তাছাড়া গরীবের ছেলের

এ-সব লোভ থাকলে অসুবিধে—

যশোমতী কাঠ। পাঁচ বছরের রাজুও হতভম্ব হঠাৎ। ওইটুকু ছেলের মুখের আনন্দের আলো নিভেছে। অথচ মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সাহস করে একটু প্রতিবাদও করতে পারছে না। বিমূঢ় বিহারী সত্যিই ওগুলো নেবার জন্যে হাত বাড়াতে ছেলেটার দিকে চেয়ে বুকের ভিতরটা ফেটে যাবার উপক্রম যশোমতীর।

হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে দিদির পায়ের কাছে বসে পড়ল যশোমতী। তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

দিদি সরবার অবকাশ পেল না। আঁতকেই উঠল।—ছি ছি বামুনের মেয়ে! তাড়াতাড়ি হাত ধরে টেনে তুলল তাকে। তারপর চেয়ে রইল। মুখখানা শান্ত কমনীয় হয়ে উঠল। বিহারীকে বলল, থাক তুলতে হবে না।

বাড়ি ফিরে যশোমতী হাতের প্যাকেটটা প্রথমে যত্ন করে তুলে রাখল। আসার সময় এটা সে দিদির কাছ থেকে চেয়ে এনেছে। ওতে আছে দুটো শাড়ি যে শাড়ি দুটো শঙ্কর সারাভাই নিজের হাতে তৈরি করে তাকে দিয়েছিল। তারপরেও নিজেকে সংযত করার জন্যেই ঘরে বসে রইল খানিক। তারপর বাবার কাছে এলো।

খুব ঠাণ্ডা মুখে জিজ্ঞাসা করল, শঙ্করবাবু সেই পঞ্চাশ হাজার টাকার চেকটা তোমার কাছে ফেরত দিয়ে গেছেন?

মেয়ের প্রশ্নের ধরনটা ভাল ঠেকল না কানে, চন্দ্রশেখর পাঠক এই প্রথম যেন পরিবারের কারো কাছে বিচলিত বোধ করল একটু। বলল হ্যাঁ, ছেলেটা কেমন যেন···

—ফেরত দিয়ে গেছেন আমাকে বলো নি তো?

—ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে আবার সেটা দিয়ে দেব ভেবেই বলি নি। ওর মেসোর সঙ্গে সেই রকমই কথা হল, তাছাড়া আরো কিছু করা যায় কিনা ওর জন্যে ভাবছিলাম···সেই জন্যেই তো আজ ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

—চেক আজ দিতে পারলে?

বিব্রত মুখে চন্দ্রশেখরবাবু মাথা নাড়ল। পারেনি।

—আর, আর-কিছুও করতে পারলে?

নিজের চিন্তাধারার ব্যতিক্রম দেখে অভ্যস্ত নয় চন্দ্রশেখর পাঠক। তাই ঈষৎ বিরক্ত মুখে জবাব দিল, না, ছেলেটাকে খুব বুদ্ধিমান মনে হল না, কথাই শোনে না ভালো করে।

আরো একটু দাঁড়িয়ে বাবাকে দেখল যশোমতী। তার রাগ হবে কি, এক উৎকট আনন্দে বুকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। এ আনন্দ যেন ধরে রাখা যাচ্ছে না। জীবনে এমন আনন্দ এই যেন প্রথমে।

॥ দশ ॥

দেব-উঠি-আগিয়ারস্।

সাবরমতীর মেলা। দেবতা উঠবেন। লোকে লোকারণ্য। এরই মধ্যে যশোমতী একটু ফাঁক খুঁজে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। সঙ্গে কেউ নেই আর। বাড়ির কেউ জানেও না। একা এসেছে। অপেক্ষা করছে।

চিঠির জবাব পায় নি যশোমতী। ছোট্ট দু'লাইন চিঠি লিখেছিল দিনকতক আগে। লিখেছিল, এর পরেও দেখা হবে আমি আশা করছি। দেবোত্থান একাদশীতে সাবরমতীতে আসার কথা ছিল। পুজো দেবার কথা ছিল। আমি অপেক্ষা করব।

অপেক্ষা করছে। নিশ্চিত জানে সে আসবে। দেখা হবে।

এলো। দেখা হল।

চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। গম্ভীর। কিন্তু সেও পুরুষের ক্লান্তি। পুরুষের গাম্ভীর্য।

আশ্চর্য, সমুদ্র-পরিমাণ কান্না চেপেও যশোমতী হাসতে পারছে। হাসছে। একটু কাছে এগিয়ে এলো। চোখে চোখ রেখে বলল, অপেক্ষা করছি।

শঙ্কর সারাভাই জবাব দিল না। চুপচাপ চেয়ে আছে।

যশোমতীর তাড়ায় নদীতে নেমে চান করতে হল শঙ্করকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যশোমতী দেখতে লাগল। নদীর জলে অগণিত মাথার মধ্যে শুধু একজনকেই দেখছে সে।

চানের পর যশোমতী পুজো দেবার কথা বলল।

শঙ্কর সারাভাই জিজ্ঞাসা করল, কি জন্যে পুজো?

—যে জন্যে কথা ছিল। তেমনি চোখে চোখ রেখেই কথা বলছে যশোমতী। হাসছে। বলল, সত্যিকারের পুরুষমানুষ কথা দিয়ে কথার খেলাপ করে না—বিশেষ করে অবলা রমণীকে কথা দিলে। আজই বিকেলে ফিরে গিয়ে কট্‌ন্ চেম্বারের এগজিবিশনের শাড়িতে হাত দেবার কথা ছিল।

শঙ্করের মুখখানা গম্ভীর, কিন্তু ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা উঁকি দিতে চাইল একটু। বলল, কথা ছিল, কিন্তু এরপর আপনাদের অনুকম্পা আমার খুব ভালো লাগবে না।

যশোমতী গম্ভীর।—আপনাদের বলতে একজন তো আমি, আর সব কারা?

মুখের হাসি আরো একটু স্পষ্ট হল শঙ্করের। বলল, আপনার বাবা, আপনার মা—

তাদের অনুকম্পা তো কত নিয়েছেন আপনি। আপনি চাইলে ওই কট্‌ন্ চেম্বারের পঁচিশ হাজার টাকা ছেড়ে আমি আপনাকে ছ'পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে পারি। আপনিও চাইবেন না, আমিও এক-পয়সা দেব না। অনুকম্পা বলছেন কেন, এখনো আমার শিক্ষা হয় নি বলতে চান?

শঙ্কর সারাভাই পুজো দিল। যশোমতী নীরবে অপেক্ষা করল ততক্ষণ। পুজো শেষ হতে যশোমতী জিজ্ঞাসা করল, এখন কি করবেন?

—বাড়ি যাব।

—বাড়ি গিয়ে?

হেসেই শঙ্কর সারাভাই জবাব দিল, আপনার হুকুম পালন করব, মানে কারখানায় গিয়ে ঢুকব—

—খাওয়া দাওয়া?

—তার পরে।

—কত পরে?

শঙ্কর সারাভাইয়ের টানা বিষণ্ণ দুই চোখ আস্তে আস্তে তার মুখের উপর স্থির হল।—হঠাৎ আমার ওপর আপনার এই অনুকম্পা কেন?

অনুকম্পা!

অস্ফুট কণ্ঠস্বরে, চোখে মুখে এক অব্যক্ত বেদনার ছায়া দেখল শঙ্কর সারাভাই। বলল, আপনিও সকাল থেকে না খেয়ে আছেন তো?

সেটা অনুকম্পা?

শঙ্কর সারাভাই চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক। কি দেখল বা কি বুঝল সে-ই জানে। হাসল একটু।—আচ্ছা, আর বলব না। বাড়ি গিয়ে খেয়ে নেবেন। মিথ্যে কষ্ট পাবেন না।

যশোমতীর দুই ঠোঁটের ফাঁকে এবারে হাসির আভাস একটু। জবাব দিল, কষ্ট পাওয়া কপালে থাকলে আর খণ্ডাবো কি করে। বেশি কষ্ট যদি না দিতে চান তাহলে শুভ কাজ শুরু করা হলেই আগে খেয়ে নেবেন।

অর্থাৎ, তার আগে পর্যন্ত তারও মুখে আহার রুচবে না। শঙ্কর সারাভাই বিব্রত বোধ করল। কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে মন সরল না। এই প্রাপ্তিটুকু নিঃশব্দে অনুভব করার মতোই শুধু। বলল, আচ্ছা।

কথা দিচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আর দেরি করে কাজ নেই তাহলে, চলুন আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে তারপর বাড়ি যাব।

এবারেও বাধা দিতে পারল না শঙ্কর সারাভাই। ট্যাক্সি করে দু'জনে স্টেশনে এলো। গাড়ি আড়াল না হওয়া পর্যন্ত হাসি মুখে যশোমতী স্টেশনে দাঁড়িয়েই থাকল।

কথা রেখেছে। বাড়ি ফিরে শঙ্কর সারাভাই কথা রেখেছে। বিহারীকে নিয়ে সোজা ফ্যাক্টরি ঘরে ঢুকে শুভ কাজে হাত দিয়েছে। একটু বাদে বিহারীর বিস্মিত চোখের ওপরেই কাজ বন্ধ করে খেতে গেছে।

তারপর ক'দিন তার এই কাজের তন্ময়তা লক্ষ্য করে করে দিদির খটকা লাগল কেমন। জিজ্ঞাসা করল, নতুন অর্ডার-টর্ডার পেলি নাকি কিছু?

শঙ্কর সারাভাই হাসি মুখেই দিদিকে জানিয়েছে ব্যাপারটা। তারপর বলেছে, পঁচিশ হাজার টাকা এবারে ঘরে আসছে, এটা ধরে নিতে পারো।

দিদি চেয়ে আছে। ভাইয়ের মুখের হাসি দেখছে। ওই হাসির আড়ালে পঁচিশ হাজার টাকা যে আসছে সেই আনন্দের ছিটে-ফোঁটাও চোখে পড়ল না।

দিদি জিজ্ঞাসা করল, এগজিবিশনে শাড়ি পাঠাচ্ছিস কেন?

শঙ্কর সারাভাই আবারও হাসল শুধু একটু, জবাব দিল না।

কিন্তু কটন্ চেম্বারের পঁচিশ হাজার টাকার প্রাইজ শঙ্কর সারাভাই পায় নি। পাবেই যে সেটা স্থিরনিশ্চিত জেনেও সমস্ত একাগ্রতা দিয়েই শাড়িটা শেষ করেছিল। আর মনে মনে আশা করেছিল, সঠিক বিচার হোক না হোক, মানের দিক থেকেও সে খুব পিছিয়ে পড়ে নি।

কিন্তু কাগজে যার শাড়ি প্রথম হয়েছে তার নাম দেখে সে অবাক হয়েছে। সেই নাম শঙ্কর সারাভাইয়ের নয়। অপরিচিত একজনের। তার নাম দ্বিতীয়। সে শুধু সার্টিফিকেট পাবে।

বার বার পড়েছে খবরটা শঙ্কর সারাভাই। আর, শুধু হেসেছে

নিজের মনে। এমন প্রসন্ন হাসি অনেক দিন তার মুখে দেখা যায় নি। কাগজে খবরটা দেখার পরেই সে যেন নিশ্চিত জেনেছে, কট্‌ন্‌ চেম্বারের পুরস্কারের বিচার এই প্রথম যথাযোগ্য হয়েছে। মান বিচারে এতটুকু কারচুপি হয় নি।

যশোমতী পাঠক হতে দেয় নি।

তাই সাগ্রহে সার্টিফিকেট নিতেই উৎসবে এসেছে শঙ্কর সারাভাই। এত আগ্রহ নিয়ে আসার আরো কারণ আছে। অন্যান্যবার পুরস্কার দিয়েছে মিসেস চন্দ্রশেখর পাঠক, কিন্তু কাগজের ঘোষণায় দেখা গেল এবারে পুরস্কার দেবে চেম্বার-প্রেসিডেণ্টের কন্যা যশোমতী পাঠক।

প্রতিবারের মতোই সেই সাড়ম্বর অনুষ্ঠান। সাজের বাহারে ঝলমল করছে চেম্বারের সামনের বিরাট আঙিনা। প্যাণ্ডেলের আলোর বন্যা দিনের আলোকে হার মানিয়েছে। গোটা দেশের মানী জনের সমাবেশ।

এর মধ্যে প্রেসিডেণ্টের পাশে পুরস্কার-দাত্রীকে দেখে অবাকই হয়েছে বহু বিশিষ্ট মেয়ে-পুরুষ। না, ঠিক যশোমতীকে দেখে নয়। এমন সমাবেশে তার সাজসজ্জা দেখে। বাড়িতে অবাক হয়েছিল যশোমতীর বাবা-মা। এখানে সকলে।

কাছাকাছি এক সারিতে বসে নিষ্পলক তার দিকে চেয়ে ছিল শঙ্কর সারাভাই। যশোমতীর গায়ে শুধু সেই গয়না, যে ক'টি গয়না পরে সে একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আর তার পরনে সেই শাড়ি দুটোর একটা, যা শঙ্কর নিজের হাতে তাকে তৈরি করে দিয়েছিল। আর, যশোমতী ডায়াসে ওঠার সময় শঙ্করের বিমূঢ় দৃষ্টিটা তার পায়ের দিকেও পড়েছিল একবার। পায়ে সেই স্যাণ্ডেলজোড়া —যশোমতীকে তার ঘর-ছাড়া করার দিন যেটা সে তাড়াহুড়ো করে কিনে এনে দিয়েছিল।

প্রাথমিক বক্তৃতা আর অনুষ্ঠানাদির পর প্রথম-পুরস্কৃতের নাম ঘোষণা হতে সেই ভদ্রলোক উঠে এগিয়ে এলো। যশোমতী দাঁড়িয়ে

হাসিমুখে পঁচিশ হাজার টাকার চেক সমর্পণ করল তার হাতে।

দ্বিতীয় নাম ঘোষণা হল। শঙ্কর সারাভাই—

যশোমতী তখনো জানে না সে এসেছে কিনা। শুধু আশা করছিল আসবে। এত ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়া কঠিন। কিন্তু আগেও তার দুচোখ থেকে থেকে কাকে খুঁজেছিল, শঙ্কর সারাভাই জানে। সে উঠল। এগলো।

সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে যশোমতী দাঁড়িয়ে আছে।

শঙ্কর সারাভাই এগিয়ে গেল। দেখছে দু'জনে দু'জনকে।

সার্টিফিকেটটা হাতে দেবার আগে সমাগত অভ্যাগতদের উদ্দেশে যশোমতী কয়েকটি মাত্র কথা বলল। বলল, আজ প্রথম পুরস্কার যিনি পেলেন তিনি অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু প্রথম পুরস্কার যিনি পেলেন না, তাঁরও চেষ্টার পুরুষকার একদিন ঠিক এই সার্থকতায় সফল হবে, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তাঁর সেই চেষ্টার সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তর যুক্ত থাকল।

চারদিক থেকে বিপুল করতালি।

সার্টিফিকেট নেবার জন্য দু'হাত বাড়াল শঙ্কর সারাভাই। দু'হাতে সার্টিফিকেট নিয়ে যশোমতী সার্টিফিকেটসহ নিজের হাত দুটিই রাখল তার হাতের ওপর। কে দেখছে যশোমতী জানে না। কে দেখছে শঙ্কর সারাভাই জানে না।

···কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। কয়েকটি নিমেষের নিষ্পলক দৃষ্টি বিনিময়।

॥ এগারো ॥

আসার সময় সাবরমতী দেখেছিলাম, আর, যশোমতীকে দেখছিলাম।

স্টেশনে অতিথি-বিদায়ের ঘটাটা মন্দ হল না। আমাকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য যশোমতী পাঠক এসেছে, শঙ্কর সারাভাই এসেছে, ত্রিপুরারি এসেছে, এখনকার নতুন বন্ধুরাও দু-পাঁচ জন এসেছে।

যশোমতীকে কিছু বলার ফাঁক খুঁজছিলাম আমি। ফাঁক পেলাম। বললাম, আপনার ট্রাজেডি পছন্দ নয় বলেছিলেন, এবারে লিখি যদি কিছু, সেটা কমেডিই হোক। কি বলেন ?

শুনে হঠাৎ যেন এক প্রস্থ থতমত খেয়ে উঠল যশোমতী। তার পরেই সমস্ত মুখে সিঁদুরের আভা। সবেগে মাথা নেড়ে বলে উঠল, না, কক্ষনো না!

কাছেই ছিল শঙ্কর সারাভাই। সকৌতুকে এগিয়ে এলো। জিজ্ঞাসা করল, কি হল ? শুনলাম না—

তক্ষুনি চোখ পাকালো যশোমতী, চাপা গলায় বলল, সবেতে নাক গলানোর কি দরকার, ওদিকে যাও না—

হেসেও উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

ট্রেন ছেড়ে দিল। সাবরমতী থেকে দূরে চললাম। সাবরমতীর নীলাভ জলের সঙ্গে কতটা ট্রাজেডির যোগ আর কতটা কমেডির, আমার জানা নেই। জানলায় ঝুঁকে যশোমতীকে দেখছি তখনো। হাসিমুখে রুমাল নাড়ছে। আর আমার মনে হচ্ছে, ট্রাজেডি হোক কমেডি হোক—দুই নিয়েই সাবরমতী পরিপূর্ণ।